ওঁ ওঁ ওঁ

সন ১৩৩১ সাল। ইং ১৯২৪ সাল।

Reg. No C 534

৩১শ বর্ষ। # হিন্দু-পত্রিকা। ১ম সংখ্যা।

(ধর্ম্ম-সাহিত্য-বিজ্ঞান-ইতিহাস-রাজনীতি-সমাজনীতি প্রভৃতি
বিষয়ক মাসিক-পত্রিকা।)

বৈশাখ।

সম্পাদক—
বেদান্তবাচস্পতি শ্রীযদুনাথ মজুমদার



বিদ্যয়া অমৃতমশ্নুতে।

অহমেব স্বয়মিদং বদামি জুষ্টং দেবানাম্ উত মানুষাণাং।
যং কাময়ে তং তমুগ্রং কৃণোমি তং ব্রহ্মাণম্, তং ঋষিং তং সুমেধাম্॥

যশোহর
"হিন্দু-পত্রিকা-প্রেসে"—
শ্রীকালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য—সমেত ডাকমাশুল ৩৲ তিন টাকা মাত্র, এই সংখ্যার
নগদ মূল্য।০ চারি আনা মাত্র।

সূচী।

হিন্দু-পত্রিকার লেখকগণের নাম।

মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ, পণ্ডিত রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ, পণ্ডিত কেদারনাথ ভারতী সাংখ্যতীর্থ, পণ্ডিত রামসহায় বেদান্ত শাস্ত্রী, ডাঃ মহেন্দ্রনাথ সরকার এম, এ, Ph, D. প্রোফেসার যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার F. R H. S. বাবু চারুচন্দ্র বসু, পণ্ডিত বিধুভূষণ শাস্ত্রী, পণ্ডিত আদ্যনাথ কাব্যতীর্থ, পণ্ডিত সিতিকণ্ঠ বাচস্পতি, পণ্ডিত মুরলীমোহন বন্দোপাধ্যায়, ডাঃ যদুনাথ কাঞ্জিলাল, পণ্ডিত শ্যামলাল গোস্বামী, পণ্ডিত নগেন্দ্রচন্দ্র দেওয়ান সরস্বতী তত্ত্বনিধি কাব্যভূষণ কাব্যতীর্থ, পণ্ডিত যোগেন্দ্রনাথ কাব্যব্যাকরণ সাংখ্য-স্মৃতিতীর্থ, শ্রীযুক্ত বিনোদলাল ভদ্র এম, এ, বি, এল, শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ সিকদার বি, এল্ শ্রীযুক্ত ক্ষিতিনাথ ঘোষ বি, এ, বি, ই, শ্রীযুক্ত পঞ্চানন কাঞ্জিলাল কবিরত্ন, পণ্ডিত নৃসিংহচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত রাজমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি, এ, পণ্ডিত গোপালচন্দ্র কবিকুসুম, ডাঃ খগেন্দ্রনাথ বসু কাব্যবিনোদ, শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ চন্দ্র এম, বি, এ, এ, প্রভৃতি।

হিন্দু-পত্রিকা।

১৩৩১ সালের সূচীপত্র।

শ্রীহরিঃ।

(১৮৪৫ সালের ২০ আইন মতে রেজেষ্ট্রীকৃত)

হিন্দু-পত্রিকা।

৩১শ বর্ষ, ৫১শ খণ্ড
১ম সংখ্যা।

বৈশাখ।

১৩৩১ সাল।
১৮৪৬ শকাব্দাঃ

নববর্ষ।

যিনি এই বিশ্বের অনাদি কারণ, যিনি সৎ, যিনি চিৎ, যিনি আনন্দ, যিনি সত্য, যিনি শিব, যিনি সুন্দর, অদ্য নববর্ষের প্রথমদিনে আমরা তাঁহাকে ভক্তি-সহকারে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিতেছি।

যিনি অনল, অনিল, সলিল, অবনী ও ব্যোমে বাস করিতেছেন, কিন্তু যাঁহাকে তাহারা জানে না, যিনি তাহাদের অন্তরের মধ্যে থাকিয়া তাহাদিগকে নিয়মিত করিতেছেন, সেই অন্তর্য্যামী পুরুষকে আমরা অদ্য নববর্ষের প্রথম দিবসে ভক্তিসহকারে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিতেছি। যিনি আমাদের আত্মার অন্তরে বাস করিতেছেন, কিন্তু আত্মা যাঁহাকে জানে না, অথচ ইচ্ছা করিলেই জানিতে পারে, যিনি আমাদিগের আত্মার অন্তরে থাকিয়া আমাদিগের আত্মাকে নিয়মিত করিতেছেন, সেই অন্তর্য্যামী পুরুষকে আমরা অদ্য নববর্ষের প্রথমদিনে ভক্তি-সহকারে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিতেছি। যিনি মানবাত্মাকে পৃথিবীর অধিপতিরূপে সৃষ্ট করিয়াছেন, এবং যিনি মানবাত্মাকে তাঁহাকে জানিবার ইচ্ছা ও অধিকার প্রদান করিয়াছেন, সেই করুণাময় পরমেশ্বরকে অদ্য নববর্ষের প্রথমদিনে ভক্তি-সহকারে আমরা পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিতেছি। যিনি চক্ষুর চক্ষুঃ, শ্রোত্রের শ্রোত্র

বাক্যের বাক্, ঘ্রাণের ঘ্রাণ, মনের মন, প্রাণের প্রাণ এবং যাঁহার কৃপাকণা ব্যতীত মানব শক্তিহীন, আমরা সেই মহৎ হইতে মহান্ পুরুষকে অদ্য নববর্ষের প্রথম দিবসে ভক্তিসহকারে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিতেছি। যাঁহাকে মনুষ্যেরা বিভিন্ন নামে বিভিন্ন প্রকারে অর্চ্চনা করে, সেই অদ্বিতীয় পরম পুরুষকে আমরা অদ্য নববর্ষের প্রথমদিনে ভক্তিসহকারে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিতেছি। আমরা যেন তাঁহার কৃপায় বিশ্বের প্রতি প্রেম, আর্ত্তের প্রতি দয়া, ধার্ম্মিকের প্রতি শ্রদ্ধা, ও পাপীর প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করিতে সমর্থ হই। আমরা যেন তাঁহার কৃপায় বর্ণ ধর্ম্ম ও দেশ নির্ব্বিশেষে মানুষকে ভালবাসিতে পারি। আমরা যেন তাঁহার কৃপায় পশুপক্ষী কীট পতঙ্গ বৃক্ষ লতাদির প্রতিও আমাদের কর্ত্তব্য প্রতিপালন করিতে পারি।

যাঁহাকে ঔপনিষদেরা শুদ্ধবুদ্ধ স্বভাব বলিয়া অভিহিত করেন, যাঁহাকে সাংখ্য বাদীরা আদি বিদ্বান্ কপিল বলিয়া অভিহিত করেন, যাঁহাকে পাতঞ্জলেরা ক্লেশকর্ম্ম-সম্পর্ক-রহিত অনুগ্রহকারী পুরুষ বলিয়া অভিহিত করেন, যাহাকে মহাপাশুপতেরা লৌকিক ও বৈদিক বিরুদ্ধ ধর্ম্মযুক্ত হইয়াও নির্লিপ্ত জগৎকর্ত্তা বলিয়া অভিহিত করেন, যাঁহাকে শৈবেরা শিব অর্থাৎ মঙ্গলময় বলিয়া অভিহিত করেন, যাঁহাকে বৈষ্ণবেরা পুরুষোত্তম বলিয়া অভিহিত করেন, যাঁহাকে পৌরাণিকেরা পিতামহ বলিয়া অভিহিত করেন, যাঁহাকে যাজ্ঞিকেরা যজ্ঞপুরুষ বলিয়া অভিহিত করেন, যাঁহাকে দিগম্বরেরা নিরাবরণ বলিয়া অভিহিত করেন, যাঁহাকে মীমাংসকেরা উপাস্যভাবে কল্পিত মাত্র বলিয়া অভিহিত করেন, নৈয়ায়িকেরা ও বৈশেষিকেরা যাঁহাকে যাবদুক্তোপপন্ন বলিয়া অভিহিত করেন, চার্ব্বাকেরা যাঁহাকে লোক-ব্যবহার-সিদ্ধ বলিয়া অভিহিত করেন, অজ্ঞেয়বাদীরা যাঁহাকে অজ্ঞেয় বলিয়া অভিহিত করেন, যাঁহাকে জৈনেরা জিন বলিয়া অভিহিত করেন, হীনযান বৌদ্ধেরা শূন্য বলিয়া অভিহিত করেন, যাঁহাকে মহাযান বৌদ্ধেরা বুদ্ধ বলিয়া অভিহিত করেন, যাঁহাকে খ্রীষ্টানেরা প্রভু পিতা আদি বলিয়া অভিহিত করেন, যাঁহাকে মুসলমানেরা আল্‌হা প্রভৃতি নামে অভিহিত করেন, যাঁহাকে সিণ্টোরা আদি-পুরুষ বলিয়া অভিহিত করেন, যাঁহাকে কনফিউসিয়েরা আকাশ বলিয়া অভিহিত করেন, যাঁহাকে নাস্তিকেরা জড় বলিয়া অভিহিত করেন, যাঁহাকে তান্ত্রিকেরা মাতা বলিয়া অভিহিত করেন, যাঁহাকে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় ও ব্যক্তি স্বীয় স্বীয় জ্ঞানানুসারে বিভিন্ন নামে অভিহিত করেন, যাঁহাকে কেহ পুত্রভাবে, কেহ পিতৃ-ভাবে, কেহ প্রভুভাবে, কেহ মিত্র ভাবে, কেহ পতিভাবে, কেহ পত্নীভাবে

উপাসনা করেন, যাঁহা হইতে বিশ্ব উদ্ভূত হইয়াছে, যাঁহা দ্বারা ইহা রক্ষিত হইতেছে, যাহাতে ইহার লয় হয়, আমরা সেই অন্তর্য্যামী মহাপুরুষকে অদ্য নববর্ষের প্রথমদিনে ভক্তিসহকারে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি।

সর্ব্বজ্ঞতা তৃপ্তিরনাদিবোধঃ স্বতন্ত্রতা নিত্যমলুপ্তশক্তিঃ।
অনন্তশক্তিশ্চ বিভোর্বিধিজ্ঞা ষড়াহুরঙ্গানি মহেশ্বরস্য॥
জ্ঞান-বৈরাগ্যমৈশ্বর্য্যং তপঃ সত্যং ক্ষমাধৃতিঃ
স্রষ্টৃত্বমাত্মসংবোধো হ্যধিষ্ঠাতৃত্বমেবচ
অব্যয়ানি দশৈতানি নিত্যং তিষ্ঠতি শঙ্করে॥

সর্ব্বজ্ঞতা, নিত্যজ্ঞান, স্বতন্ত্রতা, অলুপ্ত-সামর্থ্য ও অনন্তশক্তি যাঁহার এই ছয়টী অঙ্গ, এবং জ্ঞান, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য, তপঃ, সত্য, ক্ষমা, ধৃতি, স্রষ্টৃত্ব, আত্মজ্ঞান ও অধিষ্ঠাতৃত্ব, এই দশটি অব্যয় ধর্ম্ম, সেই সহস্র-শীর্ষ, সহস্রাক্ষ ও সহস্রপাৎ পুরুষকে নববর্ষের এই প্রথমদিনে আমরা ভক্তিসহকারে প্রণাম করি। যিনি এই বিশ্বকে নিয়ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করিলেও, তাঁহার অনির্ব্বচনীয় ও অসীম শক্তি ও করুণার দ্বারা ভক্তের বাঞ্ছা পূর্ণ করেন, আমরা সেই ভক্তের ভগবানকে এই নববর্ষের প্রথমদিনে ভক্তিসহকারে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি! নির্ভর করিলে যিনি ভক্তের যোগক্ষেম বহন করেন, আমরা এই নববর্ষের প্রথম দিনে সেই ভক্তবৎসল পরম পুরুষকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি।

অদ্য নববর্ষের প্রথমদিনে আমরা সেই মঙ্গলময়ের নিকট সকলের মঙ্গল প্রার্থনা করি। সকলেরই মঙ্গল হউক, কাহারও যেন অমঙ্গল না হয়।

ওঁ শান্তিঃ, ওঁ শান্তিঃ, ওঁ শান্তিঃ, ওঁ।

এই সংসারে কিছুই নূতন নহে; সবই পুরাতন, কেবল আকারে নূতন। পুরাতনই নব নব আকারে আমাদের নয়নপথে উদিত হয়। একই সবিতৃদেব নিত্য উদিত ও অস্তমিত হইতেছেন। কিন্তু আমরা সেই উদয়াস্তের সহিত নূতন নূতন, দিন প্রাপ্ত হইতেছি। একটী পুরাতন ধারা অনুসারে এই বিশ্ব আবর্ত্তিত হইতেছে। সেই ধারার ব্যতিক্রম নাই, চাই আমরা উহা বুঝি বা না-ই বুঝি। দিন পক্ষ মাস ঋতু বৎসর এই পুরাতন ধারার আবর্ত্তন মাত্র! শীতের সময় বৃক্ষগুলি পত্র-বিরহিত হইতেছে, আবার বসন্তের সময় তাহারা নবপল্লবে বিভূষিত হইতেছে। গ্রীষ্মের সময় নদীগুলি শুষ্ক হইয়া যাইতেছে, আবার বর্ষার সময় তাহারা জলে পরিপূর্ণ হইতেছে। প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যতিক্রম কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। একই নিয়মের অনুবর্ত্তী হইয়া প্রকৃতি তাহার

লীলা প্রদর্শন করিয়া যাইতেছে। মানবেতর প্রাণিবর্গ এই পুরাতন নিয়মের অধীন। তাহাদের এমন কোন শক্তি নাই যে. এই পুরাতন নিয়ম অতিক্রম করিয়া নূতন কিছু করে। বিধির বিধান অনুসারে তাহাদের আহার বিহার নিদ্রা বাসস্থান চিরকালই এক অপরিবর্ত্তনীয় ভাবে চলিয়া যাইতেছে। তাহারা প্রাকৃতিক নিয়মের দাস বা ক্রীড়নক মাত্র। প্রকৃতি যেন তাহাদিগকে লইয়া খেলা করিতেছেন, অথবা যেন মানুষের সেবায় তাহাদিগকে নিয়োজিত করিয়া রাখিয়াছেন। বিজ্ঞান যতই মস্তক উন্নত করিয়া আকাশের দিকে অগ্রসর হউক, এই সৃষ্টিরহস্য বিশ্লেষ করা তাহার সাধ্যায়ত্ত হয় নাই, হইবেও না। বিজ্ঞান যতই সমৃদ্ধিশালী হউক, মানুষের অজ্ঞেয় জগৎ উহাদ্বারা খর্ব্ব না হইয়া বরং আরও বাড়িয়া যাইবে। অজ্ঞের পক্ষে অজ্ঞাত বলিয়া কিছুই নাই। যে যত জানিতে থাকে, তাহার অজ্ঞাত পদার্থ তত বৃদ্ধি পাইতে থাকে। এই জন্যই শ্রুতি উচ্চকণ্ঠে বলিয়াছেন—

"যস্যামতং তস্য মতং, মতং যস্য ন বেদ সঃ।"

অর্থাৎ যে জানে যে সে জানে না, সেই জানে ; আর যে জানে যে সে জানে সে জানে না। এই জন্যই মহামতি সক্রেটিস্ বলিয়াছিলেন যে আমি এইমাত্র জানি যে আমি জানি না। এই জন্যই মহামতি নিউটন বলিয়াছিলেন যে আমি বেলাভূমিতে বালকের ন্যায় উপলখণ্ডসমূহ সংগ্রহ করিতেছি, জ্ঞানসমুদ্র আমার সম্মুখে অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে।

আমাদের অশেষ অজ্ঞতার মধ্যে এইটুক আমরা বুঝিতে পারি যে মানুষকে ভগবান্ প্রকৃতির ক্রীড়নক করিয়া সৃষ্টি করেন নাই। প্রকৃতিকে আয়ত্ত করার ক্ষমতা মানুষের আছে। পক্ষীর মত মানুষের পক্ষ নাই, প্রাকৃতিক দানে মানুষ এস্থলে পক্ষীর সুবিধা প্রাপ্ত হয় নাই বটে, কিন্তু তাহার স্বীয় শক্তিদ্বারা সে প্রকাণ্ড পক্ষ নির্ম্মাণ করিতে সমর্থ হইয়া অনায়াসে ব্যোমমার্গে বিচরণ করিতেছে। প্রকৃতির বিধান পর্য্যবেক্ষণে স্বতঃই মনে এই উদিত হয় যেন স্রষ্টা মানুষকে অনেক অসুবিধার মধ্যে ফেলিয়া দিয়া তাহার আত্মশক্তি বিকাশের সহায়তা করিয়া দিয়াছেন। পাখীর ন্যায় মানুষের যদি স্বাভাবিক পাখা থাকিত, তাহা হইলে তাহার ব্যোমযান আবিষ্কারের প্রবৃত্তির অভাব হইত। একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে সকলেই বুঝিতে পারিবেন যে পশ্বাদির তুলনায় মানুষের বহু অসুবিধা আছে, কিন্তু সে নিজের বুদ্ধি ও যত্নবলে সকল অসুবিধাই দূরীকৃত করিতে সমর্থ হইতেছে। মানুষের বুদ্ধি কোথায় যাইয়া সীমাপ্রাপ্ত হইবে,

তাহা স্থির করা যায় না। চিরকালই সে অসীমের দিকে ধাবিত হইবে। এবং এটুকু বুঝা যায় যে তাহার গতির কখনও রোধ হইবে না, সদাই উহা উর্দ্ধে ধাবিত হইবে, কিন্তু কখনও চরম অসীম বুদ্ধির রহস্য ভেদ করিতে পারিবে না। জীবে ও ব্রহ্মে যে ভেদ, জীব যতই শ্রেষ্ঠ হউক, তাহা চিরকালই রহিবে। অদ্বৈত জ্ঞান অবিরাম উর্দ্ধারোহণের জ্ঞান মাত্র। এই জন্যই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ জীবের প্রতি আদেশ করিয়াছেন "কোথায় যাইবে? কতদূর যাইবে? তাহা চিন্তা করিবার প্রয়োজন তোমার নাই, নিষ্কামভাবে স্বীয় কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া যাও।" ভগবানের সেই উচ্চ আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া কর্ত্তব্যপথে অগ্রসর হও। এই জন্যই শ্রুতি বলিয়াছেন "কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ। এবং ত্বয়ি নান্যথেতোঽস্তি ন কর্ম্ম লিপ্যতে নরে॥" অর্থাৎ ইহজগতে স্বীয় কর্ত্তব্যকর্ম্ম করিতে করিতে শতবর্ষ জীবিত থাকিতে ইচ্ছা কর, কিন্তু সাবধান তুমি যেন কর্ম্মে লিপ্ত হইও না এইই তোমার সম্বন্ধে বিধান। "কর্ম্মে লিপ্ত হইও না" এ কথাটি কেমন? আমি যে কার্য্য করিব, তাহাতে যদি আমার তীব্র ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ না করি, তবে আমি তাহাতে কিরূপে সাফল্যলাভ করিতে পারিব? ইহার উত্তর এই যে কর্ম্ম আত্মাভিমুখী হইলেই তাহাতে লিপ্ততা জন্মে এবং তাহাতেই বন্ধন হয়, তাহাতেই জ্ঞানের পূর্ণ বিকাশের বিরোধ জন্মে। কিন্তু পরাভিমুখী হইলে উহা হয় না। পরাভিমুখী কর্ম্ম সাত্ত্বিক, আত্মাভিমুখী কর্ম্ম রাজসিক। যেখানে লোভাদি আছে সেই স্থানেই মুগ্ধতা উপস্থিত হয়, এবং কাম ক্রোধাদি উদ্ভূত হইয়া জীবকে শৃঙ্খলে বদ্ধ করে। যেখানে স্বার্থ নাই, সেখানে আছে কেবল মৈত্রী, করুণা, মুদিত, উপেক্ষা।

"মৈত্রীকরুণামুদিতোপেক্ষাণাং সুখদুঃখপুণ্যাপুণ্যবিষয়াণাম্ ভাবনাতশ্চিত্ত-প্রসাদনম্।"

অর্থাৎ যাহারা সুখী তাহাদের প্রতি প্রেম, যাহারা দুঃখী তাহাদের প্রতি দয়া, যাহারা পুণ্যবান্ তাহাদের প্রতি আনন্দ, যাহারা পাপী তাহাদের প্রতি ঔদাসীন্য অবলম্বন করিলে চিত্ত প্রসন্ন হয়।

ভগবান্ পতঞ্জলির এই অমূল্য উপদেশ স্মরণ রাখিলে আমাদের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণপক্ষে বিশেষ সহায়তা করিবে। কি কর্ত্তব্য, কি অকর্ত্তব্য, তাহা নির্দ্ধারণপক্ষে মনীষিগণও অনেক সময়ে মোহিত হইয়া থাকেন। কিন্তু আমরা যদি অন্তর্য্যামী পরমাত্মার উপর একান্ত নির্ভর করি, এবং তাঁহার উপদেশামৃত পানের জন্য ব্যগ্র হই, তাহা হইলে আমাদের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের জন্য ব্যতিব্যস্ত

হ তে হয় না। ভগবান্ মনু বলিয়াছেন—

শ্রুতিস্মৃতিসদাচারঃ স্বস্যচপ্রিয়মাত্মনঃ।

এতচ্চতুর্ব্বিধং প্রাহুঃ সাক্ষাদ্ধর্ম্মস্য লক্ষণম্॥

শ্রুতি, স্মৃতি, সাধুদিগের আচরণ এবং নিজ নিজ আত্মার প্রিয় এই চারিটী ধর্ম্মের সাক্ষাৎ লক্ষণ অর্থাৎ এই চারিটীর সামঞ্জস্য করিয়া প্রতি ব্যক্তি তাহার কর্ত্তব্য অবধারণ করিবে। প্রতি মানুষেরই নিজের প্রতি কর্ত্তব্য আছে। নিজের প্রতি যে কর্ত্তব্য নাই তাহা নহে, এবং নিজের প্রতি কর্ত্তব্য প্রতিপালন করিলেই যে স্বার্থপরতা হয়, তাহাও নহে। "স্বয়মসিদ্ধঃ কথমন্যান্ সাধয়েৎ।" নিজে সিদ্ধিলাভ না করিয়া পরকে সিদ্ধিলাভ করানো যায় না। নিজের সিদ্ধিলাভই নিজের প্রতি কর্ত্তব্য।

কর্ত্তব্যের সামঞ্জস্য করা বড় সহজ নহে। কিন্তু আমাদের ইচ্ছা থাকিলেই ভগবান আমাদিগকে কর্ত্তব্যপথ দেখাইয়া দেন। সংশয়-কাতরভাবে ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলে, তিনি কখনও বিমুখ হন না। মানুষের জ্ঞানের বৃদ্ধির সহিত তাহার কর্ত্তব্যের পরিধি বাড়িয়া যায়। শিশুর কোন কর্ত্তব্য নাই, অজ্ঞের কর্ত্তব্যপরিধি অতি ক্ষুদ্র। পশ্বাদি স্বাভাবিক জ্ঞান দ্বারা পরিচালিত হয়। তাহাদের জ্ঞানের হ্রাসবৃদ্ধি নাই। তাহাদের ইচ্ছাশক্তি নাই। মানবশিশু যুবা হয়, অজ্ঞ ক্রমে জ্ঞানী হয়। জ্ঞানের বৃদ্ধির সহিত কর্ত্তব্যের পরিধির বৃদ্ধি হয়। মানুষের পারিপার্শ্বিক অবস্থানুসারে জ্ঞান, বয়ঃক্রম, আর্থিক অবস্থা, বৃত্তি ইত্যাদি বহুবিধ উপকরণ তাহার কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করে। কিন্তু যে যতই ছোট হউক, যাহার যতই বাধা বিপত্তির মধ্যে কার্য্য করিতে হউক, যাহার শক্তি যতই ক্ষুদ্র হউক, সে কিছু না কিছু করিতেই পারে। মানুষ পরের জন্য যদি অল্প কিছুও করিতে পারে, তাহাতে সে যে আনন্দপ্রাপ্ত হয় তাহা অন্য কিছুতেই পায় না।

ত্রিশ বৎসর ধরিয়া হিন্দুপত্রিকার সেবা করিয়া আসিতেছি। আত্ম-প্রশংসা করা এখানে উদ্দেশ্য নহে, সত্যই বলিতেছি হিন্দুপত্রিকা-সম্পাদনে এই ত্রিশ বৎসর যাবৎ অনেক উদ্বেগ সহ্য করিতে হইয়াছে। হিন্দুপত্রিকা হইতে কপর্দ্দকও গ্রহণ করি নাই; ইহার জন্য অনেক অর্থ ব্যয় করিতে হইয়াছে। বহু গ্রাহক পত্রিকা লইয়া শেষে মূল্য দেন না; কেহ কেহ এইরূপ দুই তিন বৎসর মূল্য না দিয়া মূল্যের তাগিদ চিঠি গেলে—পত্রিকা ফেরৎ দেন ও মূল্যও দেন না।

বড়ই দুঃখের সহিত একথা প্রকাশ করিতেছি, অথচ এটি সত্য কথা।

অবৈতনিক ভৃত্য সম্পাদকের পক্ষে উহাতে অনেক আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করিতে হইয়াছে, কিন্তু হিন্দু সমাজের সেবায় যে আনন্দটুকু লাভ করিতেছি উহা ঐ আর্থিক ক্ষতি হইতে অনেক অধিক। তাই ভগবানের নামে তাঁহারই উপর নির্ভর করিয়া এই ত্রিশ বৎসর হিন্দুপত্রিকার সেবা করিয়া আসিতেছি; আর কতদিন পারিব জানি না। আনন্দলাভ করাও ভগবানের কৃপার উপর নির্ভর করে। হিন্দুশাস্ত্রের চর্চ্চা বহুদিন হইতে করিতেছিলাম। কিন্তু হিন্দুশাস্ত্রের ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইতে ভয় হইত। দুইটি বন্ধু ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে সেই ভয় ভাঙ্গিয়া দেন এবং তাঁহাদেরই উৎসাহে প্রথমে এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হই। এই দুই বন্ধুর নাম ৺শ্যামলাল দত্ত ও রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত দীননাথ সান্ন্যাল।

দেখিতে দেখিতে ত্রিশটি বৎসর চলিয়া গিয়াছে। এই সেদিন হিন্দুপত্রিকার জন্ম হইল, ইহার মধ্যে ইহার বয়স ত্রিশ বৎসর হইয়া গেল। আজ উক্ত বন্ধু শ্যামলাল দত্ত মহাশয়ের কথা মনে পড়ে। ইনি অনেক পূর্ব্বে নড়াইল স্কুলের, তৎপরে বৈদ্যনাথ স্কুলের, তৎপরে যশোহর জেলা স্কুলের হেডমাষ্টার ছিলেন। ইহার নিবাস নড়াইলের নিকট কাশিয়াড়া গ্রামে। ইনি বয়সে আমা অপেক্ষা প্রবীণ হইলেও আমাকে একটু শ্রদ্ধার চক্ষুতে দেখিতেন। আর একজন মিত্রের কথাও বলিয়াছি; ইনি এখনও জীবিত আছেন এবং কৃষ্ণনগরে বাস করিতেছেন; ইনি রায় বাহাদুর দীননাথ সান্ন্যাল পেন্‌সনপ্রাপ্ত সিভিলসার্জ্জন। ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গদেশে যে সমস্ত মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হইত তাহারা কেহই হিন্দুপত্রিকার উদ্দেশ্য সাধন করিত না। হিন্দুশাস্ত্র এতই বৃহৎ, এতই বিভিন্ন পথগামী, যে সাধারণের পক্ষে হিন্দুধর্ম্মের মূলমন্ত্র বাছিয়া লওয়া সহজ নহে। হিন্দুধর্ম্ম জিনিষটা কি ইহার উত্তর বিচক্ষণ ব্যক্তিদিগের পক্ষেও দেওয়া কঠিন। আর সকলের পক্ষেই শ্রুতি স্মৃতি পুরাণাদির সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধ রাখা সহজও নহে। বেদ উপনিষৎ, দর্শন, গৃহ্যসূত্র, শ্রৌতসূত্র, স্মৃতি, পুরাণ, তন্ত্র উহাদের ভাষ্য টীকা আদির মধ্য হইতে হিন্দুধর্ম্মের মূলমন্ত্রটি বাহির করিয়া লওয়া একরূপ অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি না হইতে পারে। পূর্ব্বোক্ত দুই বন্ধুর সহিত অনেক সময় আমার শাস্ত্রের আলোচনা হইত এবং মাঝে মাঝে তাঁহারা হিন্দু সাধারণের শিক্ষার জন্য হিন্দুধর্ম্ম বিষয়ক একখানি পত্রিকা প্রকাশের জন্য অনুরোধ করিতেন প্রথমে স্বীয় অনুপযুক্ততা স্মরণ করিয়া উহাতে অগ্রসর হইতে বিরত হইলেও, কর্ম্মানুবন্ধ প্রবল হইল এবং হিন্দুপত্রিকা আশ্রয় করিয়া বিগত ত্রিশ বৎসর যাবৎ আমার অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা কার্য্য চলিতেছে। বহু শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি আমার এই

কার্য্যে সহায় হইয়াছেন। আজ আমি তাঁহাদিগকে প্রাণের সহিত ধন্যবাদ দিতেছি; সংস্কৃত কলেজের মহামহোপাধ্যায় ৺মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহামহোপাধ্যায় ৺চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার ও মহামহোপাধ্যায় ৺মধুসূদন স্মৃতিরত্ন ইহসংসার ত্যাগ করিয়াছেন—তাঁহাদের নিকট আমি কৃতজ্ঞ। মহামহোপাধ্যায় যদুনাথ সার্ব্বভৌম, মহামহোপাধ্যায় রাজকৃষ্ণ তর্কপঞ্চানন, মহামহোপাধ্যায় শিবচন্দ্র সার্ব্বভৌম, মহামহোপাধ্যায় কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন ইঁহাদিগের নিকটও আমি যথেষ্ট ঋণী। ইঁহারাও স্বর্গধামে। মহামহোপাধ্যায় কামাখ্যানাথ এখনও জীবিত। সেদিন মহামহোপাধ্যায় কালীপ্রসন্ন আমাদের মায়া ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ এখনও জীবিত। এই সমস্ত মনীষিগণের শুভাশীর্ব্বাদ আমাকে হিন্দু সমাজের সেবায় জীবন পবিত্র করিতে উৎসাহিত করিয়া আমাকে ধন্য করিয়াছে। আজ বঙ্গভাষার সেই প্রথিতযশা কালীপ্রসন্ন ঘোষ কোথায়? তাঁহার সেই ধীরগম্ভীর চিন্তা এবং তদুপযোগী ভাষা বঙ্গসাহিত্যে আর দেখিতে পাই না। ধ্রুপদের দিন কি চলিয়া গিয়াছে? শুধু কি টপ্পা দিয়াই বাঙ্গালী তাহার মাতৃভাষার সেবা করিবে? কালীপ্রসন্নের সহিত আমার সাক্ষাৎ পরিচয় ছিল না, কিন্তু কয়েক সংখ্যা হিন্দুপত্রিকা প্রকাশিত হইলেই কালীপ্রসন্ন যে পত্র লেখেন তাহার বৈদ্যুতিক ক্রিয়া আমি আজও বিস্মৃত হইতে পারি নাই। এই সুদীর্ঘ ত্রিশ বৎসর নিন্দা ও প্রশংসার মধ্য দিয়া আমরা আমাদিগের কর্ত্তব্য পালন করিতে চেষ্টা করিয়াছি। কখনও কখনও যে নিরুৎসাহতা না হইয়াছে তাহা নহে, কিন্তু উহা অধিকক্ষণ থাকে নাই; এই ত্রিশ বৎসর অনেক ঝটিকা মস্তকের উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে, বহু আপদ বিপদের মধ্যেও হিন্দুপত্রিকাকে বুকের মধ্যে করিয়া রাখিয়াছি।

মৃত্যুর পর কি হইবে জানি না, যদি এখনও আশ্বাসবাণী পাই যে আমার অভাবেও হিন্দুপত্রিকা হিন্দুশাস্ত্রের সেবায় জীবিত থাকিবে তাহা হইলে আনন্দ বোধ করি। আজ ত্রিশ বৎসর আর্থিক, শারীরিক ও মানসিক নানাবিধ দুঃখের মধ্যেও হিন্দুপত্রিকার সেবাব্রত অক্ষুণ্ণ রাখিতে চেষ্টার ক্রটী করি নাই। একদিন বড় আশা হৃদয়ে পোষণ করিয়াছিলাম যে চিন্তা-নির্ঝরিণী-প্রণেতা জ্যেষ্ঠ পুত্র কুমারবিক্রম হিন্দুপত্রিকা-সম্পাদনের ভার লইতে পারিবে; কিন্তু মানুষ কর্ম্মফলের অধীন; সে ভাবে এক, হয় আর এক। সে আশা ফলবতী হইল না, বৃদ্ধ পিতাকেই যুবা পুত্রের সেবা করিতে হইতেছে। ভগবানের ইচ্ছা পূর্ণ হউক।

হিন্দুপত্রিকার বিশেষত্ব—হিন্দুধর্ম্মের যথার্থ মর্ম্ম সাধারণকে বুঝাইয়া দেওয়া, হিন্দুশাস্ত্রে যে সার্ব্বজনীন ভাব আছে উহাকে উজ্জ্বল করা, উহার মধ্যে যে স্থলে সঙ্কীর্ণতা আছে, তাহাকে শনৈঃ শনৈঃ নিস্তেজ করা, হিন্দু সমাজকে সনাতন ভিত্তির উপরে স্থাপিত করা, হিন্দুসমাজে খাঁটি মানুষ গড়া। কখনও কখনও মনে হয় ত্রিশ বৎসরের শ্রম পণ্ড হইয়াছে, কিন্তু পরক্ষণেই ভগবান ঐ ভ্রম দেখাইয়া দেন। যদি এই ত্রিশ বৎসরের মধ্যে হিন্দু সমাজের এক ব্যক্তিকেও হিন্দুপত্রিকা একটু উর্দ্ধগতি, একটু নিঃস্বার্থপরতা, একটু কোমলত্ব, একটু ভগবদ্ভক্তি, একটু পিতৃ-মাতৃ ভক্তি, একটু স্বদেশ-ভক্তি, একটু শাস্ত্রজ্ঞান, একটু ধর্ম্মানুরক্তি দিতে পারিয়া থাকে, তাহা হইলে হিন্দু-পত্রিকার জন্য শ্রম, অর্থব্যয় নিরর্থক হয় নাই। আর যদি এই ত্রিশ বৎসরের শ্রম ভস্মে ঘৃত প্রক্ষেপের মত হইয়া থাকে, তাহাতেও দুঃখ নাই, কারণ ফলে মানুষের অধিকার নাই, কর্ম্মে মাত্র অধিকার আছে। কর্ত্তব্যবোধে ত্রিশ বৎসর কার্য্য করিয়া আসিতেছি, যে পর্য্যন্ত পারিব করিয়া যাইব; যখন পারিব না, ভগবানের চরণে হিন্দুপত্রিকাকে রাখিয়া দিব; তিনি যাহা করেন। তবে সময় সময় মনে হয় এই সময় যদি কোন শিষ্য, কোন পুত্র বা কোন মিত্র, কোন শাস্ত্রজ্ঞ, কোন স্বদেশবৎসল পাঠক বা পাঠিকা হিন্দুধর্ম্মের সেবায় সাহায্য করিয়া এই বৃদ্ধের স্কন্ধের গুরুভারের একটু লাঘব করিয়া দিতেন, তাহা হইলে যেন ভাল হইত। আবার ভগবানের দিকে তাকাইলে সাড়া পাই—ভয় কি? কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে। তাই এই নববর্ষে পুনর্ব্বার হিন্দুপত্রিকা পাঠক পাঠিকার নিকট উপস্থিত।

বৈদিক সাহিত্যের কাল-নিরূপণ।

লেখক—শ্রীক্ষিতিনাথ ঘোষ বি, এ, বি, ই।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

কেবল সাহিত্যিকগণ নয়, জ্যোতির্ব্বিদগণও ঐ প্রথার অনুসরণ করিয়াছেন। প্রাচীন জ্যোতিষ গ্রন্থে উত্তরায়ণ বিন্দু হইতে বৎসরের প্রারম্ভ ধরা হইত এবং

উত্তরায়ণের প্রথম মাসই বৎসরের প্রথম মাস রূপে গণ্য হইত। মার্গশীর্ষ পূর্ণিমাই যদি বৎসরের প্রথম রাত্রি হয় তবে এই কথা শুনিয়া একজন প্রাচীন জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিত মনে করিতেন যে মার্গশীর্ষী পূর্ণিমা হইতেই উত্তরায়ণ আরম্ভ হইত। এই ধারণানুসারে মনে করিতে হইবে যে ঐ পূর্ণিমার চন্দ্র মৃগশিরা নক্ষত্রের সমীপবর্ত্তী ছিল। সূর্য্য যখন উত্তরায়ণ বিন্দুতে অধিষ্ঠিত তখন পূর্ণিমার চন্দ্র দক্ষিণায়ন বিন্দুতে অবস্থিত থাকিবে এবং উপর্য্যুক্ত কারণে দক্ষিণায়ন বিন্দু ও মৃগশিরা নক্ষত্র একত্র অবস্থিত ছিল মনে করিতে হইবে। বাসন্ত বিষুববিন্দু দক্ষিণায়ন বিন্দুর ৯০ ডিগ্রি পশ্চাতে অবস্থিত, সুতরাং যদি মৃগশিরা দক্ষিণায়ন বিন্দুর সহিত একত্র অবস্থিত হয়, বাসন্ত বিষুববিন্দু মৃগশিরারও ৯০ ডিগ্রি পশ্চাতে অবস্থিত হইবে। যদি মার্গশীর্ষের পূর্ণিমার রাত্রি উত্তরায়ণ বিন্দুতে চন্দ্রের অবস্থান হেতু সংঘটিত হইয়া বৎসরের প্রথম রাত্রি রূপে পরিগণিত হয়, তাহা হইলে স্বায়ত্তঃ গণিত মতে উপর্য্যুক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয়। ইহার ফল কি? ইহার ফল একটী অসম্ভব সিদ্ধান্ত এবং প্রাচীন জ্যোতির্ব্বিদগণ তাহা সম্যগ্‌রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া ইহার সমর্থনের জন্য একটী ব্যাখ্যা বা যুক্তি উদ্ভাবিত করিয়াছেন। সূর্য্য সিদ্ধান্ত মতে রেবতী হইতে গণনায় মৃগশিরার স্ফুট ৬৩ ডিগ্রী। যদি বাসন্ত বিষুববিন্দু মৃগশিরার ৯০ ডিগ্রী পশ্চাতে থাকে তাহা হইলে ইহা রেবতী নক্ষত্রের ৯০ – ৬৩ = ২৭° ডিগ্রী পশ্চাতে থাকিবে। পরন্তু বৈদিক সাহিত্যে উল্লেখ আছে যে কৃত্তিকাই আদ্যনক্ষত্র এবং উত্তরায়ণ তৎকালে মাঘ মাসে সংঘটিত হইত। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, বাসন্ত বিষুববিন্দু রেবতী নক্ষত্রের ২৬°–৪০′ অর্থাৎ প্রায় ২৭° অগ্রে অবস্থিত ছিল। ভারতীয় জ্যোতির্ব্বিদের মহা সমস্যার বিষয়। বেদের উক্তি অগ্রাহ্য করা যায় না। গীতার বচনও মানিয়া লওয়া আবশ্যক, কিন্তু ঐ দুইটী বিসম্বাদী মতের সমন্বয় কি প্রকারে করা যায়? রেবতী নক্ষত্রের অগ্রে ও পশ্চাতে বিষুববিন্দু ২৭ ডিগ্রী পরিমিত স্থান পর্য্যন্ত পরিলম্বিত হয় এই সিদ্ধান্ত স্থির করিয়া তিনি সমস্যার সমাধান করিবেন তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? আধুনিক জ্যোতির্ব্বিদগণ এই সিদ্ধান্ত ভ্রমাত্মক বলিয়া ত্যাগ করিয়াছেন, কিন্তু হিন্দু জ্যোতিষ গ্রন্থে এই বিষয়টী স্থান কেন পাইয়াছিল কেহ তাহার কোন কারণ নির্দ্দেশ করেন নাই। কোন মত ভ্রমাত্মক হইতে পারে, কিন্তু ভ্রমপূর্ণ মত কোনও কারণ ব্যতীত প্রচলিত হইতে পারে না। যখন সূর্য্য রেবতী নক্ষত্রের ২৬°-৪০′ সম্মুখে অবস্থিত কৃত্তিকা

নক্ষত্রে প্রবেশ করিতেন তখন অতি প্রাচীনকালে হিন্দুবর্ষ প্রবেশ হইত, এই হেতু প্রোফেসর বেণ্টলি অনুমান করেন যে "বিষুববিন্দু সঞ্চার" মতের উৎপত্তির উহাই কারণ। প্রোফেসর হুইটনি (Whitney)ও ঐ মতের সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু এই কারণ আমার নিকট পর্য্যাপ্ত মনে হয় না, কেননা যদি হিন্দু জ্যোতির্ব্বিদগণ বিষুববিন্দুর উপর্য্যুক্ত সঞ্চার সম্বন্ধে সুদৃঢ় প্রমাণ না পাইতেন এবং যদি ঐ ঘটনা অনন্য-প্রমাণ-সাপেক্ষ, এরূপ সন্দেহ করিবার কোন ভিত্তি থাকিত তাহা হইলে তাঁহারা ঐ মত অবলম্বন করিতেন না। আমি যতদূর অবগত আছি, তাহাতে আধুনিক পণ্ডিতগণ অন্য কোন কারণ স্থির করিতে পারেন নাই। এবং যদি উপর্য্যুক্ত ব্যাখ্যা সর্ব্বাংশে প্রয়োগ-যোগ্য হয় তবে উহাকেই প্রকৃত ব্যাখ্যা মনে না করিবার কোন কারণ নাই। এ প্রশ্ন উঠিতে পারে যে জ্যোতির্ব্বিদগণ কর্ত্তৃক মাঘ এবং মার্গশীর্ষ দুইই পর্য্যায় ক্রমে বৎসরের প্রথম মাস রূপে কল্পিত হইত এবং তজ্জন্যই বিষুববিন্দুর সঞ্চার মতের প্রবর্ত্তন হয় এই ধারণার ভিত্তি কি ?

এই স্থলে এই প্রশ্নের মীমাংসা করা সম্ভব নয় এবং তাহার প্রয়োজনও নাই। আমার আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে এইটুকু প্রমাণ করা আবশ্যক যে যদি মার্গশীর্ষ পুর্ণিমা কখনও বৎসরের প্রথম রাত্রি হইত এইরূপ ধারণা করা হয় তবে আমরা অসম্ভব সিদ্ধান্তে উপনীত হইব এবং বিষুববিন্দুর সঞ্চার সম্বন্ধে প্রকৃত ব্যাখ্যা যাহাই হউক না কেন তাহাতে কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি হইবে না। আমি এখানে বলিতে ইচ্ছা করি যে যখন অমরসিংহ ১-৪-১৩ শ্লোকে লিখিয়াছেন দুই মাসে এক ঋতু হয় এবং মাঘ মাস হইতে ঋতু গণনা আরম্ভ হয় এবং পরের শ্লোকে লিখিয়াছেন যে, মার্গশীর্ষ মাস হইতে বৎসরের মাস গণনা আরম্ভ হয় তখন যদি মনে করা যায় যে কোন হিন্দু জ্যোতির্ব্বিদ্ বৎসর প্রবর্ত্তন সম্বন্ধীয় দুইটী মতের সমন্বয় করিবার জন্য উপর্য্যুক্ত উক্তিদ্বয়কে একত্র সংস্থাপিত করিয়া সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার জন্য চেষ্টা করিয়াছেন তাহা হইলে ইহাতে আশ্চর্য্যজনক কিছুই নাই। পরন্তু যদি হিন্দু জ্যোতির্ব্বিদগণ এরূপ না করিতেন তাহা হইলে বিস্ময়জনক হইত সন্দেহ নাই।

কিন্তু বিষুব বিন্দুর সঞ্চারের কথা ছাড়িয়া দিলেও যদি মনে করা যায় যে মার্গশীর্ষ পুর্ণিমা হইতে বৎসর আরম্ভ হইত অর্থাৎ উত্তরায়ণ সংঘটিত হইত, তাহা হইলেও আমরা অসম্ভব সিদ্ধান্তে উপনীত হইব। সাধারণভাবে বিচার করিলে এই মত অসম্ভব প্রতিপন্ন হইবে। দেশীয় পণ্ডিত ও জ্যোতির্ব্বিদগণ এই

অসম্ভব সিদ্ধান্ত অনুভব করিতে না পারিয়া শাস্ত্রীয় গ্রন্থেও পরস্পর বিসংবাদী মতদ্বয়ের সমন্বয় সাধন জন্য সঞ্চার মতের উদ্ভাবনা করিয়াছেন। আমরা অবগত আছি যে বর্ত্তমান আবর্ত্তের প্রারম্ভে কিম্বা ৬০০ বৎসর পরে ভিন্ন বিষুব বিন্দু রেবতী নক্ষত্রের ২৭° ডিগ্রি পশ্চাতে অবস্থিত হইতে পারে না। এবং এইরূপ সিদ্ধান্তমূলক মত অগ্রাহ্য করিতে কোন কষ্ট পাইতে হইবে না। হয়ত কেহ বলিতে পারেন যে মার্গশীর্ষের পূর্ণিমার রাত্রিকে অন্য কোন বিশিষ্টভাবে বৎসরের প্রথম রাত্রি বলা হইয়াছে। *

ইহা অবশ্যই সম্ভব, কিন্তু কোন দেশীয় পণ্ডিত কখনও ইহা কল্পনা করিয়াছিলেন তাহার প্রমাণ কি? কোন প্রমাণ আছে আমার মনে হয় না। প্রাচীন হিন্দু সাহিত্যে বৎসরের দুইটী প্রারম্ভ কল্পিত হইত। পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে যে মার্গশীর্ষের পুর্ণিমা হইতে উত্তরায়ণ আরম্ভ হইতে পারে না। ঐ প্রকারে দেখান যাইতে পারে যে বাসন্তী বিষুব বিন্দুতে ঐ দিনে সূর্য্যের অবস্থিতি হইতে পারে না। কেননা যদি সূর্য্যের এই অবস্থিতি হেতু ঐ পুর্ণিমা হইতে বৎসর গণনা আরম্ভ করা হয় তাহা হইলে অভিজিৎ নক্ষত্রের অবস্থান ঐ বাসন্তী বিষুব বিন্দুতেই নির্দ্দেশ করিতে হয়। এইরূপ ঘটনা খ্রীস্টাব্দের ২০,০০০ বৎসর পুর্ব্বে সংঘটিত হওয়া সম্ভব। ভাগবত পুরাণের গ্রন্থকার গীতার ১১—১৬—২৭ শ্লোকের ব্যাখ্যায় মাসের মধ্যে "আমি মার্গশীর্ষ, নক্ষত্রের মধ্যে অভিজিৎ" এই ভাব ব্যক্ত করিয়া উক্তমতের সমর্থন করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ শাস্ত্রী গড্‌বোল এই উক্তিকে প্রকৃত-প্রস্তাবে প্রাচীন ঘটনামূলক কিম্বদন্তী মনে করিয়াছেন। ইহা হইতে প্রাচীন গ্রন্থে মূলের অনুসন্ধান না করিয়া আধুনিক গ্রন্থের কিম্বদন্তীর উপর আস্থা স্থাপন করিলে কিরূপ বিপন্ন হইতে হয় তাহা বুঝিতে পারা যাইতেছে।

সংস্কৃত সাহিত্যের নবাভ্যুদয় সময়ের পণ্ডিতগণ শব্দের প্রকৃতিমূলক যে সকল মতের অবতারণা করিয়াছেন তাহা পরিহার করিয়া সূক্ষ্মতত্ত্বের অনুসন্ধান করা যাউক। এই সকল মত হইতে বিষুব বিন্দুর সঞ্চার প্রভৃতির উদ্ভব হইয়াছে, এবং উহাই অগ্রহায়ণ সম্বন্ধীয় ধারণা বা সংস্কার প্রচলনের অন্তরায় হইয়াছিল। হয়ত কালক্রমে চৈত্র এবং চৈত্রিকার সম্বন্ধ হইতে অগ্রহায়ণিকা শব্দ অগ্রহায়ণ শব্দে রূপান্তরিত হইয়াছিল এবং উহাই উপর্য্যুক্ত ভিন্ন ভিন্ন মত প্রবর্ত্তনের কারণ। কিম্বা হয়ত কোনদেশে মার্গশীর্ষ মাসে বৎসর আরম্ভ হইত এবং

* Bentley's Historical survey of Hindu Astronomy P, P, 5-27

তদ্দেশীয় লোকে ঐ প্রথার একটী ভিত্তি অনুসন্ধান করিতে চেষ্টা করিয়া অগ্রহায়ণিকা শব্দের প্রকৃতিগত অর্থের সহিত ঐ মতের সংস্রব বা সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছিল। আমার ইহা মনে হয় যে নক্ষত্র সম্বন্ধে প্রাচীন মত তন্নামধেয় মাসের সহিত ক্রমশঃ সংস্পৃষ্ট হইয়াছিল, দৃষ্টান্তস্থলে বলা যায় যে যেমন কৃত্তিকা হইতে কার্ত্তিকমাসের নামকরণ হইরাছিল। Prof. Whitney মাসের মধ্যে ইহাকে প্রথমস্থান প্রদান করিয়াছেন। *

ব্রহ্মচর্য্য।

লেখক—স্বামী সচ্চিদানন্দ।

ব্রহ্মে চরতি ইতি ব্রহ্মচারী—যিনি ব্রহ্মে চরণ করেন, তিনিই ব্রহ্মচারী, এই হইল, ব্রহ্মচারী শব্দের ধাত্বর্থ। যোগরূঢ় ভাবে ব্রহ্মচারী শব্দের আর একটী অর্থ হইয়াছে। জীবনের প্রথম আশ্রমকে ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম বলে। নানাবিধ নিয়মের অধীন থাকিয়া, গুরুগৃহে শাস্ত্রাদি-অধ্যয়নকারী ব্যক্তিকে সাধারণতঃ ব্রহ্মচারী সংজ্ঞা দেওয়া হইয়া থাকে। সুতরাং ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম বলিলে সাধারণতঃ ছাত্রজীবন or student life বুঝায়। ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমের পরে গৃহস্থ-আশ্রম। নিজের শারীরিক ও মানসিক উৎকর্ষ সাধন করিয়া যখন অধ্যয়ন শেষ হয়, তখন ব্রহ্মচারী স্নাতক (degree or উপাধি) অধিকার করিয়া গুরুর অনুমতিক্রমে গৃহস্থ আশ্রমে প্রবেশ করিতেন। পূর্ব্বকালে আমাদের দেশে যে বিশ্ববিদ্যালয় ছিল, তাহার নাম ছিল 'অরণ্য।' এ সমস্ত 'অরণ্য' বলিতে জঙ্গলাকীর্ণ স্থান বুঝিতে হইবে না, এই সমস্ত 'অরণ্য' নগরের মধ্যে থাকিত না, নগর হইতে দূরে বা নগরের উপকণ্ঠে অবস্থিত ছিল।

Oxford, Cambridge প্রভৃতি বর্ত্তমান বিশ্ববিদ্যালয় যেরূপ নগরের কোলাহল হইতে দূরে অবস্থিত, ইহারাও তদ্রূপ ছিল। যে সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে দশসহস্র ব্রহ্মচারী থাকিত, তাহাদের সর্ব্বপ্রধান অধ্যক্ষকে "কুলপতি" or chancellor আখ্যা দেওয়া হইত। শৌনক এইরূপ নৈমিষারণ্যের "কুলপতি" ছিলেন।

* Whitney's Surja shidhanta p 271;

শকুন্তলার পিতা মহর্ষি কণ্বও এইরূপ একজন "কুলপতি" ছিলেন। এই সমস্ত অরণ্য বা আশ্রম দেশের ধনী ও রাজাদিগের দান দ্বারা স্থাপিত ও রক্ষিত হইত।

বৌদ্ধযুগেও এইরূপ বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। উহাদের নাম ছিল'বিহার'। তক্ষশীলা, নালন্দ প্রভৃতি স্থানে এইরূপ 'বিহার' ছিল, এবং উহাতে ভারতেতর দেশের শিক্ষার্থীরা আসিয়া জ্ঞানার্জ্জন করিতেন। হরিদ্বারে 'গুরুকুল' "ঋষিকুল," বোলপুরে রবীন্দ্রনাথের "বিশ্বভারতী" অনেকটা এই প্রাচীন আদর্শের অনুকরণে স্থাপিত হইয়াছে। ব্রহ্মচারীরা পাঠ সমাপনান্তে গৃহস্থ-আশ্রমে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে, গুরুর নিকট কিরূপ উপদেশ পাইতেন, তাহার পরিচয় তৈত্তিরীয়োপনিষদে একাদশ অনুবাকে পাওয়া যায়। পাঠকের অবগতির জন্য ব্রহ্মচারীর প্রতি গুরুর অনুশাসন নিম্নে দেওয়া হইল।

বেদমনূচ্যাচার্য্যোঽন্তেবাসিনমনুশাস্তি। সত্যং বদ। ধর্ম্মঞ্চর। স্বাধ্যায়াম্ মা প্রমদঃ। আচার্য্যায় প্রিয়ং ধনমাহৃত্য প্রজাতন্তুং মা ব্যবচ্ছেৎসীঃ। সত্যান্ন প্রমদিতব্যম্। ধর্ম্মান্ন প্রমদিতব্যম্। কুশলান্ন প্রমদিতব্যম্। ভূত্যৈ ন প্রমদিতব্যম্। স্বাধ্যায় প্রবচনাভ্যাং ন প্রমদিতব্যম্। ১

দেব-পিতৃকার্য্যাভ্যাং ন প্রমদিতব্যম্। মাতৃদেবো ভব। পিতৃদেবো ভব। আচার্য্যো দেবো ভব। অতিথিদেবো ভব। যান্যনবদ্যানি কর্ম্মাণি তানি সেবিতব্যানি। নো ইতরানি। যান্যস্মাকং সুচরিতানি, তানি ত্বয়োপাস্যানি নো ইতরাণি ॥ ২

যে কে চাস্মচ্ছ্রেয়াংসো ব্রাহ্মণাঃ। তেষাং ত্বয়াসনেন প্রশ্বসিতব্যম্। শ্রদ্ধয়া দেয়ম্। অশ্রদ্ধয়াঽদেয়ম্। শ্রিয়া দেয়ম্। হ্রিয়া দেয়ম্। ভিয়া দেয়ম্। সংবিদা দেয়ম্।

অথ যদি তে কর্ম্ম-বিচিকিৎসা বা বৃত্ত-বিচিকিৎসা বা স্যাৎ। যে তত্র ব্রাহ্মণাঃ সম্মর্শিনঃ। যুক্তা অযুক্তাঃ অলুক্ষা ধর্ম্মকামাঃ স্যুঃ। যথা তত্র বর্ত্তেরন্ তথাতত্র বর্ত্তেথাঃ ॥৩

অথাভ্যাখ্যাতেষু যে তত্র ব্রাহ্মণাঃ সম্মর্শিনঃ। যুক্তা আযুক্তাঃ। অলূক্ষাধর্ম্মকামাঃ স্যুঃ। যথা তে তেষু বর্ত্তেরন্। তথা তেষু বর্ত্তেথাঃ। এষ আদেশঃ। এষ উপদেশঃ। এষা বেদোপনিষৎ। এতদনুশাসনম্। এবমুপাসিতব্যম্। এবমুচৈতদুপাস্যম্॥ ৪

স্বাধ্যায় প্রবচনাভ্যাং ন প্রমদিতব্যম্ তানি ত্বয়োপাস্যানি বিচিকিৎসা বা স্যাত্তেষু বর্ত্তেরন্ সপ্তচ ॥

ইত্যেকাদশোঽনুবাকঃ ॥ ১১

বেদ অধ্যয়ন করাইয়া আচার্য্য অন্তেবাসী শিষ্যকে উপদেশ দিতেছেন। সত্যকথা বলিবে, ধর্ম্মের আচরণ করিবে [ধর্ম্মানুষ্ঠান করিবে, এটী সামান্য উপদেশ, সত্যকথা বলিবে, এটী একটী বিশেষ উপদেশ। ধর্ম্মাচরণের মধ্যে সত্য বচন অন্তর্ভুক্ত হইলেও উহার কথা বিশেষ করিয়া হইতেছে।] স্বাধ্যায় হইতে বিরত হইও না (স্বাধ্যায়—স্বীয় স্বীয় শাখান্তর্গত বেদাদি শাস্ত্র) আচার্য্যের অভীষ্ট ধন আহরণ করিয়া, সেই ধনের দ্বারা তাঁহার সন্তোষ উৎপন্ন করিবে। তৎপরে দার-পরিগ্রহ করিয়া সন্তান-উৎপাদনের চেষ্টা করিবে—কদাচ সন্তান উৎপাদনের ব্যতিক্রম করিও না, সত্যপথ হইতে ভ্রষ্ট হইও না, ধর্ম্মপথ হইতে ভ্রষ্ট হইও না, মঙ্গলকার্য্য হইতে বিরত হইও না, ঐশ্বর্য্য ও সম্পত্তি সাধন ব্যাপার হইতে বিরত হইও না।

স্বাধ্যায় ও প্রবচন অর্থাৎ শাস্ত্রাধ্যয়ন ও অধ্যাপনা হইতে কখন বিরত হইও না, দেবতা ও পিতৃকার্য্য অর্থাৎ দেবার্চ্চনা ও তর্পণ শ্রাদ্ধাদি কার্য্য হইতে বিরত হইও না। মাতাকে দেবতাজ্ঞানে সেবা করিবে (মাতা দেবতা যস্য সঃ মাতৃদেবঃ) পিতাকে দেবতা জ্ঞানে তাঁহার সেবা করিবে। আচার্য্যকে দেবতা জ্ঞানে সেবা করিবে। যাহা সুন্দর, অনিন্দিত ও শিষ্টাচার-লক্ষণযুক্ত এইরূপ কর্ম্ম আচরণ করিবে। কোন নিন্দিত কর্ম্ম করিবে না। আমাদিগের (আচার্য্যের) যে সুচরিত অর্থাৎ ধর্ম্মানুমোদিত কার্য্য, তাহাই করিবে। বিপরীত কার্য্য অর্থাৎ আমার কোন গর্হিত কার্য্য, তাহার অনুকরণ করিবে না।

যে সমস্ত ব্রাহ্মণ আমাদের হইতে শ্রেষ্ঠ, তাঁহাদের সহিত একাসনে উপবেশন করিয়া নিঃশ্বাস প্রশ্বাস ফেলিবে না, অর্থাৎ দূর হইতে উপদেশ গ্রহণ করিবে। যখনই দান করিবে, শ্রদ্ধার সহিত দান করিবে, অশ্রদ্ধার সহিত কখনও দান করিবে না। সঙ্গতি অনুযায়ী দান করিবে। হ্রিয়া অর্থাৎ লজ্জার সহিত দান করিবে, [যখন দান করিবে, তখন দান উপযুক্ত হয় নাই, আরও বেশী দান করা উচিত ছিল, এইরূপ জ্ঞানে লজ্জার সহিত দান করিবে। অধিক দান করিতে না পারিয়া লজ্জাবোধ করিতেছ এইভাবে দান করিবে] ভয়ের সঙ্গে দান করিবে (অর্থাৎ দান করা যে কর্ত্তব্য, সেই দান উপযুক্ত না হইলে, তাহা হইতে আমার যে কর্ত্তব্যের অননুষ্ঠান হইল, এবং তাহা হইতে যে অমঙ্গলের উৎপত্তি হইবে, তাহা হইতে মনে যে আশঙ্কার উদয় হয়, এখানে সেই আশঙ্কার কথা বলা হইয়াছে) মিত্রাদি কার্য্যে দান করিবে। কর্ম্মক্ষেত্রে এইরূপ কার্য্য করিতে করিতে যদি তোমার কর্ম্ম বিষয়ে বা সদাচার বিষয়ে কোন সন্দেহ উপস্থিত হয়, তাহা

হইলে যে সমস্ত ব্রাহ্মণ বিচারক্ষম এবং যাঁহারা শ্রুতি স্মৃতি বিহিত কার্য্যে ও সদাচারে স্বীয় স্বীয় বুদ্ধিপ্রণোদিত হইয়া অভিযুক্ত আছেন, কিম্বা অপরের দ্বারায় উপদিষ্ট হইয়া ঐরূপ অভিযুক্ত আছেন, এবং যাঁহারা অলুক্ষা অর্থাৎ অক্রুরমতি এবং ধর্ম্মই যাঁহাদের একমাত্র কাম্যবস্তু, তাঁহারা যে স্থলে যেরূপ আচরণ করেন, তুমিও সেইস্থলে সেইরূপ করিবা। যদি কোন ব্যক্তি তোমার কোন কর্ম্ম বা আচারে দোষযুক্ত বলিয়া সন্দিহান হন, তাহা হইলে তুমি সে সময়েও ঐ সদাচার কার্য্যে রত থাকিয়া ঐরূপ বিচারক্ষম, সৎকর্ম্ম ও সাধু ব্যবহারে নিযুক্ত ব্রাহ্মণেরা যেরূপস্থলে যেরূপ ব্যবহার করেন, তুমিও সেইরূপ ব্যবহার করিবা। এই হইল, তোমার প্রতি আদেশ, এবং এই হইল তোমার প্রতি উপদেশ অর্থাৎ তুমিও তোমার পুত্র ও শিষ্যদিগকে এইরূপ আচরণ করিতে উপদেশ দিবা। এই বেদোপনিষৎ অর্থাৎ বেদরহস্য, ঈশ্বরানুশাসন, এই অনুশাসন অর্থাৎ বিধিসঙ্গত উপদেশ, এইরূপে তোমার কার্য্য করিয়া যাইতে হইবে। এই তোমার উপাস্য। স্বাধ্যায় প্রবচন হইতে কখনও ভ্রষ্ট হইবে না, উহাই তোমার উপাস্য. সন্দেহ উপস্থিত হইলেও, তাহাতেই নিযুক্ত থাকিবে। এই বাক্য প্রতিবার পাঠ করিবার সময় সাতবার পাঠ করিতে হইবে।

অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার স্থান প্রাচীনেরা যে কত উচ্চে রাখিয়াছিলেন, তাহার পরিচয় তৈত্তিরীয়োপনিষদের নবম অনুবাকে পাওয়া যায়।

ঋতঞ্চ স্বাধ্যায় প্রবচনেচ। সত্যঞ্চ স্বাধ্যায় প্রবচনেচ। তপশ্চ স্বাধ্যায় প্রবচনেচ। দময়শ্চ স্বাধ্যায় প্রবচনেচ। শময়শ্চ স্বাধ্যায় প্রবচনেচ। অগ্নয়শ্চ স্বাধ্যায় প্রবচনেচ। অগ্নিহোত্রঞ্চ স্বাধ্যায় প্রবচনেচ। অতিথয়শ্চ স্বাধ্যায় প্রবচনেচ। মানুষঞ্চ স্বাধ্যায় প্রবচনে চ। প্রজা চ স্বাধ্যায় প্রবচনে চ। প্রজনশ্চ স্বাধ্যায় প্রবচনে চ। প্রজাতিশ্চ স্বাধ্যায় প্রবচনে চ। সত্যমিতি সত্যবচা রাথীতরঃ। তপইতি তপোনিত্যঃ পৌরুশিষ্টিঃ। স্বাধ্যায় প্রবচনে এবেতি নাকো মৌদ্গল্যঃ তদ্ধি তপস্তদ্ধি তপঃ ॥ ১ ॥ প্রজাচ স্বাধ্যায় প্রবচনে চ ষট্চ ॥ ইতিনবমোঽনুবাকঃ ॥

(এই বিশ্বের অপরিবর্ত্তনীয় শাশ্বত নিয়মকে 'ঋত' বলে) ঋতের অনুষ্ঠান করিবে, কিন্তু ইহার সহিত স্বাধ্যায় ও প্রবচনেরও অনুষ্ঠান করিবে। সত্যের অনুষ্ঠান করিবে এবং সঙ্গে সঙ্গে স্বাধ্যায় ও প্রবচনের অনুষ্ঠানও করিবে। তপস্যার অনুষ্ঠান অর্থাৎ ধর্ম্মার্থ শারীরিক কৃচ্ছ্র সাধনাদি সম্পাদন করিবে ও তৎসঙ্গে স্বাধ্যায় ও প্রবচনের অনুষ্ঠান করিবে। বহিরিন্দ্রিয়ের সংযম অনুষ্ঠান করিবে ও সঙ্গে সঙ্গে স্বাধ্যায় ও প্রবচনের অনুষ্ঠান করিবে। অন্তরিন্দ্রিয়ের

সংযম সাধন করিবে ও সঙ্গে সঙ্গে স্বাধ্যায় ও প্রবচনের অনুষ্ঠান করিবে। যথারীতি অগ্নি সংস্থাপন করিবে, ও সঙ্গে সঙ্গে স্বাধ্যায় ও প্রবচনের অনুষ্ঠান করিবে। অগ্নিহোত্র যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিবে ও সঙ্গে সঙ্গে স্বাধ্যায় প্রবচনের অনুষ্ঠান করিবে। অতিথি পুজাদি সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে ও সঙ্গে সঙ্গে স্বাধ্যায় প্রবচনের অনুষ্ঠান করিবে। লৌকিক ব্যবহার সুসম্পন্ন করিবে ও সঙ্গে সঙ্গে স্বাধ্যায় ও প্রবচনের অনুষ্ঠান করিবে। প্রজা অর্থাৎ সন্তান উৎপাদনে যত্নবান থাকিবে এবং সঙ্গে সঙ্গে স্বাধ্যায় প্রবচনের অনুষ্ঠান করিবে। উপযুক্তকালে ভার্য্যা-সন্নিধানে গমন করিবে ও সঙ্গে সঙ্গে স্বাধ্যায় ও প্রবচনের অনুষ্ঠান করিবে। পৌত্রাদির উৎপত্তি বিষয়ে পুত্রকে নিয়োজিত করিবে ও সঙ্গে সঙ্গে স্বাধ্যায় ও প্রবচনের অনুষ্ঠান করিবে। সত্যবাক রাথীতর আচার্য্য সত্যানুষ্ঠানের উপদেষ্টা আর তপোনিত্য পৌরুশিষ্টি আচার্য্য তপস্যার অনুষ্ঠানের উপদেশ দিয়াছেন আর মৌদ্গল্য গোত্রীয় নাক নামক আচার্য্য স্বাধ্যায় ও প্রবচন, অধ্যয়ন অনুষ্ঠানের উপদেশ দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন উহাই তপস্যা, উহাই তপস্যা। ইহা ছয়বার পাঠ করিতে হইবে।

বীর্য্য-সংরক্ষণই ব্রহ্মচারীর প্রধান লক্ষণ। কেবল উপযুক্তকালে যাঁহারা স্ত্রীর সন্নিধানে গমন করেন, তাঁহাদের গৃহস্থাশ্রমেও ব্রহ্মচর্য্য রক্ষিত হয়। যাঁহারা পাঠ-সমাপনান্তে গুরুগৃহ পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মে চিত্ত সমর্পণ করেন, তাঁহাদিগকে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী বলে (life-long celebates)।

ব্রহ্মচারীর কর্ত্তব্য।

ব্রহ্মচারি-জীবনের কর্ত্তব্য শ্রীমদ্ভাগবতে অতি সুন্দররূপে সংক্ষেপে বর্ণিত আছে। তাহা নিম্নে দেওয়া গেল। "ব্রহ্মচারী গুরুকুলে বসন্ দান্তো গুরোর্হিতম্। আচরন্ দাসবন্নীচো গুরৌ সুদৃঢ়-সৌহৃদঃ॥ সায়ং প্রাতরুপাসীত গুর্ব্বগ্ন্যর্ক-সুরোত্তমান্। সান্ধ্যে উভে চ যতবান্ জপন্ ব্রহ্মসনাতনম্। ছন্দাংস্যধীয়ত গুরোরাহূতশ্চেৎ সুযন্ত্রিতঃ। উপক্রমেঽবসানে চ চরণৌ শিরসা নমেৎ॥ মেখলা জিনবাসাংসি জটাদণ্ডকমণ্ডলুন্। বিভৃয়াদুপবীতঞ্চ দর্ভপাণির্যথোদিতম্॥ সায়ং প্রাতশ্চরেদ্ভৈক্ষ্যং গুরবে তন্নিবেদয়েৎ। ভুঞ্জীত যদ্যনুজ্ঞাতো নোচেদুপবসেৎ ক্বচিৎ॥ সুশীলো মিতভুগ্দক্ষঃ শ্রদ্দধানো জিতেন্দ্রিয়ঃ। যাবদর্থং ব্যবহরেৎ স্ত্রীষু স্ত্রীনির্জ্জিতেষু চ॥ বর্জ্জয়েৎ প্রমদাগাথামগৃহস্থো বৃহদ্‌ব্রতঃ। ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথিনি হরন্ত্যপি যতের্ম্মনঃ॥ কেশপ্রসাধনোন্মর্দ্দস্নপনাভ্যঞ্জনাদিকম্। গুরুস্ত্রীভির্যুবতিভিঃ কারয়েন্নাত্মনো যুবা॥ নন্বগ্নিঃ প্রমদানাম ঘৃতকুম্ভসমঃ পুমান্। সুতামপি রহো জহ্যাদন্যদা

যাবদর্থকৃৎ ॥ কল্পয়িত্বাত্মনা যাবদাভাসমিদমীশ্বরঃ। দ্বৈতং তাবন্ন বিরমেৎ তমোহস্য বিপর্য্যয়ঃ ॥”

ব্রহ্মচারী সংযতেন্দ্রিয় হইয়া গুরুকুলে বাস করতঃ, গুরুতে সুদৃঢ় সৌহার্দ্দ স্থাপনপূর্ব্বক নীচ দাসের ন্যায় গুরুর হিতানুষ্ঠান করিবে। গুরু, অগ্নি, সূর্য্য ও দেবতাদিগের উপাসনা করিবে, এবং গায়ত্রী-জপ ও ত্রিকালে সন্ধ্যা করিবে, এবং সায়ং-প্রাতঃ উভয় সন্ধ্যাকালেই মৌনী হইয়া থাকিবে। গুরু যখন আহ্বান করিবেন, তখন মন ও দেহ উত্তমরূপে স্থির করিয়া তাঁহার নিকট বেদাধ্যয়ন করিবে। অধ্যয়নের আরম্ভে ও অবসানে মস্তকদ্বারা স্পর্শ-পূর্ব্বক গুরু-চরণে প্রণাম করিতে হইবে। মেখলা, অজিন, বসন, জটা, দণ্ড, কমণ্ডলু ও উপবীত ধারণ করিবে এবং কুশহস্ত হইয়া থাকিবে। সায়ংকালে ও প্রাতঃকালে ভিক্ষা করিয়া ভিক্ষালব্ধ বস্তু গুরুকে নিবেদন করিবে; পরে গুরুর নিকট অনুজ্ঞা পাইলে, আপনি ভোজন করিবে; নচেৎ উপবাস করিয়া দিনপাত করা উচিত। ব্রহ্মচারী সুশীল, মিতভোজী, কার্য্যদক্ষ, শ্রদ্ধাশীল হইবে, এবং জিতেন্দ্রিয় হইয়া স্ত্রীগণের এবং স্ত্রী-জিত ব্যক্তিগণের সহিত আপনার প্রয়োজনমত ব্যবহার করিবে। গৃহস্থ ব্যতীত ব্রহ্মচারীমাত্রেই নারীঘটিত কথাবার্ত্তা পরিত্যাগ করিবে; কেননা প্রবল ইন্দ্রিয় সকল যতিরও মন হরণ করে। যুবা শিষ্য, যুবতী গুরুপত্নী দ্বারা আপনার কেশ প্রসাধন, গাত্রমর্দ্দন, স্নপন ও অভ্যঞ্জনাদিকার্য্য করাইবে না; কারণ প্রমদা অগ্নিতুল্য, পুরুষ ঘৃতকুম্ভ সদৃশ। নির্জ্জনে কন্যার সহিতও অবস্থিতি নিষিদ্ধ। অন্য সময়ে (কেশ-প্রসাধনাদি-ব্যতিরিক্ত-সময়ে) প্রয়োজনমত তদীয় কার্য্য করিবে। যতদিন না আত্মসাক্ষাৎকার দ্বারা দেহাদিকে আভাসমাত্র বিবেচনা করিয়া জীব স্বতন্ত্র হইতেছেন, ততদিন ভেদজ্ঞান থাকিবে। ভেদজ্ঞান হইতেই বিপর্য্যয়; ভোক্তা ও ভোগ্য, এই ভেদজ্ঞান থাকিতে স্ত্রীসঙ্গ পরিহার কর্ত্তব্য।

ঋষি ভরদ্বাজের ব্রহ্মচর্য্য।

সমগ্র হিন্দুশাস্ত্রেই ব্রহ্মচর্য্যের ভূয়সী প্রশংসা দৃষ্ট হয়। এরূপ কিংবদন্তী আছে যে ঋষি ভরদ্বাজ তিন জন্ম ব্রহ্মচর্য্যে অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তৃতীয় জন্মের শেষে ইন্দ্র তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে চতুর্থ জন্ম প্রাপ্ত হইলে ভরদ্বাজ কি করিবেন। তাহাতে ভরদ্বাজ উত্তর করিয়াছিলেন যে আমি চতুর্থ জন্ম পাইলেও ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিব।

“ভরদ্বাজোহত্রিরায়ুর্ভির্ব্রহ্মচর্য্যমুবাস, তং হ জীর্ণম্ স্থবিরম্ শয়ানমিন্দ্রঃ উপব্রজ্য

উবাচ ভরদ্বাজ, যত্তে চতুর্থমায়ুর্দ্দদ্যাম কিমেতেন কুর্য্যাঃ ইতি, ব্রহ্মচর্য্যমেব ব্রতেন চরেয়ম্ ইতি হোবাচ ।

তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণঃ ।

ব্রহ্মচর্য্যের বিধান কেন ?

হিন্দুশাস্ত্র মানবজীবন চারিভাগে বিভক্ত করিয়া প্রথমভাগে ব্রহ্মচর্য্যেরই ব্যবস্থা করিয়াছেন। বিশ্ব হিতসাধনে যাহার সংকল্প, ব্রহ্মপ্রাপ্তিই যাহার চরম লক্ষ্য, তাহার পক্ষে স্বীয় শরীর, মন ও আত্মার উৎকর্ষ সাধনই প্রথম কর্ত্তব্য। যাহার যেখানেই জন্ম হউক, যে যে অবস্থাতেই জন্মগ্রহণ করুক, কর্ত্তব্য-পরিধি ক্ষুদ্রই হউক বা বৃহৎই হউক, ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া শরীর, মন ও আত্মাকে বলিষ্ঠ করিতে পারিলে মানবের জীবন নিষ্ফল হয় না। দুর্ব্বলকায় বা দুর্ব্বলচিত্ত ব্যক্তি নিজের বা পরের কাহারও কোন মঙ্গলসাধন করিতে পারে না। এই জন্যই আর্য্য ঋষিগণ জীবনের প্রথম অংশে ব্রহ্মচর্য্যের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। চাই তুমি ব্রহ্মচর্য্য শেষ করিয়া গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ কর, চাই তুমি আজীবন ব্রহ্মচর্য্য পালন কর, ইন্দ্রিয়-সংযম সর্ব্বাবস্থাতেই বিশেষ প্রয়োজনীয়। স্ত্রী, মদ্য, মাংস এবং প্রাণিহিংসা ব্রহ্মচারীর পক্ষে বিশেষরূপে নিষিদ্ধ। যে ইন্দ্রিয় জয় করিতে পারে এবং বিশ্বের প্রতি মৈত্রীভাব অবলম্বন করিতে পারে, তাহার পক্ষেই ব্রহ্মপ্রাপ্তি সম্ভব। এই জন্যই ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমের প্রতি তীব্র লক্ষ্য।

ব্রহ্মচর্য্যের শেষ কোথায় ?

ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমান্তে গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিলেও ব্রহ্মচর্য্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে হয়। বৈধ স্ত্রীসংসর্গ গৃহস্থাশ্রমে নিষিদ্ধ নহে। কেবল কর্ত্তব্যজ্ঞানে সৃষ্টিপ্রবাহ রক্ষার্থ স্ত্রীসংসর্গে কামপ্রবৃত্তির প্রশ্রয় দেওয়া হয় না এবং ব্রহ্মচর্য্যের হানি হয় না। গৃহস্থাশ্রম অন্তে বানপ্রস্থ আশ্রমে এবং তদন্তে ভিক্ষু আশ্রমেও ইন্দ্রিয়-সংযমের কঠোর ব্যবস্থা আছে। সুতরাং জীবনের কোন আশ্রমে ব্রহ্মচর্য্যের অবসান নাই।

সর্ব্বাবস্থাতেই যিনি যে অবস্থায় থাকুন, যাহার বৃত্তি যেরূপই হউক, তাহার পক্ষে ব্রহ্মে বিচরণ করা কর্ত্তব্য। সাধারণতঃ ব্রহ্মচারী বলিলে আমরা উহার সংকীর্ণ অর্থ গ্রহণ করিয়া থাকি, কিন্তু বস্তুতঃ ব্রহ্মচারী বলিলে যিনি ব্রহ্মে বিচরণ করেন অর্থাৎ ব্রহ্মপ্রাপ্তিই যাহার চরম লক্ষ্য তাহাকেই বুঝায়। ইংরাজী ভাষায় ইহাকে বলা হইয়া থাকে To live, move and have one's being in God অর্থাৎ ব্রহ্মেই জীবিত থাকা, ব্রহ্মেই বিচরণ করা এবং ব্রহ্মেই তাহার

সত্তা অনুভব করা। জলে যে বিচরণ করে, তাহাকে আমরা বলি "জলচর," স্থলে বিচরণ করে, তাহাকে বলি "স্থলচর," ব্যোমে যে বিচরণ করে, তাহাকে বলি "ব্যোমচর"। ব্রহ্মে যিনি বিচরণ করেন, তিনি "ব্রহ্মচারী।" 'চর' ও 'চারী' একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। বিহঙ্গেরা ব্যোমচারী। ব্যোমে বিচরণ করিতে তাহাদের বিশেষ প্রযত্নের প্রয়োজন হয় না। স্বাভাবিক শক্তিবশতই তাহারা ব্যোমে বিচরণ করিতে পারে। মৎস্যাদি জলচর জীবের পক্ষেও ঐরূপ। মানবের পক্ষে ব্রহ্মে বিচরণ এরূপ স্বাভাবিক শক্তির উপর নিহিত নহে। ইহাতে তাহার ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগ অর্থাৎ প্রযত্ন আবশ্যক। মানবাত্মায় ব্রহ্মপ্রাপ্তির ইচ্ছা বীজভাবে নিহিত আছে। উহা ক্রিয়াদ্বারা অঙ্কুরিত করা আবশ্যক।

ব্রহ্ম কি?

যিনি বৃহৎ অর্থাৎ অসীম, যাঁহা হইতে এই বিশ্ব উদ্ভূত হইয়াছে, যিনি এই বিশ্বের পালন করিতেছেন এবং যাঁহাতে এই বিশ্ব লীন হয়, তিনিই ব্রহ্ম। শ্রুতি বলিতেছেন "তজ্জলানীতি শান্তউপাসিতঃ। তস্মাজ্জায়তে, তস্মিন্ লীয়তে, তস্মিন্ অনিতি ইতি তজ্জলানি।" এই ব্রহ্মকে শান্তভাবে উপাসনা করিতে হইবে। ব্রহ্মের জ্ঞান সকলের পক্ষে এক নহে। ব্রহ্ম সম্বন্ধে মনুষ্যের বিভিন্ন ধারণা রহিয়াছে। বালকের ব্রহ্ম ও বৃদ্ধের ব্রহ্ম এক নহে। অধিকারভেদে ব্রহ্মজ্ঞানের বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়। এই বিভিন্ন জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও এটুকু বলা যাইতে পারে যে প্রত্যেকেরই সর্বোচ্চ আদর্শই তাহার ব্রহ্ম। সকলেই যে ব্রহ্মকে একভাবে চিন্তা করিতে পারিবে ইহা সম্ভব নহে। যাহার যেরূপ আদর্শ, তাহার ভাবনাও সেইরূপ। এই জন্যই ভগবান গীতায় বলিয়াছেন "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।" অর্থাৎ যে আমাকে যেভাবে ভাবনা করে আমি তাহার নিকট সেইভাবেই উপস্থিত হই। সরল বিশ্বাস অনুসারে জীবন পরিচালিত করিলে, ক্রমে উচ্চ হইতে উচ্চতর আদর্শ বুদ্ধির গোচর হয়। আদর্শ উচ্চ হইতে উচ্চতর হইতেছে, কি নিম্ন হইতে নিম্নতর হইয়া যাইতেছে, তাহা প্রত্যেকেই স্বীয় স্বীয় জীবন অনুভব করিতে পারে। আরোহণ করিতেছি, কি অবরোহণ করিতেছি, তাহা আমরা সকলেই বুঝিতে পারি। পরদ্রব্যের প্রতি আমাদের লোভ আছে কি না, পরস্ত্রীর প্রতি আমাদের মাতৃভাব হইয়াছে কি না, সত্যের প্রতি আমাদের আস্থা কতদূর এবং মিথ্যার প্রতি ঘৃণা কতদূর, পরোপকারবৃত্তি আমাদের কিরূপ বিকাশ পাইয়াছে, এইরূপ আত্ম-পরীক্ষায় আমাদের ঊর্দ্ধগতি বা অধোগতি হইতেছে, তাহা আমরা বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি।

চিত্ত-প্রসাদ।

চিত্তপ্রসাদ ব্রহ্মচর্য্যের একটী উজ্জ্বল লক্ষণ। যিনি যতই মুখে ধর্ম্মের কথা বলুন, যিনি যতই বাহ্য আচারসম্পন্ন হউন, যিনি যতই সামাজিক নিয়ম প্রতিপালন করুন, তিনি ব্রহ্মে বিচরণ করিতেছেন কি না, তাহা তাঁহার চিত্তের প্রসন্নতা ও অপ্রসন্নতা দ্বারা তিনি নিজেই বুঝিতে পারিবেন। যাঁহার চিত্তে প্রসাদের ক্রমশঃ আবির্ভাব পরিদৃষ্ট না হয়, তাঁহার ব্রহ্মে বিচরণ হইতেছে বলিয়া হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। যাঁহার চিত্ত নির্ব্বাতাবস্থ দীপের ন্যায় অকম্পিতভাবে অন্তর্নিহিত প্রসাদ চতুর্দ্দিকে আনন্দজ্যোতি বিকীরণ করে, তাঁহারই চিত্ত যে ব্রহ্মের দিকে অগ্রসর হইতেছে, তাহা সহজেই বুঝা যায়। "ব্রহ্মে বিচরণ" অর্থ এই যে আমার জীবনের আদর্শ মহৎ হইতে মহত্তর করিব, এবং তদনুসারে আমার জীবনের সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করিব। আমার আদর্শ প্রথমে অতি ক্ষুদ্র হউক, তাহাতে ক্ষতি নাই। কিন্তু যে আদর্শ আমার নয়নের সম্মুখে থাকিবে, সেই আদর্শদ্বারা আমার জীবনকে নিয়মিত করাই যথার্থ ব্রহ্মচর্য্য।[৭]

পুরুষসূক্ত

নারায়ণোনাম ঋষিঃ পুরুষো দেবতা।

অনুষ্টুপ্ ও ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ।

সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
স ভূমিং বিশ্বতো বৃত্বাত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলং ॥ ১ ॥

(১) **সহস্রশীর্ষা**—অনন্ত শিরযুক্ত। সহস্র শব্দের উপলক্ষণদ্বারা অনন্ত অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। "সহস্র শব্দস্য উপলক্ষণত্বাদনন্তৈঃ শিরোভির্যুক্ত ইত্যর্থঃ" সায়নঃ, "সহস্র শব্দ" বহুত্ববাচী মহীধরঃ। সর্ব্বপ্রাণিসমষ্টিরূপ ব্রহ্মাণ্ডদেহ যে বিরাট পুরুষ এইস্থলে তাঁহার কথা বলা হইতেছে। শির শব্দের স্থানে শীর্ষন্

---

৭ যাঁহারা ব্রহ্মচর্য্য সম্বন্ধে শাস্ত্রের আদেশ উপদেশ আরও বিশেষভাবে অবগত হইতে চাহেন, তাঁহারা সম্পাদক-প্রণীত "আমিত্বের প্রসার" নামক গ্রন্থের "ব্রহ্মচর্য্য"-শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করিবেন।

আদেশ। শির শব্দের উপলক্ষণদ্বারা সর্ব্বাবয়বকে বুঝাইতেছে অর্থাৎ মস্তক এবং অন্যান্য অবয়ব সম্পন্ন।

(২) সহস্রাক্ষঃ—অনন্তচক্ষুযুক্ত। পূর্ব্বের ন্যায় সহস্র শব্দে অনন্ত বুঝাইবে। অক্ষিশব্দদ্বারা কর্ণাদি অন্যান্য জ্ঞানেন্দ্রিয় বুঝাইবে। (৩) সহস্রপাৎ—অনন্ত-পাদযুক্ত। পাদশব্দদ্বারা হস্তাদি অন্যান্য কর্ম্মেন্দ্রিয়ও বুঝাইবে। (৪) সঃ—সেই। (৫) পুরুষঃ—পিপর্ত্তি পূরয়তি বলং যঃ, পুষু শেতে য ইতি বা যিনি বল পূরণ করেন অথবা হৃদয়মন্দিরে অবস্থান করেন। (৬) ভূমিং—ব্রহ্মাণ্ড গোলকরূপাং—বিশ্ব জগৎ (সায়ন,) ভূমি শব্দো ভূতোপলক্ষকঃ পঞ্চভূতানি ব্যাপ্য, পঞ্চভূত। (৭) বিশ্বতঃ—ঊর্দ্ধে, নিম্নে সর্ব্বত্র ; যজুর্ব্বেদে "সর্ব্বতো" পাঠ আছে। (৮) বৃত্বা—পরিবেষ্টা—ব্যাপ্ত করিয়া (যজুর্ব্বেদে "স্পৃত্বা" পাঠ আছে। (৯ দশাঙ্গুলং—ব্রহ্মাণ্ড বহির্দেশম্ অনন্তমপারমিত্যর্থঃ। অথবা নাভেরুপরিদশাঙ্গুলং হৃদয়ং ; ব্রহ্মাণ্ড বহির্দ্দেশ অথবা নাভি হইতে দশাঙ্গুল ব্যবধান হৃদয়। (১০) অত্যতিষ্ঠৎ,—অতিক্রম্যাবস্থিতঃ। অবস্থিত আছেন। বিশ্বস্থ তাবৎ পদার্থই যে সেই বিরাটরূপী পুরুষের অংশ এবং সূক্তে তাহাই বলা হইতেছে।

অনন্ত শির (অবয়ব) যুক্ত, অনন্ত চক্ষু (জ্ঞানেন্দ্রিয়) যুক্ত, অনন্ত পাদ (কর্ম্মেন্দ্রিয়) যুক্ত, বিরাট পুরুষ ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপ্ত করিয়া আছেন, এবং তিনি মানবের নাভিপ্রদেশ হইতে দশাঙ্গুল পরিমিত স্থান অতিক্রম করিয়া হৃদয়ে অবস্থিতি করিতেছেন।

পুরুষ এবেদং সর্ব্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভব্যং।
উতামৃতত্বস্যেশানো যদন্নেনাতিরোহতি ॥ ২ ॥

(১) পুরুষঃ—পুরুষ। পূর্ব্ব শ্লোক দেখ। (২) এব—ই। এই পুরুষই। (৩) ইদং—এই। (৪) সর্ব্বং—সর্ব্ব। (৫) যৎ—যাহা। (৬) ভূতং—অতীত জগৎ। (৭) যৎ—যাহা। (৮) চ—ও। (৮) ভব্যং—ভবিষ্যৎ জগৎ। (১০) উত—অপি। (১১) অমৃতত্বস্য—অমরণধর্ম্মত্বস্য কৈবল্যস্য। অমৃতত্বের অর্থাৎ মোক্ষের। (১২) ঈশানঃ—স্বামী। (১৩) যৎ—যাহা। কিম্বা যাহা হইতে ; দ্বিতীয়া বা পঞ্চমী। (১৪) অন্নেন—অন্ন দ্বারা। (১৫) অতিরোহতি—উৎপদ্যতে। যাহা উৎপন্ন হয়। বা কারণাবস্থামতিক্রম্য পরিদৃশ্যমানং জগদবস্থাং প্রাপ্নোতি। অথবা পরম পুরুষ স্বীয় কারণ অবস্থা পরিত্যাগ করিয়া পরিদৃশ্যমান জগৎরূপ কার্য্যাবস্থা প্রাপ্ত হন।

অন্বয়ঃ। যদিদং ভূতং যচ্চ ভব্যং তৎ সর্ব্বং পুরুষ এব। সঃ পুরুষ উত

অমৃতস্য ঈশানঃ কিঞ্চ যদন্নেনাতিরোহতি তস্য সর্ব্বস্য চেশানঃ। যদ্বা যস্মাদন্নেন অতিরোহতি তস্মাৎ পুরুষ এব।

অনুবাদ। এই বিশ্ব জগতে যাহা কিছু হইয়াছে ও হইবে তৎ সমস্তই এই পুরুষ, ইনি মোক্ষের অধিপতি, এবং ব্রহ্মাদি স্তম্ব পর্য্যন্ত যাবৎ জীব, যাহা অন্ন অর্থাৎ ভোগ্যবস্তুর দ্বারা পরিবর্দ্ধিত হয়, ইনি তৎ সমুদায়ের অধিপতি। অথবা যে পুরুষ ভোগ্যান্নের দ্বারা কারণ অবস্থা পরিত্যাগ করিয়া জগদবস্থা প্রাপ্ত হন।

এতাবানস্য মহিমাতো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ।
পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি ॥ ৩ ॥

(১) এতাবান্—এই সমুদায় অর্থাৎ ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান তাবৎ বস্তু। (২) অস্য—ইহার (পুরুষের)। (৩) মহিমা—মহিমা। (৪) অতঃ—এই মহিমা হইতে। (৫) জ্যায়ান্—অত্যন্ত অধিক। (৬) পুরুষঃ—পূর্ব্বের শ্লোক দেখ। (৭) পাদঃ—অংশ অর্থাৎ চতুর্থাংশ। (৮) অস্য—ইহার। (৯) বিশ্বা—সকল (১০) ভূতানি—প্রাণিসমূহ। (১১) ত্রিপাৎ—পৃথিবী অন্তরীক্ষ দ্যুলোক ব্যাপী পরব্রহ্মের স্বরূপ। (১২) অস্য—ইহার (পুরুষের)। (১৩) অমৃতং—বিনাশ-রহিতং সৎ। ত্রিপাৎস্বরূপ অমৃত। (১৪) দিবি—দ্যোতনাত্মকে স্বপ্রকাশে স্বরূপে।

অন্বয়ঃ। এতাবানস্য মহিমা পুরুষোঽতঃ (মহিম্নঃ) জ্যায়ান বিশ্বা ভূতানি অস্য পাদঃ অস্য ত্রিপাৎ অমৃতং দিবি।

বঙ্গানুবাদ। এই সমুদায় তাঁহার মহিমা, ইহা তাঁহার প্রকৃতস্বরূপ নহে; প্রকৃতপুরুষ ইহা অপেক্ষা অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ। বিশ্বস্থ তাবৎ পদার্থ পরমপুরুষের অংশ মাত্র কিন্তু ইহার ত্রিপাদ স্বরূপ অমৃত অর্থাৎ পৃথিবী অন্তরীক্ষ ও দ্যুলোক-ব্যাপী বিনাশরহিত স্বরূপ স্বীয়রূপেই অবস্থিতি করিতেছেন।

ত্রিপাদূর্দ্ধ উদৈৎ পুরুষঃ পাদোঽস্যেহাভবৎ পুনঃ।
ততো বিষঙ্ ব্যক্রমাৎ সাশনানশনে অভি ॥ ৪ ॥

(১) ত্রিপাৎ—পুরুষঃ, সংসার-স্পর্শ-রহিত ব্রহ্ম স্বরূপঃ। সংসার-স্পর্শ-রহিত ব্রহ্মস্বরূপ। (২) ঊর্দ্ধ—অজ্ঞান কার্য্যাৎ সংসারাৎ বহির্ভূতঃ সন্ অজ্ঞান কার্য্যের ঊর্দ্ধে অর্থাৎ বহির্ভাগে। (৩) উৎ ঐৎ উদৈৎ—উৎকর্ষেণ স্থিতবান্। বিশিষ্টরূপে থাকেন। (৪) পুরুষ—পূর্ব্বের শ্লোকে দেখ। (৫) পাদঃ—অংশ। (৬) অস্য—ইহার। (৭) ইহ—মায়ায়াং; মায়া জগতে।

(৮) অভবৎ পুনঃ—সৃষ্টিসংহারাভ্যাং পুনঃ পুনরাগচ্ছতি। সৃষ্টি এবং সংহারের জন্য পুনঃ পুনঃ আগমন করেন। (৯) ততঃ—মায়ায়ামাগত্যানন্তরং। মায়াজগতে আগমনানন্তর। (১০) বিষঙ্—দেবতির্য্যগাদিরূপেণ বিবিধঃ সন্। দেব এবং ইতর প্রাণিরূপে বিবিধ প্রকার হইয়া। (১১) ব্যক্রমাৎ ব্যাপ্তবান্—ব্যাপ্ত হইয়া থাকেন। (১২) সাশনানশনে—অশনেন সহ বর্ত্তমানং সাশনং চেতন-প্রাণিজাতং। অর্থাৎ যাবৎ চেতন পদার্থ। অনশনং—তৎ রহিতং অর্থাৎ অচেতন পদার্থ। সাশনঞ্চ অনশনঞ্চ সাশনানশনে অর্থাৎ চেতনাচেতন পদার্থ। (১৩) অভিলক্ষ্য অর্থাৎ চেতনাচেতন উভয় পদার্থকে লক্ষ্য করিয়া।

অন্বয়ঃ। ত্রিপাৎ পুরুষঃ উর্দ্ধ উদৈৎ অস্য পাদ পুনঃ ইহ অভবৎ ততঃ সাশনানশনে অভিবিষঙ্ ব্যক্রমাৎ।

বঙ্গানুবাদ। ত্রিপাদ পুরুষ অজ্ঞানময় সংসারের বহির্ভাগে বাস করেন, কিন্তু তাঁহার অংশ সৃষ্টি-স্থিতিসংহারহেতুক মায়াজগতে পুনঃ পুনঃ আবির্ভূত হয়। মায়াজগতে আগমনানন্তর তিনি বহুবিধরূপ ধারণ করিয়া চেতনাচেতন তাবৎ পদার্থে ব্যাপ্ত হইয়া থাকেন।

তস্মাদ্বিরাড়জায়ত বিরাজো অধিপূরুষঃ।
স জাতো অত্যরিচ্যত পশ্চাদ্ভূমিমথো পুরঃ ॥ ৫ ॥

(১) তস্মাৎ আদি পুরুষাৎ। সেই আদি পুরুষ হইতে। (২) বিরাট্—বিবিধানি রাজন্তে বস্তূন্যত্রেতি বিরাট্ তাবৎ বস্তুতে বিবিধ হইয়া বিরাজ করে, এই অর্থে বিরাট। অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ড দেহ। (৩) অজায়ত—জন্মিয়াছিলেন। (৪) বিরাজঃ অধি—বিরাট্ দেহকে আশ্রয় করিয়া। (৫) পুরুষঃ—দেহাভিমানী পুরুষ। (৬) সঃ জাতঃ—তিনি জন্মিয়া। (৭) অত্যরিচ্যতে—দেবতির্য্যগ্মনুষ্যাদিরূপোঽভূৎ। দেহাভিমানী পুরুষ দেবতা তির্য্যগ্‌ মনুষ্যাদি নানারূপ ধারণ করিয়াছিলেন। (৮) পশ্চাৎ—অনন্তরং। (৯) ভূমিং—ভৌতিক পদার্থ অর্থাৎ পঞ্চভূত। (১০) অথো—অনন্তরং। (১১) পুরঃ—শরীরাণি—পূর্য্যন্তে সপ্তভির্ধাতুভিরিতি, সপ্তধাতু অর্থাৎ শোণিত, মাংস, মেদ, স্নায়ু, অস্থি, মজ্জা, শুক্র দ্বারা পূর্ণ হয় যাহা, এমত শরীর।

অন্বয়ঃ। তস্মাৎ বিরাট্ অজায়ত পুরুষঃ বিরাজোঽধি, সঃ জাতঃ সন্ অত্যরিচ্যত পশ্চাৎ ভূমিং সসর্জ্জ অথ ভূমেঃ সৃষ্ট্যানন্তরং পুরঃ জীবানাং শরীরাণি সসর্জ্জ।

বঙ্গানুবাদ। সেই নিরাকার পরম পুরুষ হইতে বিরাট অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডরূপ দেহ উৎপন্ন হইল এবং সেই বিরাট দেহের উপরে অর্থাৎ বিরাট দেহ আশ্রয় করিয়া দেহাভিমানী পুরুষ জন্মিলেন। সর্ব্ব বেদান্তবেদ্য পরমাত্মা মায়াদ্বারা বিরাট দেহ সৃষ্টি করিয়া তাহাতে জীবরূপে প্রবেশ করিয়া ব্রহ্মাণ্ডাভিমানী জীব হইলেন; তিনি যখন জীবরূপ ধারণ করিলেন তখন দেবতা মনুষ্যাদি বিবিধরূপ ধারণ করিলেন এবং পঞ্চভূত ও জীব-শরীরাদি সৃষ্ট হইল।

যৎ পুরুষেণ হবিষা দেবা যজ্ঞমতন্বত।
বসন্তো অস্যাসীদাজ্যং গ্রীষ্ম ইধ্মঃ শরদ্ধবিঃ ॥

(১) যৎ—যদা। (২) পুরুষেণ—দেহাভিমানী পুরুষের দ্বারা। (৩ হবিষা—পুরুষরূপ হ্বতের দ্বারা। (৪) দেবা পূর্ব্বোক্ত উৎপন্ন দেবতারা। (৫ যজ্ঞং—মানসযজ্ঞং। (৬) অতন্বত—সম্পাদন করিয়াছিলেন। (৭ বসন্তঃ—বসন্ত ঋতু (৮) অস্য—এই যজ্ঞের। (৯) আসীৎ=হইয়াছিল। (১০) আজ্যং=ঘৃতাদি যে সমস্ত পদার্থ দ্বারা আহুতি দেওয়া যায়। (১১) গ্রীষ্মঃ=গ্রীষ্ম ঋতু। (১২) ইধ্মঃ=যজ্ঞীয় কাষ্ঠ। (১৩) শরৎ=শরৎ ঋতু। (১৪) হবিঃ=ঘৃত।

অন্বয়ঃ। দেবাঃ পুরুষেণ হবিষা যদা যজ্ঞং অতন্বত অস্য যজ্ঞস্য বসন্তঃ আজ্যমাসীৎ গ্রীষ্ম ইধ্মঃ শরৎ হবিরাসীৎ।

বঙ্গানুবাদ। পূর্ব্বোক্ত প্রকারে উৎপন্ন দেবতারা যখন এই দেহাভিমানী পুরুষকে হবি স্বরূপ করিয়া সেই পরম পুরুষের মানসযজ্ঞ করিয়াছিলেন, অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডাত্মক দেহাভিমানী পুরুষকে অবলম্বন করিয়া নিরাকার [illegible] আরাধনা করিয়াছিলেন, তখন বসন্ত ঋতু তাঁহাদের পূজোপকরণ [illegible] গ্রীষ্ম কাষ্ঠস্বরূপ এবং শরৎ হবিস্বরূপ হইয়াছিল।

নিরাকার পরম পুরুষের ধারণা অসম্ভব বলিয়া বিরাট দেহাভিমানী পুরুষকে আশ্রয় করিয়া পরমাত্মার আরাধনা করা হইতেছে। কিঞ্চিৎ নিম্নেই দৃষ্ট হইবে, দেহাভিমানী পুরুষকে পশুস্বরূপ কল্পনা করা হইয়াছে এবং তাহাকে বধ করা হইতেছে; অত্র স্থলে পুরুষকে হবিস্বরূপ কল্পনা করা হইয়াছে। অহং ভাব পরিত্যাগ না করিলে জীবের মুক্তি হয় না, এই জন্য দেহাভিমানী পুরুষ অর্থাৎ জীবাত্মাকে হবিরূপে দগ্ধ করা হইতেছে, জীবাত্মার লয়েই পরমাত্মার বিকাশ। গ্রীষ্ম ঋতুকে উষ্ণতাতিশয্যহেতু কাষ্ঠরূপ কল্পনা করা হইয়াছে, সুখদ বসন্ত এবং শরৎ ঋতুকে যজ্ঞের উপকরণরূপে কল্পনা করা হইয়াছে।

তং যজ্ঞং বর্হিষি প্রৌক্ষন্ পুরুষং জাতমগ্রতঃ।
তেন দেবা অযজন্ত সাধ্যা ঋষয়শ্চ যে ॥ ৭ ॥

(১) তং = তাহাকে। (২) যজ্ঞং = যজ্ঞসাধনভূতং = যজ্ঞসাধনোপযোগী। (৩) বর্হিষি = যজ্ঞে বৃংহতে বর্দ্ধতে ইতি। যজ্ঞে মানসযজ্ঞে। (৪) প্রৌক্ষন্ = প্রোক্ষণাদিভিঃ সংস্কারৈঃ সংস্কৃতবন্তঃ। জলসিঞ্চনাদি সংস্কার দ্বারা সংস্কার করিয়াছিলেন। (৫) পুরুষং = দেহাভিমানী পুরুষং। দেহাভিমানবিশিষ্ট পুরুষ। (৬) জাতমগ্রতঃ = সৃষ্টেঃ পূর্ব্বং জাতং প্রাগুক্তং পুরুষং। (৭) তেন = পুরুষেণ। (৮) দেবাঃ = দেবতারা। (৯) অযজন্ত = পুরুষরূপেণ পশুনা মানসযাগং নিষ্পাদিতবন্তঃ। পুরুষরূপ পশুদ্বারা মানসযজ্ঞ নিষ্পাদন করিয়াছিলেন। (১০) সাধ্যাঃ সৃষ্টিসাধন-যোগ্যাঃ। সৃষ্টিসাধনে সমর্থ। (১১) ঋষয়ঃ = ঋষতি প্রাপ্নোতি সর্ব্বান্ মন্ত্রান্ জ্ঞানেন পশ্যতি সংসারপারং বা ইতি। যাহারা সর্ব্বমন্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছেন, কিম্বা জ্ঞানের দ্বারা সংসারের তত্ত্ব অবগত হইয়াছেন।

অন্বয়ঃ। দেবাঃ তং অগ্রতঃ জাতং যজ্ঞং পুরুষং বর্হিষি প্রৌক্ষন্ তেন তে অযজন্ত, কে দেবাঃ ? যে সাধ্যাঃ ঋষয়শ্চ।

বঙ্গানুবাদ। সৃষ্টিসাধনসমর্থ এবং তত্ত্বজ্ঞানী দেবতারা সেই অগ্রজাত দেহাভিমানী যজ্ঞীয় পুরুষকে মানসযজ্ঞে উৎসর্গ করিয়াছিলেন এবং তাহাকে অবলম্বন করিয়া পরমাত্মার উপাসনা করিয়াছিলেন।

তস্মাদ্ যজ্ঞাৎ সর্ব্বহুতঃ সংভৃতং পৃষদাজ্যং।
পশুন্তাংশ্চক্রে বায়ব্যানারণ্যান্ গ্রাম্যাশ্চ যে ॥ ৮ ॥

(১) তস্মাৎ = মানস যজ্ঞাৎ। সেই মানস যজ্ঞ হইতে। (২) যজ্ঞাৎ = যজ্ঞ হইতে। (৩) সর্ব্বহুতঃ—সর্ব্বাত্মকঃ পুরুষো যস্মিন্ যজ্ঞে হূয়তে, সর্ব্বাত্মক পুরুষকে যে যজ্ঞে আহুতি দেওয়া হইয়াছে। (৪) সংভৃতং—সম্পাদিতং তেন পুরুষেণ। পুরুষের দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছিল। (৫) পৃষদাজ্যং—দধি-মিশ্রমাজ্যং। দধিমিশ্রিত আজ্য। (৬) পশূন্—পশু। (৭) তান্—তাহাদিগকে। (৮) চক্রে উৎপাদন করিয়াছিলেন। (৯) বায়ব্যান্—বায়ু-দেবতাকান্। বায়ু হইয়াছেন দেবতা যাদের; বায়ু অন্তরীক্ষের অধিপতি, পশুগণ গৃহে বাস না করিয়া অনাবৃত স্থানে ভ্রমণ করিবার সময় বায়ুই তাহাদিগের রক্ষক। "বায়বস্থো দেবো বঃ" ইতিঃ যজুর্ব্বেদঃ। (১০) আরণ্যান্—হরিণ প্রভৃতি অরণ্যবাসী জন্তু। (১১) গ্রাম্যান্ = গো প্রভৃতি গ্রামবাসী জন্তু।

অন্বয়ঃ। তস্মাৎ সর্ব্বহুত যজ্ঞাৎ পৃষদাজ্যং সংভৃতং তেন পুরুষেণ ইতি

শেষঃ। ..স পুরুষঃ তান্ বায়বান্। পশূন্ চক্রে তান্ কান্ যে আরণ্যাঃ গ্রাম্যাশ্চ।

বঙ্গানুবাদ। সেই সর্ব্বহুত যজ্ঞ হইতে [illegible]। সেই পরম পুরুষ ঐ যজ্ঞ হইতে গ্রাম্য ও [illegible] পশু সৃষ্টি করিয়াছেন।

তস্মাদ্‌যজ্ঞাৎ সর্ব্বহুত ঋচঃ সামানি জজ্ঞিরে।

ছন্দাংসি জজ্ঞিরে তস্মাদ্‌যজুস্তস্মাদজায়ত ॥ ৯ ॥

বঙ্গানুবাদ। সেই সর্ব্বহুত যজ্ঞ হইতে ঋক্ মন্ত্র এবং সাম মন্ত্র গায়ত্র্যাদি ছন্দ, এবং যজুর্ম্মন্ত্র উৎপন্ন হইয়াছে।

ঋক্ বলিলে বেদের পদ্যময় অংশ বুঝায়। সাম বলিলে গেয় অংশকে বুঝায় এবং যজুঃ বলিলে যজ্ঞে ব্যবহৃত অংশকে বুঝায়।

তস্মাদশ্বা অজায়ন্ত যে কে চোভয়াদতঃ।

গাবোহজজ্ঞিরে তস্মা তস্মাজ্জাত অজাবয়ঃ ॥ ১০ ॥

বঙ্গানুবাদ। সেই যজ্ঞ হইতে ঘোটক, অন্যান্য দন্তপংক্তিধারী পশুগণ গাভী, ছাগ ও মেষগণ উৎপন্ন হইয়াছিল।

যৎ পুরুষং ব্যদধুঃ কতিধা ব্যকল্পয়ন্।

মুখং কিমস্য কৌ বাহূ কা উরূ পাদা উচ্যতে ॥ ১১ ॥

(১) যৎ—যদা। (২) পুরুষং—দেহাভিমানী পুরুষকে। (৩) ব্যদধুঃ—সংকল্পিতবন্তঃ। মানস যজ্ঞে পুরুষকে যে পশুরূপে সংকল্প করা হইয়াছিল। (৪) কতিধা—কতিভিঃ প্রকারৈঃ। কয় প্রকার। (৫) ব্যকল্পয়ন্—বিবিধং কল্পিতবন্তঃ। কল্পনা করিয়াছিলেন। (৬) মুখং—মুখ। (৭) কিম্—কোনটী। (৮) অস্য—ঐ পুরুষের। (৯) কৌ—কোন্ কোন্‌টী। (১০ বাহূ—বাহুদ্বয়। (১১) কৌ উরূ—কোন্‌টী উরুদ্বয়। (১২) পাদৌ উচ্যেতে—কোন্ অংশটী পাদরূপে কথিত হয়।

অন্বয়ঃ। যদা পুরুষং ব্যদধুঃ কতিধা ব্যকল্পয়ন্। কিমস্য মুখং কৌ বাহূ কৌ উরূ পাদৌ উচ্যতে আস্তামিত্যর্থঃ।

বঙ্গানুবাদ। দেহাভিমানী পুরুষকে যখন যজ্ঞে পশুরূপে সংকল্প করিয়া দেওয়া হইয়াছিল, তখন তাঁহার দেহের বিভিন্নাংশকে কিরূপ কল্পনা করা হইয়াছিল? কোন্ অংশকে মুখ, কোন্ অংশকে বাহু, কোন্ অংশকে উরু, কোন্ অংশকে পাদ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছিল? বিশ্বস্থ যাবৎ পদার্থ সেই বিরাট পুরুষের অংশমাত্র, এবং সেই বিরাট পুরুষকে দেহবিশিষ্ট কল্পনা করিয়া

বিশ্বস্থ তাবৎ পদার্থকে সেই বিরাট পুরুষের মস্তক হইতে পাদ পর্য্যন্ত কোন না কোন অঙ্গ বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে। নিম্নের কয়েক শ্লোক পাঠ করিলে উহা উপলব্ধি হইবে।

ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ।
উরূ তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রোঽজায়ত ॥ ১২।

(১) ব্রাহ্মণঃ—ব্রাহ্মণ অর্থাৎ শমদমাদিগুণসম্পন্ন সাত্ত্বিক ব্যক্তি। (২) অস্য—বিরাট পুরুষের। (৩) মুখং—মুখ। আসীৎ—হইয়াছিল অর্থাৎ বর্ণনা করা হইয়াছিল। (৫) বাহূ—বাহুদ্বয়। (৬) রাজন্যঃ—যুদ্ধাদি কার্য্যে নিযুক্ত রজোগুণ-প্রধান মানব। (৭ কৃতঃ—অর্থাৎ কল্পনা করা হইয়াছিল। (৮) উরূ—উরুদ্বয়। (৯) তৎ তাহা, সেই। (১০) অস্য—ইহার অর্থাৎ পুরুষের। (১১) যৎ—যাহা (১২) বৈশ্য—কৃষিবাণিজ্যাদি দ্বারা অর্থোপার্জ্জনে নিযুক্ত তমোরজোগুণ-প্রধান ব্যক্তি। (১৩) পদ্ভ্যাং—পদ হইতে। (১৪) শূদ্রঃ—বেদ-পরিত্যাগী তমোগুণ-প্রধান ব্যক্তি। (১৫) অজায়ত—উৎপন্ন হইয়াছিল।

অন্বয়ঃ। ব্রাহ্মণঃ অস্য পুরুষস্য মুখমাসীৎ রাজন্যঃ অস্য পুরুষস্য বাহূ কৃতঃ কল্পিতঃ। যদ্বৈশ্যঃ তদস্য পুরুষস্য উরূ কল্পিতঃ। শূদ্র পদ্ভ্যাং অজায়তঃ। শূদ্র পাদরূপেণ কল্পিত ইত্যর্থঃ।

বঙ্গানুবাদ। ব্রাহ্মণকে এই পুরুষের মুখরূপে কল্পনা করা হইয়াছিল। ক্ষত্রিয়কে বাহুস্বরূপ কল্পনা করা হইয়াছিল। বৈশ্যকে উরুস্বরূপ কল্পনা করা হইয়াছিল। শূদ্রকে পাদরূপে কল্পনা করা হইয়াছিল।

১১শ ঋকে জিজ্ঞাসা করা হইতেছে। যৎ পুরুষং ব্যদধুঃ কতিধা ব্যকল্পয়ন্। মুখং কিমস্য কৌ বাহূ কা উরূ পাদা উচ্যতে।

১২শ ঋকে উহার উত্তর দেওয়া হইতেছে।

ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ।
উরূ তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত ॥

তৎপরে ১৪শ ঋক্ পর্য্যন্ত "কতিধা ব্যকল্পয়ন্" প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হইতেছে।

১২শ ঋকে ইহা বলা হইতেছে না যে মুখ ব্রাহ্মণ হইয়াছিল, কিন্তু বলা হইতেছে যে ব্রাহ্মণ মুখ হইয়াছিল, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ও মুখের অস্তিত্বকাল লইলে, ব্রাহ্মণের অস্তিত্বকাল পূর্ব্বে আইসে। যদি বলা যায় যে স্বর্ণ অলঙ্কার হইয়াছিল, তাহা হইলে যেমন স্বর্ণের অস্তিত্ব পূর্ব্বে এবং অলঙ্কারের অস্তিত্ব পরে সূচিত হয়, তদ্রূপ ব্রাহ্মণ মুখ হইয়াছিল বলিলে ব্রাহ্মণের অস্তিত্ব পূর্ব্ব এবং মুখের অস্তিত্ব

পরে সূচিত হয়। সুতরাং ইহাদ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে ব্রাহ্মণো মুখমাসীৎ শব্দের অর্থ ইহা নয় যে "ব্রাহ্মণ মুখ হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন" কিন্তু উহার প্রকৃত অর্থ এই যে "ব্রাহ্মণকে মুখস্বরূপ কল্পনা করা হইয়াছে।" বাহু দ্বিবচন এবং কৃত একবচন, সুতরাং কৃতের সহিত বাহুর যোজনা হইতে পারে না, রাজন্যের সহিত উহার অন্বয় হইবে; অর্থাৎ রাজন্যকে বাহুদ্বয় করা হইয়াছিল। কিন্তু ইহা নয় যে বাহুদ্বয়কে রাজন্য করা হইয়াছিল। তৎপরে "উরু তদস্য যদ্বৈশ্যঃ" ইহার অর্থ এই যে বৈশ্যকে উরুদ্বয় করা হইয়াছিল অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য পুরুষের মুখ, বাহু ও উরু কল্পিত হইয়াছিল কিন্তু শূদ্র সম্বন্ধে স্পষ্ট রহিয়াছে যে পদ্‌ভ্যাং শূদ্র অজায়ত" অর্থাৎ পদদ্বয় হইতে শূদ্র জন্মিয়াছিল। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য মুখ, বাহু ও উরু হইতে হইয়াছে কল্পনামাত্র বলিয়া স্বীকার করিলে, অজায়ত শব্দ থাকা সত্ত্বেও শূদ্রের পদ হইতে উৎপত্তি কল্পনা ব্যতীত অন্য কোনরূপ গ্রহণ করা ন্যায়সিদ্ধ হয় না।

এই বিষয় পূজ্যপাদ পণ্ডিত সত্যব্রতসামশ্রমী যাহা লিখিয়াছেন আমরা তাহা নিম্নে দিলাম। তিনি বলেন "পূর্ব্বমন্ত্রে কোন্ বস্তুই বা পাদদ্বয়রূপে কথিত হইয়া থাকে, এই প্রশ্ন থাকায় এবং এই মন্ত্রে আদিম ভাগত্রয়ে ব্রাহ্মণাদি জাতিত্রয়েই মুখাদিরূপে কল্পনীয় স্ফুটোক্তি থাকায় এই শেষভাগে অর্থাৎ পাদদ্বয় হইতে শূদ্রের উৎপত্তি এই অংশটুকুরও ঐ অনুসারে ব্যাখ্যা কর্ত্তব্য, সুতরাং শূদ্রজাতিই তাঁহার পাদদ্বয়রূপে কল্পিত হয় ইহাই প্রকৃত অর্থ বুঝিতে হইবে। এস্থলে আরও বিবেচনীয় যে প্রশ্ন-মন্ত্রে প্রথমেই মোটামুটি প্রশ্ন আছে, যে যাঁহাকে পুরুষ বলিয়া বিধান করা হইল, তিনি কি প্রকারে কল্পিত হয়েন, অর্থাৎ তিনিও বাস্তবিক শরীরী নহেন, তবে কবিগণ শরীরী বলিয়া কল্পনা করেন, সুতরাং কোন্ বস্তু দ্বারা কোন্ অঙ্গ কল্পিত হয় ইহাই জিজ্ঞাস্য ও এই প্রশ্নের উত্তরে অমুক বস্তু অমুক অঙ্গ কল্পনীয় ইহাই সুসঙ্গত উত্তর, অতএব ঈদৃশ স্থলে এইরূপ অর্থ করা কর্ত্তব্য।"

চন্দ্রমা মনসো জাতশ্চক্ষোঃ সূর্য্যো অজায়ত।
মুখাদিন্দ্রশ্চ অগ্নিশ্চ প্রাণাদ্বায়ুরজায়ত॥ ১৩॥

চন্দ্র মন হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল, অর্থাৎ চন্দ্রকে বিরাটপুরুষের মনঃস্বরূপ কল্পনা করা হইয়াছিল, সূর্য্যকে চক্ষুঃস্বরূপ কল্পনা করা হইয়াছিল, ইন্দ্র ও অগ্নিকে মুখস্বরূপ কল্পনা করা হইয়াছিল, বায়ুকে সেই বিরাটপুরুষের প্রাণস্বরূপ কল্পনা করা হইয়াছিল।

নাভ্যা আসীদন্তরীক্ষং শীর্ষ্ণো দ্যৌঃ সমবর্ত্তত।
পদ্ভ্যাং ভূমির্দিশঃ শ্রোত্রাত্তথা লোকানকল্পয়ন্ ॥ ১৪ ॥

বঙ্গানুবাদ। নাভী হইতে অন্তরীক্ষ উৎপন্ন হইয়াছিল, অর্থাৎ অন্তরীক্ষকে বিরাটপুরুষের নাভিস্বরূপ কল্পনা করা হইয়াছিল। দ্যৌঃ অর্থাৎ স্বর্গকে মস্তকরূপ কল্পনা করা হইয়াছিল, ভূমিকে পাদরূপ কল্পনা করা হইয়াছিল, লোক অর্থাৎ ভুবন সকল (লোক্যন্তে কর্ম্মফলানি যত্র) এবং দিক সকলকে কর্ণস্বরূপ কল্পনা করা হইয়াছিল।

সপ্তাস্যাসন্ পরিধয়স্ত্রিঃসপ্তসমিধঃ কৃতাঃ।
দেবা যদ্‌যজ্ঞং তন্বানা অবধ্নন্ পুরুষং পশুম্ ॥ ১৫ ॥

(১) সপ্ত—সাত। (২) অস্য—এই মানস যজ্ঞের। (৩) আসন্—ছিল। (৪) পরিধয়ঃ—পরিধি, গায়ত্রী আদি সপ্তচ্ছন্দ পরিধিস্বরূপ হইয়াছিল। ঐষ্টিকস্যাহবনীয়স্য ত্রয়ঃ পরিধয়ঃ ঔত্তরবেদিকাঃ ত্রয়ঃ আদিত্যঃ সপ্তমঃ পরিধিঃ অথবা ক্ষীর সমুদ্রাদি সপ্তসমুদ্র এই যজ্ঞের পরিধিস্বরূপ হইয়াছিল। (৫) ত্রিঃ সপ্ত—ত্রিগুণ সপ্ত অর্থাৎ একবিংশতি-সংখ্যক। (৬) সমিধঃ—যজ্ঞ কাষ্ঠ, দ্বাদশ মাস, পঞ্চ ঋতু, তিন লোক এবং আদিত্য এই একবিংশ নামীয় যজ্ঞীয় কাষ্ঠ—অথবা গায়ত্রী আদি সপ্ত ছন্দ, অতি জগতীত্যাদি সপ্ত ছন্দ, কৃত্যাদি সপ্তছন্দ। (৭) কৃতাঃ—করা হইয়াছিল, কল্পিত হইয়াছিল। (৮) দেবাঃ—দেবতারা। (৯) যৎ—যদা যখন। (১০) যজ্ঞম্—যজ্ঞ, মানসযজ্ঞ। (১১) তন্বানাঃ—মানসং যজ্ঞং কুর্ব্বাণাঃ। (১২) অবধ্নন্—বন্ধন করিয়াছিলেন। বিরাটপুরুষমেব পশুত্বেন ভাবিতবন্তঃ। বিরাট পুরুষকে পশুরূপে চিন্তা করিয়াছিলেন। (১৩) পুরুষং পশুম্—পুরুষরূপ পশুকে।

অন্বয়ঃ। দেবা যদা যজ্ঞং তন্বানা পুরুষং পশুমবধ্নন্, তদা অস্য সপ্ত পরিধয়ঃ আসন্, ত্রিসপ্ত সমিধঃ কৃতাঃ।

বঙ্গানুবাদ। দেবতারা যখন যজ্ঞসম্পাদন-কালে পুরুষ-পশুকে বন্ধন করিয়াছিলেন, অর্থাৎ মানসিক যজ্ঞসম্পাদনকালে দেহাভিমানী পুরুষ-দেবকে পশুরূপে চিন্তা করিয়াছিলেন, তখন গায়ত্র্যাদি সপ্ত ছন্দকে ঐ যজ্ঞের সাতটি পরিধি বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছিল, এবং দ্বাদশ মাস, পঞ্চ ঋতু, তিন লোক এবং আদিত্যকে ঐ যজ্ঞের কাষ্ঠস্বরূপ কল্পনা করা হইয়াছিল।

যজ্ঞেন যজ্ঞমযজন্তদেবাস্তানি ধর্ম্মাণি প্রথমান্যাসন্।
তেহ নাকং মহিমানঃ সচন্ত যত্র পূর্ব্বে সাধ্যাঃ সন্তি দেবাঃ ॥ ১৬ ॥

(১) যজ্ঞেন—মানসযজ্ঞ দ্বারা। (২) যজ্ঞম্—যজ্ঞস্বরূপং প্রজাপতিম্ অযজন্ত, পূজিতবন্তঃ। মানস যজ্ঞ দ্বারা প্রজাপতির পূজা করিয়াছিলেন। (৩) অযজন্ত—যজ্ঞ সম্পাদন করিয়াছিলেন। (৪) দেবাঃ—দেবতারা। (৫) তানি—সেই সমুদায়। ৬) ধর্ম্মাণি প্রথমানি আসন। ঐ সমুদায় সর্ব্বপ্রথম ধর্ম্মানুষ্ঠান হইয়াছিল। (৭) তে—তাহারা। (৮) নাকম্—বিরাট্-প্রাপ্তি-রূপং স্বর্গং। বিরাট্-প্রাপ্তিরূপ স্বর্গ। (৯) মহিমানঃ—মহাত্মানঃ, মহাত্মা ব্যক্তিরা। (১০) সচন্ত—প্রাপ্নুবন্তি—প্রাপ্ত হন। (১১) যত্র—যে স্থলে। (১২) পূর্ব্বে—পূর্ব্বে। (১৩ সাধ্যাঃ—বিরাড়ুপাধিসাধকাঃ, বিরাটপুরুষ উপাধি করিয়া যাহারা উপাসনা করেন। (১৪ দেবাঃ—দেবতারা।

অন্বয়ঃ। দেবাঃ যজ্ঞেন যজ্ঞং অযজন্ত তানি প্রথমানি ধর্ম্মাণি আসন, যত্র নাকে পূর্ব্বে সাধ্যাঃ দেবাঃ সন্তি তং নাকং মহিমানঃ সচন্ত। সৃষ্টেঃ প্রবাহ-নিত্যতাং দর্শয়তি।

বঙ্গানুবাদ। দেবতারা যে মানসযজ্ঞ করিয়া পরব্রহ্মের উপাসনা করিয়াছিলেন, উহাই প্রথম ধর্ম্মানুষ্ঠান, পূর্ব্বে বিরাটপুরুষকে উপাধিস্বরূপ করিয়া দেবতারা যে স্বর্গপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন অর্থাৎ বিরাটপুরুষ-প্রাপ্তিস্বরূপ স্বর্গ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, মহাত্মা উপাসকেরা সর্ব্বদাই তাহা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

পুরুষ-সূক্তে বহুবিধ তত্ত্ব নিহিত আছে। পুরুষ-সূক্তে বলা হইয়াছে যে, এই বিশ্ব পুরুষের অংশ হইলেও তিনি স্বরূপেই অবস্থিতি করেন। তিনি জগতের উপাদান নিমিত্তকারণ হইলেও তাঁহার স্বরূপ এই বিশ্ব হইতে স্বতন্ত্র। এই বিশ্ব তাঁহার মহিমাব্যঞ্জক কিন্তু তিনি ইহা হইতেও শ্রেষ্ঠ। পুরুষ-সূক্তের আর একটী তত্ত্ব এই যে—এই সমস্ত বিশ্বই একসূত্রে গ্রথিত। তাঁহার মহিমার একই বস্তু বহুরূপ ধারণ করিয়াছে। তিনি নিরাকার ব্রহ্ম বটে, আবার তিনি সাকার বিরাট পুরুষ। জড় ও আত্মা, চিৎ ও অচিৎ, উভয়ই তাঁহার মহিমা। পুরুষ-সূক্তে ইহাও বলা হইয়াছে যে, নিরাকার পুরুষের উপাসনা অসম্ভব, এই জন্য দেহাভিমানী পুরুষের আশ্রয় করিয়া তাঁহার উপাসনা করিতে হয়। কিন্তু যতক্ষণ জীবাত্মার অহং-জ্ঞান থাকে, ততক্ষণ সে মুক্তি পায় না। এই জন্যই সেই জীবাত্মাকে দগ্ধ করিতে হয় এবং সেই জন্যই ঐ দেহাভিমানী পুরুষকে বলিস্বরূপ কল্পনা করা হইয়াছে। সেই দেহাভিমানী পুরুষকে মানস-যজ্ঞে উৎসর্গ করিয়া পরমাত্মার উপাসনা যে শ্রেষ্ঠ তাহা পুরুষসূক্তে বিশদরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। পুরুষসূক্তে একটী সামাজিক তত্ত্বও নিহিত আছে।

মানবের মধ্যে সর্ব্বদেশেই সত্ত্বপ্রধান, রজঃ-প্রধান এবং তমঃ-প্রধান ব্যক্তি দৃষ্ট হয়। সত্ত্বপ্রধান ব্যক্তিকেই ব্রাহ্মণ বলা যায়, এবং রজঃ-প্রধান ব্যক্তিকে ক্ষত্রিয় বলা যায়; এবং রজস্তমঃ উভয়কে বৈশ্য বলা যায়, এবং তমঃ-প্রধান ব্যক্তিকে শূদ্র বলা যায়। এই বিভাগ কল্পিত নহে। সর্ব্বদেশের মানবের মধ্যে এই স্বাভাবিক বিভাগ দৃষ্ট হয়। সত্ত্বপ্রধান ব্যক্তির রজস্তমোগুণ যে একেবারে থাকে না, তাহা নহে। ঐরূপ রজঃ-প্রধান ব্যক্তিতেও সত্ত্বগুণ থাকে এবং রজস্তমঃ-প্রধান ব্যক্তিতেও সত্ত্বগুণ থাকে। এই গুণকর্ম্ম-বিভাগহেতুই চাতুর্ব্বর্ণ্যধর্ম্মের আবির্ভাব। সর্ব্বদেশেই এই চতুর্ব্বর্ণ আছে এবং পুরুষ-সূক্তে সেই চতুর্ব্বর্ণ মুখ, বাহু, উরু ও পাদস্বরূপ কল্পিত হইয়াছে। সত্ত্বপ্রধান ব্যক্তিই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং ব্রাহ্মণ নামে অভিহিত হন। এই জন্যই তিনি মানব সামাজিক অঙ্গের মুখস্বরূপ, ঐরূপ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র যথাক্রমে সমাজ-অঙ্গের বাহু, উরু ও পাদস্বরূপ। পুরুষসূক্তে বর্ণভেদের যে বর্ণনা আছে, তাহা এই স্বাভাবিক বর্ণধর্ম্মের বর্ণনা। শাস্ত্রে আছে যে, বর্ণবিভাগ কর্ম্মের দ্বারাই হইয়াছে—"কর্ম্মভির্ব্বর্ণতাং গতং।" যাঁহারা বলেন যে পুরুষসূক্তে বংশগত বর্ণের কথা বলা হইয়াছে, তাঁহাদিগের সিদ্ধান্ত যে ভ্রান্ত তাহা পূর্ব্বোক্ত ব্যাখ্যায় দেখান হইয়াছে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, তিন বর্ণই দ্বিজ এবং শৌচপরিভ্রষ্ট হইয়াই শূদ্র হইয়াছেন, "শৌচপরিভ্রষ্টাস্তে দ্বিজাঃ শূদ্রতাং গতাঃ।" কিন্তু "ধর্ম্মো যজ্ঞ ক্রিয়া তেষাং নিত্যং ন প্রতিষিদ্ধতে" অর্থাৎ তাঁহাদের ধর্ম্ম ও যজ্ঞক্রিয়া চিরকালের জন্য নিষিদ্ধ নহে। অর্থাৎ তাঁহাদের ক্রিয়ার দ্বারা উচ্চ জ্ঞান লাভ হইলেই তাঁহারা দ্বিজাতির ন্যায় ধর্ম্ম, যজ্ঞ ও ক্রিয়া করিতে পারিবেন।

পুরুষসূক্তের সহিত মহাভারতের শান্তি পর্ব্বের ভৃগু-ভরদ্বাজ সংবাদ পাঠ করিলে পাঠক বুঝিতে পারিবেন যে আর্য্য সমাজের যে বর্ণভেদ তাহা গুণ ও কর্ম্মগত, বংশগত নহে। কিরূপে এই গুণগত বর্ণ ক্রমে বংশগত হইয়া সনাতন আর্য্য সমাজের বিশৃঙ্খলা সম্পাদন করিয়াছে, তাহা অন্য প্রবন্ধে দেখান যাইবে।

অস্পৃশ্যতা-দূরীকরণ।

(Removal of untouchability)

লেখক—সম্পাদক।

স্বারাজ্য প্রাপ্ত হইতে হইলে অস্পৃশ্যতা-দূরীকরণ দ্বারা হিন্দুসমাজকে দৃঢ়ীভূত করা অত্যাবশ্যক বলিয়া মহাত্মা গান্ধী বহুদিন পূর্ব্বে যে ঘোষণা করিয়াছেন, ও উহা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য যে সমস্ত উপায় অবলম্বিত হইয়াছে এবং এতৎ সম্বন্ধে সমাজে যে আলোচনা হইতেছে, তাহা সকলেই অবগত আছেন। তাঁহার প্রস্তাবের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে বিভিন্ন মত দৃষ্ট হয়। কোন্‌টী ভাল, কোন্‌টী মন্দ, এ বিষয়ে স্থির নির্দ্ধারণ করিতে গেলে, নিরপেক্ষ-ভাবে এ সম্বন্ধে পর্য্যালোচনা আবশ্যক।

অস্পৃশ্যতা কি ?

কোন ব্যক্তি কোন সংক্রামক রোগে (যেমন কলেরা ইত্যাদি রোগে) আক্রান্ত হইলে, আক্রান্ত ব্যক্তিকে আমরা অস্পৃশ্য জ্ঞান করি। কেন না, আক্রান্ত ব্যক্তিকে স্পর্শ করিলে আমাদেরও উক্ত ব্যাধিগ্রস্ত হইবার আশঙ্কা আছে। এই জন্যই শুশ্রূষাকারী ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কাহাকেও রোগীর নিকটে যাইতে বা তাহাকে স্পর্শ করিতে দেওয়া হয় না। আর শুশ্রূষাকারী ব্যক্তিদেরও সংক্রমণ হইতে রক্ষা করার জন্য নানাপ্রকার সাবধানতা অবলম্বিত হয়; যেমন প্রতিষেধক ঔষধ দ্বারা হস্তপদ ধৌতকরণ, রোগীর গৃহ হইতে বাহির হইয়া বস্ত্র-পরিবর্ত্তন ইত্যাদি। এইরূপ অস্পৃশ্যতার সহিত জাতিভেদের কোন সম্বন্ধ নাই। এইরূপ রোগাক্রমণ হেতু রোগীর অস্পৃশ্যতা সর্ব্ববর্ণেই তুল্যভাবে প্রযুজ্য। সংস্কারাভাবে অথবা মলমূত্রাদি-লিপ্ততার জন্য দেহের অশুচিতা হেতুও অস্পৃশ্যতা হইয়া থাকে। এই অস্পৃশ্যতার সহিতও জাতিভেদের কোন সম্বন্ধ নাই। এতদ্ব্যতীত আর একপ্রকার অস্পৃশ্যতা আমাদের সমাজে দৃষ্ট হয়। কোন ব্যক্তি শারীরিক শুচিতা ও সুস্থতাসত্ত্বেও কোন নির্দ্দিষ্ট বর্ণে জন্মগ্রহণ করায় সে অস্পৃশ্য বলিয়া পরিগণিত হয়। মনে করুন কোন এক ব্যক্তি চর্ম্মকারবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, সে যতই শুচি বা সুস্থ হউক না কেন শুধু চর্ম্মকারবংশে জন্ম-পরিগ্রহ নিমিত্তই তাহাকে স্পর্শ করিলে হিন্দু-সমাজের উচ্চবর্ণের স্নানাদি করিতে হয়।

এই জাতিগত অশুচিতাবশতঃ যে অস্পৃশ্যতা তাহাই দূরীকরণের জন্য বর্ত্তমান আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে।

এরূপ অস্পৃশ্যতা-বিধানের কারণ কি?

মলগ্রহণ, চর্ম্মচ্ছেদনাদি কার্য্যে নিযুক্ত ব্যক্তিরা তাহাদের ব্যবসায় যেরূপ ভাবে সম্পন্ন করে, তাহাতে তাহাদের পক্ষে শারীরিক শৌচ রক্ষা করা অসম্ভব বিধায় সমাজ ক্রমে তত্তৎ ব্যবসায়ীদিগকে অস্পৃশ্যদোষে দূষিত করিয়াছিল। ব্যবসায় জাতিগত বা বংশগত হওয়ায় তদ্বংশীয়েরা ঐ সমুদয় ব্যবসায় হইতে নিবৃত্ত হওয়ার পরেও জাতিগত অস্পৃশ্যতার হস্ত হইতে একেবারে পরিত্রাণ পায় নাই। "একেবারে" পায় নাই কথাটা বলার তাৎপর্য্য আছে। আমরা ইহা অবগত আছি যে অনেক স্থানে চর্ম্মকার-ব্যবসায়ী ব্যক্তিরা চর্ম্মকার-ব্যবসায় পরিত্যাগের পরে আর অস্পৃশ্য বলিয়া পরিগণিত হয় না। নলডাঙ্গার সুবিখ্যাত রাজা প্রমথভূষণ দেব রায় বাহাদুর উদারনীতি অবলম্বন করিয়া স্থানীয় চর্ম্মকারদিগকে হস্তী, অশ্ব, শকট ও হলচালনের কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া তাহাদিগের অস্পৃশ্যতা-দোষ দূরীভূত করিয়াছেন। কোটচাঁদপুরের গুড় ও শর্করা ব্যবসায়ী মহাজনেরা গুড় ও চিনি প্রস্তুত করণের কার্য্যে স্থানীয় চর্ম্মকারদিগকে নিযুক্ত করিয়া তাহাদিগেরও অস্পৃশ্যতা দোষ দূরীকৃত করিয়াছেন। এইরূপ আরও উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। ইহাদ্বারা চর্ম্ম-ব্যবসায়-পরিত্যাগীদিগের অস্পৃশ্যতা-দোষ নিরাকৃত হইলেও, চর্ম্মব্যবসায়ে নিযুক্ত ব্যক্তিদের অস্পৃশ্যতা-দোষ নিরাকৃত হয় নাই; এক হিসাবে বর্দ্ধিত হইয়াছে বলিলেও বলা যাইতে পারে। কারণ, চর্ম্মকার যখন দেখিতে পায় যে তাহার স্বজাতীয় ব্যক্তি অন্য ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া স্পর্শদোষ হইতে মুক্তি পাইয়াছে, তখন তাহার নিজ ব্যবসায়ের প্রতি তাহার আরও অশ্রদ্ধা জন্মে এবং তাহার চর্ম্ম-ব্যবসায়-পরিত্যাগী স্বজাতির নিকটেও সে অস্পৃশ্য বলিয়া পরিগণিত হয়। সুতরাং যে অস্পৃশ্যতা পূর্ব্বে ছিল তাহা কেবল উচ্চবর্ণের গণ্ডীর মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল, এখন সে অস্পৃশ্যতার পরিধি আরও বাড়িয়া গেল।

সমাজে চর্ম্মকারের স্থান আছে কিনা?

আমরা সমাজ হইতে চর্ম্মকারের ব্যবসায় একেবারে উঠাইয়া দিতে পারি কি না? উপানৎ বা চর্ম্মপাদুকার ব্যবহার অতি প্রাচীনকাল হইতে আমাদের সমাজে প্রচলিত আছে। এমন কি ব্রহ্মচারীদের পক্ষেও চর্ম্মপাদুকার ব্যবহার একেবারে নিষিদ্ধ হয় নাই। স্বগ্রাম পরিত্যাগ করিয়া কোন দূরবর্ত্তী স্থানে যাইতে হইলে

তাঁহাদের উপানৎ ব্যবহারের বিধি আছে। অত্যুষ্ণ-শীতল-ভূমি পাঞ্জাব প্রদেশে এখনও উচ্চ ও নিম্নশ্রেণীর স্ত্রীলোকদিগের মধ্যেও চর্ম্মপাদুকা ব্যবহারের প্রচলন আছে। ইদানীং চর্ম্ম দ্বারা বহুবিধ আবশ্যকীয় দ্রব্য প্রস্তুত হইতেছে। সুতরাং প্রত্যেকে সংসারের আবশ্যকীয় দ্রব্যসমূহের মধ্যে চর্ম্মনির্ম্মিত বহু দ্রব্য দেখিতে পাইবেন। চর্ম্ম-সংস্করণ এবং চর্ম্মদ্বারা নানাবিধ দ্রব্য নির্ম্মাণের ব্যবসায় লাভজনকও বটে। চর্ম্মব্যবসায়ীদিগকে অস্পৃশ্য রাখা হেতু এই সমস্ত ব্যবসায় হিন্দুদিগের হস্ত হইতে স্খলিত হইয়া অন্যান্য জাতির অধিগত হইতেছে এবং তাহাতে হিন্দু সমাজের আর্থিক ক্ষতি যথেষ্ট হইতেছে। কলিকাতা নগরীতে বেণ্টিঙ্কষ্ট্রীটে হ্যাটকোট-পরিহিত পূর্ব্বে বেণীধারী বর্ত্তমানে কর্ত্তিত-বেণী চীনবাসীরা জুতার ব্যবসায় একপ্রকার একচেটিয়া করিয়াছেন; তাহারা অস্পৃশ্য নহেন। তাঁহাদের বা ঐরূপ ব্যবসায়ী ইংরেজদের অধীনে হিন্দু সমাজের শ্রেষ্ঠ বর্ণদিগের চাকরী গ্রহণেও আপত্তি নাই। তাহারা অবশ্য পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্ন অবস্থায় থাকে; সাধারণ চর্ম্মকারদিগের ন্যায় অপরিচ্ছন্নভাবে থাকে না।

চামারদিগের শৌচের ব্যবস্থা।

সুতরাং চর্ম্মকারদিগের অস্পৃশ্যতা দোষ নিরাকৃত করিতে গেলে আমাদের কর্ত্তব্য এই যে তাহাদিগের স্বীয় ব্যবসায়ের কার্য্যে যাহাতে তাহারা শৌচাচার অবলম্বন করিতে পারে তদ্রূপ শিক্ষা দেওয়া। বর্ত্তমানে কোন গ্রামে গো-শব প্রাপ্ত হইলে তাহার চর্ম্ম উন্মোচন করিয়া বাটীর উপরে বা বাটীর নিকটে তাহা রৌদ্রে শুষ্ক করে এবং তৎপরে বিবিধ দ্রব্যের সাহায্যে চর্ম্মকে নরম করার চেষ্টা করে, গৃহাদি এতই দুর্গন্ধময় হয় যে সেখানে কাহারও যাইবার সাধ্য থাকে না। নিজের বা স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদিগের বস্ত্রাদি অপরিষ্কৃত এবং দুর্গন্ধময়। সচ্ছলতা সত্বেও শৌচের প্রতি আদৌ দৃষ্টি নাই। আহার বিহার শয়নে সকল সময়েই ঘোর তামসিকতা পরিদৃষ্ট হয়। উচ্চ হিন্দুসমাজ কখনও তাহা-দিগের দিকে দৃষ্টিপাত করে না; তাহারা চোর বা বদমায়েষ হইলে তাহাদিগকে দণ্ড দেওয়া ব্যতীত তাহাদের উৎকর্ষসাধনের কোন ব্যবস্থা করে না। ভগবান্ তাহাদিগকে মুচি করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহারা চামড়া উঠাইবে ও জুতা তৈয়ার করিবে—এই পর্য্যন্ত তাহাদের সহিত সম্বন্ধ, তাহাদের উন্নতি হউক বা অবনতি হউক তাহা দেখিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু অস্মদ্দেশীয় মুচিরা চামড়াও ভালরূপে পরিষ্করণ করিতে পারে না এবং জুতাও তাহারা ভালরূপে নির্ম্মাণ করিতে পারে না। তাহাদের এই অবস্থার জন্য উচ্চবর্ণেরাই দায়ী। ইহাদের অবস্থা ভাল করা অসাধ্য

নহে। যেখানে মুচি আছে, সেই স্থানেই যদি চর্ম্ম-উন্মোচন এবং সংস্করণের জন্য একটি নির্দ্দিষ্ট স্থান থকে এবং তৎপরে অস্থি-মাংসাদির দ্বারা যাহাতে স্থান অপরিস্কৃত না হয়, তাহার ব্যবস্থা করা যায় এবং তাহারা যখন চর্ম্ম উন্মোচন বা চর্ম্মসংস্করণ কার্য্যে প্রবৃত্ত থাকে তখন তাহাদের জন্য স্বতন্ত্র ক্ষুদ্র বস্ত্রের ব্যবস্থা করা যায় এবং কার্য্য শেষ হইলেই তাহাদের শরীর উত্তমরূপে ধৌত করার উপকারিতা ও প্রয়োজনীয়তা তাহাদিগকে ভালরূপে শিক্ষা দেওয়া যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে গৃহাদি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার এবং আহার্য্য দ্রব্যাদি পরিস্কৃত রাখার ও সাধারণ স্বাস্থ্য রক্ষার ব্যবস্থা শিক্ষা দেওয়া যায়, তাহা হইলে তাহারা চীন, ইংরেজ, প্রভৃতি জাতির ন্যায় পরিচ্ছন্ন হইতে পার, এবং তাহা হইলে তাহাদের অস্পৃশ্যতা নিরাকরণের পথ সুগম হইতে পারে। বর্ত্তমানে যদি মুচিদের আচার ব্যবহার যেরূপ আছে তদ্রূপই থাকে এবং তাহারা যদি সমভাবে অপরিষ্কার অপরিচ্ছন্ন থাকে, তাহা হইলে তাহাদের সহিত উচ্চবর্ণদিগের সাহচর্য্য সম্ভবপর হইবে না, সুতরাং তাহাদের ব্যবসায়ে এবং তাহাদের আচার-ব্যবহারে শৌচাচারেয় প্রবর্ত্তন অত্যাবশ্যক।

অন্যান্য অস্পৃশ্য জাতির পক্ষেও ঐরূপ।

অন্যান্য জাতির অস্পৃশ্যতা-দোষ দুরীকৃত করিতে হইলেও তাহাদের ব্যবসায়ে ও আচার ব্যবহারে ঐরূপ শৌচাচার প্রবর্ত্তন আবশ্যক। এবং উহা করা অসম্ভব বা অসাধ্য নহে। মুচি, মেথর, হাঁড়ি, ডোম প্রভৃতি সকল জাতিকেই শিক্ষিত ও শৌচাচার সম্পন্ন করা যায়। এ বিষয়ে ফললাভ করিতে হইলে উচ্চবর্ণের অনেক ত্যাগস্বীকার করিতে হইবে; কেবল মৌখিক সমানুভূতি প্রদর্শনে বিশেষ কিছু ফল হইবে না; কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়া আবশ্যক।

শাস্ত্র-শাসন।

এ সম্বন্ধে শাস্ত্র-শাসন এই শুভকার্য্যের অনমুকূল নহে। যাহারা মহাভারতের ধর্ম্মব্যাধের উপাখ্যান পাঠ করিয়াছেন তাহারা অবগত আছেন যে পশুঘ্ন এবং মাস-বিক্রয়ী ব্যাধও কিরূপে ঋষিদিগেরও পুজনীয় হইতে পারে। তবে শাস্ত্র মুচিকে ব্রাহ্মণ করিতে বাধা দেন না, কিন্তু ব্রাহ্মণকে মুচি করিতে বাধা দেন। ব্রাহ্মণ মুচি হইয়া মুচিদিগকে স্পৃশ্য করিবে, ইহা বোধ হয় কাহারও অভিপ্রেত নহে। মুচিকেই উপরে উঠাইতে হইবে, উচ্চবর্ণকে নামাইতে হইবে না।

দেশাচার।

দেশাচারই সর্ব্বত্র শাস্ত্র হইতেও প্রবল। যাহা দশের আচার তাহাই শাস্ত্রসম্মত

বলিয়া পরিগণিত। হিন্দুশাস্ত্র এতই উদার যে উহার এরূপ আদেশও আছে যে "সময়শ্চাপি সাধূনাং প্রমাণং বেদবৎ ভবেৎ' অর্থাৎ সাধুদিগের নির্দ্দেশ বেদের ন্যায় প্রামাণিক। "চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠো হরিভক্তি-পরায়ণঃ" ইহাও শাস্ত্রের আদেশ। যদি শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা অস্পৃশ্য বর্ণদিগের শৌচাচার বিধান করিতে কৃতসংকল্প হয়েন, তাহা হইলে তাহাদের অস্পৃশ্যতা-দোষ অচিরাৎ নিরাকৃত হইবে বলিয়া আশা করা যায়। কারণ—

যদ্ যদ্ আচরতি শ্রেষ্ঠ স্তদ্ তদেব ইতরোজনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে ॥ গীতা।

শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যেরূপ আচরণ করেন, ইতর ব্যক্তিরা তাহাই করে। তিনি যাহা যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে করেন, লোকে তাহারই অনুবর্ত্তন করে।

মহাত্মা গান্ধী।

বর্ত্তমানে ভারতবর্ষে মহাত্মা গান্ধী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর ব্যক্তি দৃস্ট হয় না। সকলেই তাঁহাকে একবাক্যে ভারতবর্ষের নেতা বলিয়া স্বীকার করিতেছেন। খ্রীষ্টান মুসলমানেরাও তাঁহার নেতৃত্ব স্বীকার করিয়াছেন। তিনি যে কেবল রাজনৈতিক আন্দোলনেই শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছেন তাহা নহে, তাঁহার বিমল চরিত্র, পরোপকারবৃত্তি, ঈশ্বর-ভক্তি ও তপস্যা তাঁহাকে দেশের অগ্রণী করিয়াছে। এই অস্পৃশ্যতা-দূরীকরণ মহাত্মা গান্ধীরও অনুমোদিত ও একান্ত অভিপ্রেত। সুতরাং এই কার্য্যে বিলম্ব করা উচিত নহে। অস্পৃশ্যতাই হিন্দুসমাজের একতার একমাত্র বিরোধী নহে। হিন্দুসমাজেরএকতা-সংঘটন-পক্ষে অন্যান্য যে সমস্ত বাধাবিঘ্ন আছে তাহা সমস্তই দূরীভূত করিতে হইবে। কিন্তু ইহা করিতে যাইয়া শাস্ত্র-বিধিরও সম্মান রাখিয়া চলিতে হইবে। যুক্তি ও শাস্ত্র উভয়ের সামঞ্জস্য করিয়া কার্য্যসম্পন্ন করিতে পারিলে হিন্দুসমাজের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। শাস্ত্রই বলিয়াছেন—

"কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্ত্তব্যোঽর্থ-নির্ণয়ঃ।
যুক্তিহীন বিচারেণ ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে।"

মহাত্মা গান্ধী।

লেখক—প্রসম্পাদক।

ভারত-গগনের দিবাকর।

বর্ত্তমানে মহাত্মা গান্ধীকে ভারত-গগনের দিবাকর বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বহুদিন হইতে ভারতবাসী ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়া আসিতেছে "তমসো মা জ্যোতির্গময়," আমাকে অন্ধকার হইতে আলোকে লইয়া যাও। এতদিন ভারতবাসী অন্ধকারে দিশাহারা হইয়া বিচরণ করিতেছিল; মহাত্মা গান্ধী সে অন্ধকার বিদূরিত করিয়া ভারতবাসীদিগকে নবালোক প্রদান করিয়াছেন। মহাত্মা শিশিরকুমার অনেক সময়ে আমাকে বলিতেন "যদুনাথ, রাজনীতিক্ষেত্রে ভারতে এ পর্য্যন্ত কোন নেতার আবির্ভাব হয় নাই। যে পর্য্যন্ত ভারতে নেতার আবির্ভাব না হইবে, সে পর্য্যন্ত ভারতের রাজনীতি-গগন তমসাচ্ছন্ন থাকিবে।" এই সম্প্রদায়বহুল ভারতবর্ষে মহাত্মা গান্ধী সর্ব্বসম্মতিতে নেতা বলিয়া গৃহীত হইয়াছেন। কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি খ্রীষ্টান, কি বৌদ্ধ, কি জৈন, ভারতবাসীমাত্রেই তাঁহার নেতৃত্ব অঙ্গীকার করিয়া লইয়াছে। কি রাজপ্রাসাদ, কি দরিদ্রকুটীর, সর্ব্বত্রই তিনি সমাদৃত ও পূজিত। হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত এবং আফগানিস্থান হইতে ব্রহ্মদেশ পর্য্যন্ত সর্ব্বস্থানেই মহাত্মা গান্ধী বলিলে আর অন্য কোন পরিচয় দিতে হয় না। তাঁহার যশঃসৌরভ কেবল ভারতেই নিবদ্ধ নহে, পৃথিবীর সর্ব্ব সভ্যদেশই তাঁহাকে মহাপুরুষ বলিয়া অভিনন্দিত করিতেছে। যে শাসন-নীতির বিরুদ্ধে তিনি দণ্ডায়মান, তাহার পরিচালকগণও শতমুখে তাঁহার প্রশংসা করিয়া থাকেন।

তিনি বিপক্ষদিগের দ্বারাও সম্মানিত।

আইনের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য যে ইংরেজ বিচারক তাঁহাকে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন, তিনিও তাঁহার মহৎ চরিত্রের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া দণ্ডাজ্ঞাপ্রদানের সময়ে দুঃখে অভিভূত হইয়াছিলেন; এবং এ কথাও বলিয়াছিলেন যে মহাত্মা যথাসম্ভব শীঘ্র কারামুক্ত হইলে তিনি বিপুল প্রীতি-লাভ করিবেন। কারাবাসে গুরুতর পীড়াক্রান্ত হইলে ইংরেজ ডাক্তার ম্যাডক এবং ইংরেজ শুশ্রূষাকারিণী মহিলাগণ তাঁহার চিকিৎসা ও শুশ্রূষা করিয়া যে কীর্ত্তি ও পুণ্যলাভ করিয়াছেন, তাহা সকলের ভাগ্যে ঘটে না। ইংরাজ-শাসন-বৈরীর

উপর এইরূপ শ্রদ্ধাপূর্ণ সদয় ব্যবহার ভারতে ব্রিটিশ অভ্যুদয়ের রহস্য—তরবারি নহে। মহাত্মা গান্ধী গুরুতর রোগে আক্রান্ত হইয়া কথঞ্চিৎ সুস্থ হইলে তাঁহার কারামুক্তি-ঘোষণার সময়ে ভারত-সচিব লর্ড অলিভিয়ার বলিয়াছিলেন যে এরূপ একজন মহাপুরুষকে কারাবদ্ধ রাখা দুঃখের বিষয়।

মহাত্মা গান্ধীর বিশেষত্ব—স্বাধীনতা-প্রাপ্তির নববিধান।

কোন স্বাধীনতাবিচ্যুত জাতির স্বাধীনতা-পুনঃপ্রাপ্তির জন্য বল-প্রয়োগই একমাত্র উপায় বলিয়া সর্ব্বদেশে নির্দ্দিষ্ট হইয়া আসিতেছে। জগতের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দৃষ্ট হয় যে যখনই কোন জাতি স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে তখনই তাহাদের বলপ্রয়োগ করিতে হইয়াছে। মহাত্মা গান্ধী ঘোষণা করিয়াছেন যে বলদ্বারা যদিও স্বাধীনতা লাভ করা যাইতে পারে, তথাপি উহা পরিণামে শুভফলপ্রদ এবং স্থায়ী হয় না। ভগবান বুদ্ধ ও যিশুর ন্যায় তিনি উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন যে ঘৃণার দ্বারা ঘৃণা বিনষ্ট হয় না, প্রেমের দ্বারাই ঘৃণা বিনষ্ট হয়। হিংসাদ্বারা শ্রেয়োলাভ অসম্ভব, অহিংসাই শ্রেয়োমূলক। এই সমস্ত উপদেশ এ পর্য্যন্ত ধর্ম্ম ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হইয়া আসিতেছে, রাজনীতি-ক্ষেত্রে মহাত্মা গান্ধীই ইহার প্রথম প্রবর্ত্তক। সত্য বটে রুশিয়ার প্রথিতযশাঃ মহাত্মা কাউণ্ট টলষ্টয় রাজনীতিক্ষেত্রেও এই অহিংসা-নীতির প্রচার করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি উহা কার্য্যে পরিণত করিবার কোন উপায় অবলম্বন করিয়া যাইতে পারেন নাই। মহাত্মা গান্ধীর বিশেষত্ব এই যে তিনি রাজনীতিক্ষেত্রেই এই উচ্চ আদর্শের প্রয়োগ অবলম্বনে রাজনৈতিক আন্দোলনে এক নূতন যুগের অবতারণা করিয়াছেন। সাম, দান, দণ্ড, ও ভেদ এই চারিটী চিরপ্রসিদ্ধ রাজনীতি পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য উভয়ত্রই স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিয়া আসিতেছে। মহাত্মা গান্ধী এই বহুপ্রাচীন চিরাগত রাজনীতি ধর্ম্মবিরুদ্ধ বিধায় তাহা পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মসঙ্গত নীতি দ্বারা ভারতবর্ষকে স্বাধীন করিতে কৃতনিশ্চয় হইয়াছেন।

মুক্তিই চরম উদ্দেশ্য।

সম্প্রতি কোন ব্যক্তি মহাত্মাকে লিখিয়াছিলেন যে তিনি রাজনীতিক আবর্ত্তনের মধ্যে নিমজ্জিত হইয়া কিরূপে শাশ্বত শান্তির আশা করেন? তদুত্তরে মহাত্মা গান্ধী বলিয়াছেন যে নিষ্কামভাবে ভারতবাসীর স্বাধীনতা-প্রাপ্তির সহায়তা করিয়া তিনি মুক্তিলাভ করিতে ইচ্ছা করেন। আমরা মহাত্মা গান্ধীর চরিত্র বিশ্লেষণ করিতে যতদূর সমর্থ হইয়াছি তাহাতে এইটুকু বুঝিতে পারি যে সর্ব্ব-উপনিষদ্-সার, জ্ঞান ও কর্ম্মের সামঞ্জস্য-বিধায়ক ভগবৎমুখ-নিঃসৃত গীতা

শাস্ত্রই তাঁহার জীবনের নিয়ন্তা। তাঁহার সমস্ত কর্ম্মই জ্ঞান দ্বারা পরিশোধিত। তাঁহার অবিরাম কর্ম্মজীবন কখনও দর্শন, শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন হইতে বিচ্যুত হয় নাই। গীতা তাঁহার বাইবেল, কোরাণ ও বেদ এবং রাজর্ষি জনক তাঁহার কর্ম্ম-জীবনের আদর্শ।

ভারতবর্ষের দোহন-নিবারণ।

ভারত কামধেনু স্বরূপ। যাহা চাও তাহার নিকট তাহাই পাওয়া যায়। কিন্তু বহুদিন হইতে কামধেনু পরকর-কবলস্থ। ভারতবাসী বহু ঈপ্সিত বস্তু হইতে বঞ্চিত। তাহার ভাগ্য পরভাগ্যোপজীবীর ন্যায় হইয়াছে। ভারতবর্ষে তূলা জন্মে, বহুদিন হইতে এ দেশীয় লোকেরা ঐ তূলাদ্বারা সূত্র প্রস্তুত করিতেন এবং তদ্দ্বারা বস্ত্র বয়ন করিয়া স্বদেশের ও বহু বিদেশের পরিধেয় বস্ত্রের ব্যবস্থা করিতেন। কর্ম্মানুবন্ধ ভাগ্য-বিপর্য্যয়ে ভারতবাসীদিগের এখন প্রতি বৎসর ৭৫ কি ৮০ কোটী টাকা মূল্যের বস্ত্র বিদেশ হইতে আনিতে হয়। এই ৭৫ কি ৮০ কোটী টাকার বস্ত্র যদি এদেশে উৎপন্ন করা যাইতে পারিত তাহা হইলে তাহাতে বহুলোকের জীবিকা-সংস্থান হইত এবং দেশের এই বিপুল অর্থ বিদেশে চলিয়া গিয়া দেশকে নিঃস্ব করিতে পারিত না। বিগত ইউরোপীয় মহাসমরের সময় ভারতবাসী বহু নরনারী বস্ত্রাভাবে দিগম্বর ও দিগম্বরী রূপ ধারণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এদেশে যদি প্রতি গৃহে সূত্র-নির্ম্মাণ ও বস্ত্র-বয়নের প্রথা থাকিত তাহা হইলে ভারতবাসীকে এরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইতে হইত না। আমার গৃহে জাত কার্পাস দ্বারা যদি আমি সূত্র নির্ম্মাণ করিয়া তদ্দ্বারা বস্ত্র বয়ন করিতে পারি, তাহা হইলে বিদেশজাত বস্ত্রের মূল্য যতই অধিক হউক না কেন, তাহাতে আমার কোন ক্ষতির কারণ নাই। মহাত্মা গান্ধী কেবল বস্ত্র-শিল্পের উপরেই সমস্ত শক্তিকে কেন্দ্রীভূত করিয়াছেন। ইহার কারণ এই—একই সময়ে বহুবিষয়ে মনোনিবেশ করিলে কোন বিষয়েই সফলকাম হওয়া যায় না। "ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন। বহুশাখা হ্যনন্তাশ্চবুদ্ধয়োঽব্যবসায়িনাম্॥ অর্থাৎ হে কুরুনন্দন, এক বিষয়ে স্থিরবুদ্ধি কর, অস্থিরবুদ্ধি ব্যক্তিদিগেরই বুদ্ধি অনন্ত ও বহু-শাখাবিশিষ্ট। গৃহে গৃহে বস্ত্রশিল্পের প্রবর্ত্তন করিয়া বিদেশাগত বস্ত্রের ক্রয় যদি একেবারে লুপ্ত করা যায় তাহা হইলে অন্যান্য দ্রব্যশিল্পের সম্বন্ধেও ঐ উপায় অবলম্বন করা সুকর ও সহজ হইবে। বণিকের অর্থ-চরিতার্থতার সম্ভাবনা না থাকিলে ভারতবর্ষের প্রতি তাহার আসক্তির অভাবে তাহার ভারতবাসীর স্বাধীনতার বিরুদ্ধে উপায় অবলম্বনের কারণের অভাব হইবে। সুতরাং উহা স্বারাজ্যপ্রাপ্তির

একটী প্রকৃষ্ট উপায়। সূত্র-নির্ম্মাণ ও বস্ত্রবয়ন শিল্পদ্বারা মহাত্মা গান্ধী সকল শিল্পকেই স্বীয় অভিপ্রেত করিয়াছেন, কার্য্য-সৌকর্য্যার্থে একটীর উপরেই বৃদ্ধি স্থির করিতে বলিয়াছেন।

হিন্দু-মুসলমান-প্রীতি।

সাধারণতঃ হিন্দু ও মুসলমানে অপ্রীতি দেখা যায় না। কোন স্থানেই পল্লী-গ্রামে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে বিবাদ বিসংবাদ নাই; উহাদের মধ্যে সদ্ভাবই আছে। পরস্পর পরস্পরের সুখ দুঃখ আপদ বিপদে সহানুভূতি-সম্পন্ন। কিন্তু কতকগুলি স্বার্থপর লোকে নানাপ্রকার অবাস্তব সংবাদাদি প্রচার করিয়া পরস্পরকে পরস্পরের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে এবং জ্ঞানতঃ বা অজ্ঞানতঃ উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বিদ্বেষাগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া ভারতবর্ষকে ভস্মীভূত করিতে চাহে।

হিন্দুর মধ্যে পরস্পর প্রীতি।

কিন্তু হিন্দু-মুসলমানে প্রীতি স্থাপিত হওয়ার পূর্ব্বে হিন্দুদিগের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রীতি-স্থাপন একান্ত আবশ্যক। বহুকাল পর্য্যন্ত নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুরা উচ্চবর্ণ-সমূহের নানাবিধ অত্যাচার সহ্য করিয়া এক্ষণে বিদ্রোহী হইবার লক্ষণ দেখাইতেছে। হিন্দু ধর্ম্ম হইতে অস্পৃশ্যতা-দূরীকরণ ও নিম্নবর্ণ-সমূহের উন্নতি-সাধনে মনোযোগ না করিলে উহারা ক্রমশঃ হিন্দু-সম্প্রদায় হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার উদ্যোগ করিয়া হিন্দু-সম্প্রদায়কে দুর্ব্বল করিয়া ফেলিবে। এইজন্য মৌলানা মহম্মদ আলি এক সময়ে বলিয়াছিলেন যে যদি হিন্দুরা নিম্ন-শ্রেণীর প্রতি কৃপা-দৃষ্টি না করেন, তবে মুসলমানেরা তাহাদিগকে সাদরে ক্রোড়ে করিয়া লইবেন। দূরদর্শী মহাত্মা বুঝিতে পারিয়াছেন যে অস্পৃশ্যতা দূরীভূত করিতে না পারিলে কি হিন্দুসমাজ, কি ভারতবর্ষ, উভয়ের ভবিষ্যৎ তমসাচ্ছন্ন। অস্পৃশ্যতা কি তাহা হিন্দুপত্রিকার এই সংখ্যায় প্রবন্ধান্তরে দেখাইবার চেষ্টা পাইয়াছি।

হিন্দুধর্ম্ম-পরিত্যাগে অস্পৃশ্যতার লোপ।

বর্ত্তমানে অস্পৃশ্য জাতির কেহ যদি হিন্দুধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া মুসলমান বা খ্রীষ্টান বা অন্য কোন ধর্ম্ম গ্রহণ করে, অমনই তাহার অস্পৃশ্যতা দূরীভূত হয়। তাহা হইলে সনাতন ধর্ম্মই তাহার অস্পৃশ্যতার কারণ। কোথায় সনাতন ধর্ম্ম তদনুবর্ত্তীর পবিত্রতার কারণ হইবে, না উহাই তাহার অস্পৃশ্যতার কারণ হইল,

ইহা অপেক্ষা অধিক বিষাদের বিষয় আর কি হইতে পারে? এইরূপ কিম্বদন্তী আছে যে স্পর্শমণির সংস্পর্শে লৌহাদি ইতর ধাতু সুবর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়, চন্দন তরুর সংস্রবে সেই বনের ইতর বৃক্ষসমূহও চন্দনত্ব প্রাপ্ত হয়। সেইরূপ এখানে সনাতন ধর্ম্মের সংস্পর্শে অস্পৃশ্যদিগের স্পৃশ্যতা সম্পাদিত হওয়াই স্বাভাবিক, কিন্তু আমাদের সমাজে পবিত্র সনাতন ধর্ম্মের সংস্পর্শে বহুজাতি অস্পৃশ্য হইয়া রহিয়াছে। হয় ইহাদিগকে সমাজ হইতে বাহির করিয়া হিন্দুসমাজকে ক্ষীণ, দুর্ব্বল ও হীনপ্রভ করিয়া রাখুন, অথবা ইহাদের সামাজিক ও নৈতিক উন্নতি-সাধনে সহায়তা করিয়া হিন্দুসমাজকে জীবিত ও সবল করুন। মন কোন্ পন্থা অবলম্বন করিতে বলে? "সতাং হি সন্দেহপদেষু বস্তুষু প্রমাণম্ অন্তঃকরণ-প্রবৃত্তয়োঃ।" সেন্‌সস্ রিপোর্ট পাঠে অবগত হওয়া যায় যে প্রতি বৎসর বহু-সংখ্যক নিম্ন শ্রেণীর হিন্দু উচ্চশ্রেণীর অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া ধর্ম্মান্তর-পরিগ্রহ করিতেছে।

বাহ্য ভক্তি।

মহাত্মার প্রতি অনেকের আন্তরিক শ্রদ্ধা আছে। আবার অনেকে তাঁহার প্রতি বাহ্য ভক্তি মাত্র প্রদর্শন করেন। কিন্তু মহাত্মা নিজেই বলিয়াছেন যে তাঁহার প্রতি বাহ্য ভক্তি প্রদর্শন না করিয়া যাহারা তাঁহার প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করেন তাহারাই তাঁহার প্রীতি-সম্পাদন করেন।

সনাতন বর্ণভেদঃ।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায় নমঃ।

১। অথ বর্ণভেদ-জিজ্ঞাসা।

২। বর্ণা বহুবিধাঃ শ্বেত-কৃষ্ণ-নীল-পীত-লোহিতাদয়ঃ।

৩। তেষাং মিশ্রণেন সঙ্করবর্ণা জায়ন্তে।

৪। বহুবর্ণাঃ স্থাবর-জঙ্গমাঃ সঙ্করা মৌলিকাশ্চ।

৫। স্থাবর জঙ্গমানামিব মানবাশ্চ বহুবর্ণাঃ।

৬। শীতোষ্ণাদিগুণ-ভেদাৎ, দেশ-ভেদাচ্চ মনুষ্যাণাং বর্ণভেদঃ সঞ্জায়তে।

৭। ন তু স গুণভেদাৎ।

৮। ন তথা কর্ম্ম-ভেদাৎ।

৯। গুণ-কর্ম্মণী উভে পরস্পরং কার্য্যকারণ এব।

১০। গুণাঃ কর্ম্মাণি চ সত্ত্ব-রজস্তমোভেদাৎ ত্রিধা।

১১। (ক) প্রকাশকত্বাৎ সত্ত্বস্য সদৃশঃ শ্বেতঃ,

(খ) অপ্রকাশকত্বাৎ তমসঃ সদৃশঃ কৃষ্ণঃ,

(গ) অনুরাগিত্বাদাংশিক-প্রকাশকত্বাচ্চ সত্ত্বতমসোর্ম্মধ্যস্থং রজঃ, লোহিত-পীতাদীতরবর্ণানাং সদৃশম্।

১২। সত্ত্বগুণ-কর্ম্মপ্রধান-মনুষ্যো ব্রাহ্মণ ইত্যুচ্যতে।

১৩। তমোগুণ কর্ম্মপ্রধান-মনুষ্যঃ শূদ্র ইত্যুচ্যতে।

১৪। রজোগুণ-কর্ম্মপ্রধান-মনুষ্যঃ ক্ষত্রিয় ইত্যুচ্যতে।

১৫। ক্ষত্রিয়াৎ সত্ত্বস্যাল্পতয়া রজোগুণ-কর্ম্মপ্রধান-মনুষ্যো বৈশ্য ইত্যুচ্যতে।

১৬। এষ হি সর্ব্বদেশকালপাত্রেষু সনাতন-বর্ণভেদঃ।

রবীন্দ্রনাথ।

লেখক—সম্পাদক।

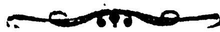
৺দ্বারকানাথ ঠাকুরের নাম বঙ্গদেশ আজও বিস্মৃত হয় নাই। ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের পরেই তিনি বিলাতে গমন করেন। এদেশ হইতে যাইবার সময় তিনি পাল্কী ও বেহারা পর্য্যন্ত লইয়া যান। বিলাতে পাল্কী-আরোহণ একটী অভিনব ব্যাপার। ফ্রান্সের রাজ-পরিবারের নিকটে তিনি যথেষ্ট সম্মান-প্রাপ্ত হন। মহারাণী ভিক্টোরিয়া ও প্রিন্স্ এলবার্ট, তাঁহাকে যথেষ্ট সমাদর করেন। বর্ত্তমানে বিলাত-গমনকারী ভারতীয় রাজন্য-বর্গও দ্বারকানাথের ন্যায় সম্মানিত হন না। রাজবংশে জন্মগ্রহণ না করিয়াও তিনি বিলাতে 'প্রিন্স্' পদবীতে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। রাজ-পরিবারের সহিত তাঁহার এতই ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়াছিল যে প্রিন্স এলবার্টও তাঁহার সহিত সতরঞ্চ খেলিতেন এবং ঐ খেলায় মহারাণী দ্বারকানাথের পক্ষ অবলম্বন করিতেন আল ঐশ্বর্য্য এবং মুক্তহস্তে ব্যয় এবং বহুবিধ সামাজিক, রাজনীতিক

আন্দোলনে যোগদান করিয়া তিনি যথেষ্ট সম্মান লাভ করিয়াছিলেন। রামমোহনের সঙ্গে যে তাঁহার অকৃত্রিম বান্ধবতা ছিল তাহা চিরকালই ইতিহাসে জ্বলন্ত অক্ষরে দীপ্যমান থাকিবে।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ দ্বারকানাথের একমাত্র পুত্র। যৌবনে নানাবিধ দুর্ঘটনার মধ্যে পড়িয়াও পৈতৃক সম্পত্তি ও মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া তিনি রাজর্ষি জনকের ন্যায় বিষয়ের অভ্যন্তরে থাকিয়াও ভগবানে চিত্ত স্থির রাখিয়াছিলেন। তাঁহার ধর্ম্মজীবন কেবল বাঙ্গালার নহে, সমগ্র ভারতের সম্পত্তি; কেবল ভারতের নহে, সমগ্র পৃথিবীর সম্পত্তি। ব্রহ্মানন্দ মহাত্মা কেশবচন্দ্র তাঁহার শিষ্য বলিলে ধর্ম্মজগতে তাঁহার স্থান নির্দ্দেশ করা হইল। তাঁহার পুত্রগণ সকলেই পণ্ডিত, কৃতী, ধার্ম্মিক—ভগবদ্ভক্ত। ভারতের সর্ব্বত্রই তাঁহারা সুপরিচিত। কিন্তু পুত্রদিগের মধ্যে সর্ব্বকনিষ্ঠ রবীন্দ্রনাথ সর্ব্বাপেক্ষা কুল ও দেশ ধন্য করিয়া দেবেন্দ্রনাথের স্মৃতিকে এক অপূর্ব্ব জ্যোতি প্রদান করিয়াছেন।

বৈদিক কবিদিগকে 'ঋষি' আখ্যা দেওয়া হইত। যিনি দেখেন তিনি 'ঋষি'। সাধারণ লোকে সব জিনিষ দেখিয়া যায় কিন্তু তাহাদের দৃষ্টি ভাসা ভাসা—অন্তরে প্রবেশ করে না। সাধারণের চক্ষে যাহা না পড়ে, কবির চক্ষে তাহা পড়ে।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন যে কবিদিগের মধ্যে তিনি 'উশনা'। পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগের কথা ছাড়িয়া দিয়া বর্ত্তমান যুগে রবীন্দ্রনাথকে পৃথিবীর কবিদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিতে কাহারও সঙ্কোচবোধ হইবার বোধ হয় কোন কারণ নাই। রবীন্দ্রনাথ কেবল বাঙ্গালার কিম্বা ভারতের কিম্বা আসিয়া-খণ্ডের নহেন, তিনি পৃথিবীর কবি। রবীন্দ্রনাথ অন্তর্দৃষ্টির দ্বারা ভারতের শ্রেষ্ঠত্বের আকর প্রাপ্ত হইয়া তাহাই বিশ্বভারতীর দ্বারা দেশে, বিদেশে বিতরণ করিবার জন্য স্বীয় জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন; এবং সেই উদ্দেশ্যেই বৃদ্ধ বয়সে পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা আহূত হইয়া ভারতের সহিত চীনের আত্মিক সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ করিবার জন্য সম্প্রতি চীন প্রদেশে যাত্রা করিয়াছেন। ভগবান তাঁহাকে দীর্ঘজীবী করিয়া তাঁহার মনস্কাম পূর্ণ করুন।



শ্রীহরিঃ।

(১৮৪৫ সালের ২০ আইন্ মতে রেজেষ্টীকৃত)

হিন্দু-পত্রিকা।

৩১শ বর্ষ, ৩১শ খণ্ড ২য় সংখ্যা।	জ্যৈষ্ঠ।	১৩৩১ সাল। ১৮৪৬ শকাব্দাঃ

বৈষ্ণব-দর্শন।

লেখক—ডাক্তার মহেন্দ্রনাথ সরকার এম্, এ, পি এইচ, ডি।

বাণীর বর-পুত্রগণ! পুণ্য-স্মৃতি রামমোহনের জন্মস্থান বাঙ্গালীর নিকট তীর্থ-সঙ্গম। রামমোহন রায়ই বেদান্তের কথা একদিন বাঙ্গালীর কাছে উপস্থিত করিয়াছিলেন। আজ তাঁহার জন্মভূমিতে বেদান্তের আলোচনাই তাঁহার স্মৃতির প্রকৃত পূজা। শ্রীমন্মহাপ্রভুর পরিকর অভিরাম গোস্বামীর চরণরেণু-স্পর্শে এই ভূমি পবিত্র। বৈষ্ণব-দর্শন আলোচনাই তাঁহার দিব্য স্মৃতির প্রকৃত অর্চ্চনা।

বৈষ্ণব-দর্শন সম্বন্ধে কোন কথা বলিতে গেলেই আমাদের মনে রাখা উচিত যে বেদান্ত-দর্শনই বৈষ্ণব-দর্শন। ষড়্দর্শনের মধ্যে বেদান্তদর্শন অন্যতম। অন্যান্য দর্শন হইতে বেদান্তদর্শনের এই পার্থক্য যে ইহা শ্রুতিমূলক। বেদান্তদর্শনের চিন্তাপ্রণালী বুঝিতে হইলে আমাদের ইহা কখনও ভুলিলে চলিবে না যে বেদান্তের জিজ্ঞাস্য ঔপনিষদ ব্রহ্ম। জ্ঞানের যতগুলি পথ আছে—প্রত্যক্ষ, ও বিচার—বৈদান্তিকেরা ইহার কোনটা অস্বীকার না করিলেও, শ্রুতিকেই

* রাধানগরে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের দর্শন শাখায় পঠিত।

একমাত্র ব্রহ্মের জ্ঞাপক বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। কথাটা আপাততঃ—বিশেষ আজকালকার দিনে, গোঁড়ামি বলিয়া উপেক্ষিত হইতে পারে। কিন্তু একটু পর্য্যালোচনা করিলে ইহার গভীরতা হৃদয়ঙ্গম হইবে। দর্শন-শাস্ত্র আমাদের নিকট অবিসংবাদিত সত্যকে উপস্থিত করিতে চায়। আমাদের বিচারের প্রচেষ্টার কোনই ফল হয় না যদি সেই বিচার সত্য-প্রতিষ্ঠিত না হয়। বিচার বুদ্ধিকে নিয়মিত করে; সংস্কৃত বুদ্ধি এবং ধ্রুবানুস্মৃতি নির্ম্মল ও তেজোময় সত্যকে আমাদের নিকট উপস্থিত করে। বিচার কিন্তু নানা পথগামী। স্বাতন্ত্র্য বিচার আমাদের বুদ্ধিকে সূক্ষ্মদৃষ্টি-সম্পন্ন করিলেও, ইহা এক তত্ত্বস্থাপনে সমর্থ হয় না। দর্শনশাস্ত্রের ইতিহাস ইহার সাক্ষ্য দেয়। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে এরূপ বিচার-প্রবাহের ঘাত-প্রতিঘাতে সত্যের স্বরূপ সম্বন্ধে নানাবিধ অভিমত প্রচারিত হয়। বুদ্ধির কৌশলরূপেও ইহার স্থান অতি উচ্চে। কিন্তু এরূপ বিচার মানুষের অন্তঃকরণকে তৃপ্ত করিতে পারে না যতদিন না মানুষ সত্যকে অনুভূতির ভিতর প্রাপ্ত হয়। বেদান্ত-দর্শন এই অনুভূতিকে বিচার হইতে উচ্চস্থান দিয়াছেন। বিচারশাস্ত্রে প্রতিজ্ঞার সর্ব্বত্রই সম্ভাবনা দোষ (Possibility) থাকিয়া যায়, কিন্তু অনুভূতিতে এইরূপ সম্ভাবনা দোষের কোন স্থান নাই। বিচার হইতে এইরূপ বিদ্বদনুভূতি শ্রেষ্ঠ। এই কথা বেদান্তের সকল আচার্য্যেরাই স্বীকার করিয়াছেন। বাচস্পতি মিশ্র ভামতীতে প্রত্যক্ষ প্রমাণ হইতে শ্রুতি প্রমাণকে গরীয়ান্ প্রমাণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন—যে হেতু শ্রুতি অপৌরুষেয়, নিরস্তসমস্তদোষ এবং স্ববিষয়ে অনন্যাপেক্ষিত—"তস্য অপৌরুষতয়া নিরস্তসমস্ত-দোষাশঙ্কস্য বোধকতয়া স্বতঃসিদ্ধপ্রমাণভাবস্য স্বকার্য্যে প্রমিত্যাবনপেক্ষত্বাৎ।"

আচার্য্য রামানুজ ব্রহ্মবিষয়ক প্রমাণের নানাবিধ দোষ দেখাইয়া সর্ব্বশেষে বলিয়াছেন,—"শাস্ত্রৈকপ্রমাণকঃ পরব্রহ্মভূতসর্ব্বেশ্বরঃ পুরুষোত্তমঃ।"

আচার্য্য বল্লভ তাঁহার অণুভাষ্যে বলিয়াছেন—"ব্রহ্ম পুনঃ যাদৃশং বেদান্তেষু অবগতং, তাদৃশমেব মন্তব্যম্। নহি স্ববুদ্ধ্যা বেদান্তং পরিকল্প্য তদর্থং বিচারকর্ত্তুং শক্যঃ।"

শ্রীনিবাসাচার্য্য তাঁহার বেদান্ত-কৌস্তুভে এই কথারই পুনরুক্তি করিয়াছেন—"ব্রহ্ম ন অনুমানাদিগম্যং কিন্তু বেদপ্রমাণকং কুতঃ শাস্ত্রযোনিত্বাৎ।"

ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের মধ্যে একমাত্র বেদান্তদর্শনের ইহাই বিশেষত্ব। ন্যায়াদি দর্শনে আপ্তবাক্য প্রমাণরূপে গৃহীত হইলেও ন্যায়াচার্য্যেরা অনুমানের উপরই বেশী জোর দিয়াছেন। সাংখ্যদর্শন আপ্তবাক্য গ্রহণ করিলেও, সমাধি এবং যোগকেই সত্যানুভূতির প্রধান কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

কিন্তু বৈদান্তিক আচার্য্যেরা বিচার এবং অনুভূতিকে গ্রহণ করিলেও, সেই বিচার এবং অনুভূতির ফল যদি শ্রুতি-সিদ্ধান্তের অনুরূপ না হয় তবে তাহা সত্য বলিয়া গ্রহণ করেন না। বস্তুতঃ মানুষের সাম্‌নে এমন একটা সত্যনির্ণায়ক বস্তু আবশ্যক যাহার প্রামাণ্য কেহ কোনকালে অস্বীকার করিতে পারে না। পুরুষ-বিশেষের অনুভূতি বা বিচার উজ্জ্বল হইলেও অন্য পুরুষের অনুভূতি বা বিচার উজ্জ্বলতর হইতে পারে। অতএব সত্যসিদ্ধান্তে সর্ব্বজ্ঞ পুরুষের স্বরূপভূত প্রজ্ঞার স্থান অতি উচ্চে। যৌগিক অনুভূতি সাধারণ প্রত্যক্ষ হইতে উচ্চে স্থিত হইলেও, সর্ব্বব্যাপক নহে বলিয়া, সত্যের সম্পূর্ণ দ্যোতনা করিতে পারে না।

অতএব, সর্ব্বজ্ঞ পুরুষের স্বরূপভূত প্রজ্ঞাই একমাত্র সত্যসিদ্ধান্তে পৌঁছিবার শ্রেষ্ঠ পথ। শ্রুতি এই স্বরূপভূত প্রজ্ঞার সমষ্টি। বৈদান্তিকের মতে শ্রুতির উপর ঈশ্বরেরও কর্ত্তৃকত্ব নাই। ইহা সম্পূর্ণ অপৌরুষেয়,, অনাদিকাল হইতে ইহা যে ভাবে রহিয়াছে সেই ভাবেই থাকিবে। ইহা নিত্য এবং অপরিবর্ত্তনশীল। এই শ্রুতির অপৌরুষেয়ত্ব, অনাদিত্ব এবং সত্যজ্ঞাপকত্ব সমস্ত বেদান্ত আচার্য্যেরাই মানিয়া থাকেন। আচার্য্য শঙ্কর ইহার অনাদিত্ব স্বীকার করিলেও ব্রহ্মজ্ঞানানন্তর ইহার কার্য্যকারিতা মানেন না। কিন্তু বৈষ্ণবাচার্য্যেরা ইহার অনাদিত্ব এবং অনন্তত্ব দুইই সর্ব্বাবস্থায় স্বীকার করিয়া থাকেন।

অপৌরুষেয়তা ভিন্ন শ্রুতি প্রামাণ্যের আর একটী কারণ আছে। তাহা হইতেছে অবাধিতবিষয়কত্ব—শ্রুতি আমাদের নিকট যে পদার্থ প্রকাশ করে তাহার কখনও বাধ হয় না। অতএব শ্রুতিপ্রামাণ্যের স্বরূপ হইতেছে—অপৌরুষেয়তা, অবাধিতবিষয়কত্ব, প্রমাণান্তরাগ্রাহ্যসত্যজ্ঞাপকত্ব। এই শ্রুতির প্রতিপাদ্য কি ইহা জানিতে পারিলে বেদান্তমতের সত্য নির্ণয় হইয়া যায়।

ব্রহ্মসূত্র উপনিষদ্‌বাক্যের সমন্বয়। শঙ্করের ভাষায় বলিতে গেলে "বেদান্ত-বাক্যঃ গ্রথিতানি কুসুমানি সূত্রাণি।" এই গ্রথিত সূত্রগুলি আমাদের নিকট শ্রুতিসিদ্ধান্ত উপস্থিত করে। বস্তুতঃ, সমস্ত বেদান্তদর্শনসাহিত্যের উৎপত্তিস্থল এই কয়েকটী সূত্র। এই কয়েকটী সূত্রকে অবলম্বন করিয়া পরবর্ত্তী আচার্য্যেরা বিচারের দ্বারা শ্রুতির বিষয়কে নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এই বিচারকে দুইভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে—(১) শ্রুতিসমন্বয় এবং তাৎপর্য্যবোধ। (২) শ্রুতি-বিজ্ঞান। অদ্যকার এই প্রস্তাবে আমরা দ্বিতীয় বিষয়টী আলোচনা করিব।

শ্রুতিসমন্বয়ের কথা অনেক। এবং এই সমন্বয় কতকটা শ্রুতিবিজ্ঞানেরও অপেক্ষা করে। শ্রুতি এক হইলেও এই শ্রুতিকে অবলম্বন করিয়া দুইটী বিজ্ঞানের ধারা প্রবাহিত হইয়াছে। একটী শঙ্করের নির্বিশেষ জ্ঞানবাদ; আর একটী বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সবিশেষ জ্ঞানবাদ। বেদান্তদর্শনের মূলভিত্তি হইতেছে জ্ঞান এবং তাহার স্বরূপ। কারণ, বেদান্তের সকল আচার্য্যেরাই ব্রহ্মকে সৎ, চিৎ এবং আনন্দ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। শ্রুতিতেত ব্রহ্মকে সৎ, চিৎ এবং আনন্দ বলা এইয়াছে।

ব্রহ্ম সৎ—ব্রহ্মকে সৎ না বলিলে অসৎ বা শূন্য জগতের কারণ হইয়া পড়ে। অসৎ হইতে প্রাতিভাসিক সত্তারও উৎপত্তি কল্পনা করা যায় না। ইহা দ্বারা শূন্যবাদ নিরাকৃত হইল।

ব্রহ্ম চিৎ। ব্রহ্ম যদি সন্মাত্র এবং চৈতন্যে দীপ্তিপূর্ণ না হন তবে জগৎ আন্ধ্যপ্রসঙ্গ হয়। বৃহদারণ্যক উপনিষদে এই কথাটাই সুন্দররূপে বলা হইয়াছে। সূর্য্য অস্তমিত হইলে, চন্দ্রের আলোক বিশ্ব আলোকিত করে। চন্দ্র অস্তগামী হইলে অগ্নির আলোকে বিশ্ব আলোকিত করে। কিন্তু সূর্য্য, চন্দ্র এবং অগ্নি অস্তমিত হইলে স্বয়ং-জ্যোতিঃ আত্মাই বিশ্ব আলোকিত করে। বস্তুতঃ ইহার দ্বারা জড়বাদ নিরাকৃত হইল।

ব্রহ্ম আনন্দ, ব্রহ্ম ভূমা। ভূমা বা অনবচ্ছিন্ন সত্তাই আনন্দ-জ্ঞাপক। ইহার দ্বারা সাংখ্যের চিন্মাত্র পুরুষের নিরাকরণ হইল।

এই পর্য্যন্ত বেদান্তের আচার্য্যেরা সকলেই একমত। কিন্তু জ্ঞানের স্বরূপ নির্ণয় করিতে গিয়া বৈদান্তিকের ভিতর মতভেদ হয়। বৈষ্ণব-দর্শনের সহিত শঙ্কর-দর্শনের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠতা আছে। অতএব শাঙ্কর মতের কিছু আলোচনা আবশ্যক।

আচার্য্য শঙ্কর আত্মাকে স্বপ্রকাশ বলিয়াছেন। বৈষ্ণবাচার্য্যেরাও আত্মাকে স্বপ্রকাশ বলিয়া থাকেন। এই বিষয়ে মীমাংসক ভট্ট-মত হইতে বৈদান্তিকের মতভেদ আছে। পার্থসারথিমিশ্র শাস্ত্রদীপিকায় লিখিয়াছেন,—"স্বপ্রকাশস্য কস্যচিদপি অদর্শনাৎ, সর্ব্বস্যৈব বস্তুনঃ পরপ্রকাশত্বনিয়মাৎ।" স্বপ্রকাশের লক্ষণে উভয় সম্প্রদায়ের ভিতর মতভেদ উপস্থিত হয়। শঙ্করের মতে প্রকাশই আত্মা, আত্মাই প্রকাশ—শঙ্কর জ্ঞানের দুইটী ভেদ করিয়াছেন। নির্ব্বিকল্প জ্ঞানই তাঁহার মতে জ্ঞান। এই জ্ঞানে বিষয়, বিষয়ী, ধর্ম্ম এবং ধর্ম্মী ভেদ নাই। ইহা জ্ঞান মাত্রই। ইহার কোন রূপ নাই, আকার নাই। পঞ্চদশীর ভাষায় বলিতে

হয়,—"নোদেতি নাস্তমেতি সম্বিদেষা স্বয়ংপ্রভা।" সবিকল্প জ্ঞানে বিষয়, বিষয়ী ভেদ থাকাতে ইহা জ্ঞান স্বরূপ নহে।

শাঙ্কর সম্প্রদায় [illegible] নির্বিকল্পজ্ঞান, যে জ্ঞান জ্ঞাতা, জ্ঞেয় এবং জ্ঞানের ভেদ ও অস্তিত্বকে প্রকাশ করে, তাহা খণ্ডন করিয়াছেন। জ্ঞানই ভেদের জ্ঞাপক, কিন্তু ভেদ জ্ঞানের জ্ঞাপক নহে। ভেদটা জ্ঞানেই অবভাসিত হয় কিন্তু যদি বিষয় এবং বিষয়ীর ভেদ লইয়া জ্ঞানের ভেদ মানা হয় তবে অন্যোন্যাশ্রয় দোষ হইয়া পড়ে। চিৎসুখাচার্য্য এইজন্য বলিয়াছেন যে জ্ঞান বিষয় এবং বিষয়ী এই দুইটার ভেদ যুগপৎ প্রকাশ করে না।

রামানুজ কিন্তু এই নির্বিবিশেষ জ্ঞানকেই একেবারে অস্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার মতে জ্ঞান কখনই জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয় ভিন্ন থাকে না। স্বয়ং প্রকাশ অনুভূতি আত্মারই ধর্ম্ম। এইরূপ অনুভূতি বিষয়কে আত্মার নিকট জ্ঞাপন করে,—"বর্ত্তমানদশায়াং স্বসত্তয়ৈব স্বাশ্রয়ং প্রতি প্রকাশমানত্বং, স্বসত্তয়ৈব স্ববিষয়-সাধনত্বং বা।" নিজের নিকট নিজকে এবং বিষয়কে প্রকাশ করাই অনুভূতির ধর্ম্ম। কোন কালেই অনুভূতি এই ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হয় না। রামানুজ-মতে জ্ঞান একটা প্রচেষ্টা, যাহার সর্ব্বকালেই কর্ম্ম হইতেছে বিষয় ও আত্মার সহিত একটা সম্বন্ধ করিয়া দেওয়া এবং সেই সম্বন্ধটাকে সবিশেষ আকারে ফুটাইয়া তোলা। বিষয় ও বিষয়ীর সহিত এইরূপ সম্বন্ধ, প্রত্যক্ষ এবং স্মৃতির সহিত এইরূপ সম্বন্ধ দ্বারাই জ্ঞান নিজের স্বরূপ প্রকাশ করিয়া থাকে। জ্ঞানের এইরূপ নিজকে বিশেষরূপে প্রকাশ করিবার একটা অন্তর্নিহিত স্বভাব আছে। এই স্বভাবের ফলে ইহা নির্বিবিশেষ অবস্থায় কখনই থাকে না। পূর্ণ নির্বিবিশেষ জ্ঞান আত্মবিরোধ-সম্পন্ন। নৈয়ায়িকের বিশিষ্ট অনবগাহী বা নির্ব্বিকল্প জ্ঞান, রামানুজ সম্পূর্ণ অস্বীকার করিয়াছেন। নির্ব্বিকল্প জ্ঞানও সবিকল্প জ্ঞান। কিন্তু তাহার বিশিষ্ট অংশটা সম্পূর্ণ স্ফুরিত না হওয়াতেই নির্ব্বিকল্প ন্যায় প্রতীত হয়। বস্তুতঃ, জ্ঞান সর্ব্বভূমিতেই সবিকল্প এবং সবিশেষ। স্মৃতির অল্পতাহেতু সবিশেষ জ্ঞান নির্বিবিশেষরূপে প্রতীত হইলেও, জ্ঞান কখনই নির্বিবিশেষ হয় না। অতএব রামানুজ-মতে প্রত্যক্ষ মাত্রই প্রত্যভিজ্ঞা। জ্ঞানের আত্মস্ফুরণের একটা নিয়ামকতা আছে। এবং সেটা হইতেছে এই, জ্ঞান সর্ব্বকালের ভিতর দিয়া নিজের বিশেষ রূপটাকে পূর্ণ করিয়া ফুটাইয়া তোলে। সামান্য পদার্থ প্রত্যক্ষ স্থলেও জ্ঞান তাহার পূর্ণ স্বরূপকে সেখানে উপস্থিত করে এবং এই জ্ঞানটাকে তাহার স্বরূপের অন্তর্গত করিয়া লয়। জ্ঞান স্বরূপের

এইরূপ পূর্ণ স্ফুরণ যেখানে প্রকাশিত না হয় সেখানে জ্ঞান নির্বিকল্প। নির্বিকল্পক জ্ঞান পূর্ণ জ্ঞানের সম্বন্ধ-রহিত একাংশের প্রকৃতি। বস্তুতঃ শঙ্কর ও রামানুজের জ্ঞান বিচারের এই পার্থক্য যে শঙ্করের জ্ঞান স্থিতিস্বরূপ, রামানুজের জ্ঞান স্থিতিগতিস্বরূপ। শঙ্করের জ্ঞান নিত্যই একরূপে অবস্থিত। রামানুজের জ্ঞান একরূপে অবস্থিত হইলেও, ইহার ভিতর স্ফুরণ আছে এবং সেই স্ফুরণের ধারার ভিতর দিয়াই ইহার স্বপ্রকাশত্ব সিদ্ধ হয়। ইহা অনন্ত ধারাপুঞ্জ বা জ্ঞানসন্ততিপ্রবাহ, কিন্তু বৌদ্ধ বিজ্ঞানবাদের আলাতচক্র নহে। একটী জ্ঞানের ধারার সহিত আর একটী জ্ঞানের সম্বন্ধ নাই—এরূপ নহে। প্রত্যেক সন্ততিটী ঐ মূল জ্ঞান-উৎসের আত্মপ্রকাশ। ঐ মূল উৎস ভিন্ন তাহাদের প্রকৃত সত্তা নাই। এইরূপভাবে জ্ঞান তাহার অনন্ত ধারার ভিতর দিয়া ত্রিকালেই তাহার পূর্ণ বিশিষ্টতা রক্ষা করিতেছে। চিৎসুখাচার্য্যের স্বপ্রকাশত্বের লক্ষণ—"অবেদ্যত্বে সতি অপরোক্ষব্যবহার-যোগ্যত্ব"—রামানুজ মানেন নাই। বেদ্য হইলেই যে জ্ঞান হইবে না এইরূপ বলা যায় না। জ্ঞান স্বয়ং জ্ঞাতা হইলেও জ্ঞেয় হইতে পারে, বোদ্ধা হইয়াও নিজের বিষয় হইতে পারে। অতএব জ্ঞানের স্বরূপভূত লক্ষণ হইতেছে এই যে জ্ঞান নিজেই বিষয় এবং বিষয়ী। ইহা আত্মসাক্ষী—শুধু সাক্ষী নহে। ইহা self-cognizer, শুধু cognition নহে। এই বিষয়, বিষয়ী বোধ জ্ঞান স্বরূপে কখনই নষ্ট হয় না। কিন্তু জ্ঞানের স্বরূপাবস্থায়, জ্ঞানই বিষয় এবং জ্ঞানই বিষয়ী। জ্ঞানই জ্ঞানের নিকট আত্মপ্রকাশ করে। এই প্রকাশরূপ প্রচেষ্টার কখনই লয় হয় না, এমন কি সুষুপ্তি অবস্থাতেও নহে। যে হেতু, জ্ঞানেতে জ্ঞান ভিন্ন বিষয় এবং বিষয়ী নাই, সেই হেতু বিষয়, বিষয়ী বোধ থাকিলেও জ্ঞানের স্বরূপের বাধ হয় না। জ্ঞান এইরূপে স্বরূপ স্ফূর্ত্তি এবং স্বরূপের অনুভূতি করিয়া থাকে।

শঙ্করের জ্ঞান প্রকাশমাত্র। ইহাকে প্রকাশক বলিলেও ঠিক হইবে না। কারণ, প্রকাশক প্রকাশধর্ম্মকে জ্ঞাপিত করে। প্রকাশ কখনও প্রকাশের বিষয় হয় না। যাহা প্রকাশের বিষয় তাহা প্রকাশ নয়। চিৎসুখাচার্য্য বলিয়াছেন জ্ঞান বিষয়মাত্রকেই প্রকাশ করিলেও নিজে কখনও বিষয় হয় না। জ্ঞাতা, জ্ঞেয় কল্পনা জ্ঞানে কোনকালেই নাই। জ্ঞান জ্ঞানই। জ্ঞানের জ্ঞাতৃত্ব ঔপাধিক।

রামানুজ এই কথা স্বীকার করেন না। অনুভূতি অনুভূত হইতে পারে। অনুভূত হইলে অনুভূতির অনুভূতিত্ব নষ্ট হয় না। এই বিষয়ে বৈষ্ণবাচার্য্যগণের

ভিতর কোন মতভেদ নাই। বলদেব বিদ্যাভূষণ জ্ঞানের এইরূপ স্বপ্রকাশত্ব এবং বিষয়,-বিষয়ী সম্বন্ধত্ব মানিয়া থাকেন। মধ্বাচার্য্যও এ বিষয়ে একমত। জ্ঞাতৃত্ব তাঁহার মতে জ্ঞাতারই গুণ।

জীব গোস্বামী এই বিষয়ে রামানুজ এবং অন্যান্য বৈষ্ণবাচার্য্যগণ হইতে বিভিন্ন মত স্থাপন করিয়াছেন। তিনি নির্ব্বিকল্প এবং সবিকল্প প্রজ্ঞা দুইই স্বীকার করিয়াছেন। তিনি, নৈয়ায়িকদের ন্যায়, কোন পদার্থের প্রাথমিক বোধকে সামান্য বা বিশিষ্ট অনবগাহী বলিয়া স্বীকার করেন। আমাদের প্রাথমিক বোধ সর্ব্বসম্বন্ধশূন্য। কোন বৈশিষ্ট্য বা সম্বন্ধবোধ সেখানে স্ফুরিত হয় না। এইরূপ বোধকে নির্ব্বিকল্প বোধ বলা হয়। জাতির ব্যক্তি হইতে ভিন্নভাবে যে বোধ হয় তাহাও এই নির্ব্বিকল্পক বোধ। জ্ঞান সামান্যরূপে জ্ঞানবৈশিষ্ট্য বোধ হওয়ার পূর্ব্বে একটী বোধের অস্তিত্ব তিনি স্বীকার করিয়া থাকেন। সম্বন্ধবোধ দ্বিতীয় ক্ষণে উৎপত্তি হয় কিন্তু প্রথম ক্ষণে জ্ঞানের সামান্য বোধ হইয়া থাকে। কিন্তু এই সামান্য বোধ শঙ্করের জ্ঞানস্বরূপের বোধ নহে। কারণ, এই সামান্য বোধের ভিতর জ্ঞান-ব্যক্তিরও বোধ অনুস্যূত হইয়া থাকে যদ্যপি তাহার অনুভূতি তৎকালে হয় না। জীব গোস্বামী জ্ঞানের এইরূপ বিশিষ্ট অনবগাহী এবং অবগাহী বোধকে মানিয়া লইয়াছেন। শঙ্কর জ্ঞানের কোন বৈশিষ্ট্যই স্বীকার করেন না। রামানুজ জ্ঞানের নির্ব্বিকল্পকত্ব স্বীকার করেন না। কিন্তু জীব গোস্বামী জ্ঞানস্বরূপে সামান্য এবং বৈশিষ্ট্য বোধ দুইই রক্ষা করিয়াছেন এইভাবে তিনি ব্রহ্মানুভূতিরও একটী স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু বিচার্য্য এখানে এই যদিও প্রাথমিক জ্ঞান সর্ব্বসম্বন্ধশূন্য এবং জ্ঞানমাত্রস্ফুরণ, তথাপি কিন্তু জ্ঞানস্বরূপে বিশিষ্টতা অন্তর্নিহিত আছে, যদিও প্রাথমিক ক্ষণে সেই বৈশিষ্ট্যের আবির্ভাব নাই। সবিকল্পক বোধের পূর্ব্বভূমি হইতেছে নির্ব্বিকল্পক বোধ; কিন্তু জ্ঞানের পূর্ণ স্বরূপ সবিকল্পক ভূমিতেই প্রকাশিত হয়। এ বিষয়ে তিনি রামানুজের সহিত একমত অর্থাৎ তাঁহার মতে সম্বন্ধ অবগাহী যে জ্ঞান, সেই জ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান

বেদান্তমতে জ্ঞানই ব্রহ্ম। অতএব বিচারের ফলে আমরা পাইতেছি শঙ্করের ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষ জ্ঞান; রামানুজ, মাধব, নিম্বার্ক এবং জীব গোস্বামীর ব্রহ্ম-সবিশেষ জ্ঞান। এইরূপ সবিশেষ জ্ঞানকে বৈষ্ণবেরা 'ভগবৎ' সংজ্ঞা দিয়া থাকেন। এই সবিশেষ জ্ঞানকে আমরা চিদ্বিলাস বলিতে পারি। অনুভূতির শ্রেষ্ঠতম অবস্থা চিদের এই আত্ম-বিলাস জ্ঞানী অনুভব করিয়া থাকেন। জীব গোস্বামী এইরূপ অনুভূতি ভিন্ন ব্রহ্মানুভূতিকেও স্বীকার করিয়াছেন

ব্রহ্মানুভূতি চিদ্বিলাসানুভূতির অব্যবহিত পূর্ব্ব অবস্থা। যদিও বৈষ্ণবাচার্য্যেরা ব্রহ্মস্বরূপে সবিশেষ ভাব স্থাপন করেন কিন্তু তাঁহারা কখনও নৈয়ায়িকের মত গুণ, গুণীতে সমবায় রূপ নিত্য সম্বন্ধ মানেন না। রামানুজ এইরূপ সম্বন্ধকে অপৃথক্ সিদ্ধি সম্বন্ধ বলিয়াছেন। জীব গোস্বামী ইহাকে স্বরূপ সম্বন্ধ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। বস্তুতঃ, সম্বন্ধ কল্পনা এইরূপ স্থলে না করিলেই ভাল হয়। কারণ সম্বন্ধ দ্বিষ্ঠ। গুণ গুণীরই প্রকাশ। অতএব গুণের সহিত গুণ চিরকালই অভিন্ন। গুণ গুণেরই স্বরূপের দ্যোতক। সে যাহা হউক আমাদের একথা সর্ব্বদাই মনে রাখিতে হইবে যে বৈষ্ণবাচার্য্যেরা একটীমাত্র সত্তাকে মানিয়াছেন যদিও সে সত্তার ভিতর নিরন্তর আত্মপ্রকাশের প্রতিষ্ঠা আছে। আনন্দের বিচারেও বৈষ্ণবাচার্য্যেরা ব্রহ্মকেই আনন্দী বলিয়াছেন। অনবচ্ছিন্ন আনন্দের আধারই ব্রহ্ম। আনন্দের লীলাই তাঁহার স্বরূপ। রাস-রসোৎসব আনন্দেরই বিলাস।

'একাকী ন রমতে।' এইজন্যই আনন্দের ভিতর বিলাসের তরঙ্গ ফুটে উঠে। স্বরূপতঃ অভিন্ন হইরাও আত্ম প্রকাশের ভিতর দিয়াও অসীম আনন্দের উচ্ছ্বাসের নিবৃত্তি ব্রহ্মস্বরূপে কখনই হয় না। আনন্দের এইরূপ স্বরূপ স্ফূর্ত্তি নিত্যবিভূতি নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

নিত্যবিভূতিরূপ স্বরূপলীলা প্রকাশ ভিন্ন লীলাবিভূতিরূপ প্রাকৃত লীলা বৈষ্ণবেরা মানিয়া থাকেন। বিশ্ব প্রকৃতির ভিতরই এই লীলা সম্পাদিত হয়। কিন্তু যেহেতু এই লীলাও প্রকৃতির অভিব্যক্তি—ঈশ্বরের বীক্ষণ ভিন্ন সম্পাদিত হয় না, অতএব ইহাকে ঈশ্বরের লীলা বলা যাইতে পারে। কিন্তু পার্থক্য এই স্বরূপবিভূতিতে অন্য কোন পদার্থের স্থান নাই; কিন্তু লীলাবিভূতিতে ঈশ্বরের প্রেরণা প্রকৃতিকে দ্বার করিয়া আত্মস্ফূর্ত্তি করে। বৈষ্ণবাচার্য্যের সহিত সাংখ্যের এইখানেই মতভেদ। সাংখ্যে প্রকৃতির অভিব্যক্তি পুরুষের সংসর্গে আপনা আপনি হয়। প্রকৃতি পুরুষের অধীন নহে। কিন্তু বৈষ্ণবাচার্য্যগণের মতে প্রকৃতি যদিও একটী তত্ত্ব, তথাপি প্রকৃতির স্বাতন্ত্র্য নাই। ইহা সম্পূর্ণ ঈশ্বরাধীন। এই বিষয়ে বৈষ্ণবাচার্য্যদিগের ভিতর কিছু মতভেদ আছে।

প্রকৃতি জগতের উপাদান কারণ, ঈশ্বর নিমিত্ত কারণ। রামানুজ, জীবগোস্বামী এবং নিম্বার্ক জগতের নিমিত্ত এবং উপাদান কারণের অভিন্নতা মানিয়াছেন। কিন্তু এ বিষয়ে আচার্য্য মধ্বের মত অন্যরূপ। তিনি ঈশ্বরকে নিমিত্তকারণ এবং প্রকৃতিকে উপাদান কারণরূপে মানিয়াছেন, যদিও সেই প্রকৃতি সম্পূর্ণ ঈশ্বরাধীন।

এই জন্য মধ্বকে দ্বৈতবাদী বলা হয়। এবিষয়ে আমরা অন্য প্রসঙ্গে আরও কথা বলিব।

আচার্য্য বল্লভের মত অন্যান্য বৈষ্ণবাচার্য্যগণ হইতে কথঞ্চিৎ ভিন্ন। তিনি ঈশ্বর-সত্তাকেই নিমিত্ত ও উপাদান কারণ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। জ্ঞানের দৃষ্টিতে ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কোন পদার্থই নাই। ব্রহ্মেরই পরিণতি জগৎ। বস্তুতঃ ব্রহ্মের এই প্রকাশই বিশ্ব। যতদিন অবিদ্যাজনিত ভোগদৃষ্টি থাকে, ততদিন আমরা মায়াধীশ ব্রহ্মকে জগতের নিমিত্ত এবং উপাদান কারণ বলিয়া থাকি।

শঙ্করের সহিত বল্লভের মতের এখানে কথঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে। সৃষ্টিবোধ শঙ্কর এবং বল্লভের মতে অবিদ্যাজনিত। অবিদ্যা নষ্ট হইলে শঙ্করের মতে নির্ব্বিশেষ বোধমাত্র থাকে। আচার্য্য বল্লভের মতে শুদ্ধাদ্বৈত বোধ থাকে, যে শুদ্ধাদ্বৈতে আত্মস্ফুরণ সর্ব্বদাই আছে। ঈশ্বরের আত্মস্ফুরণরূপে সকল পদার্থই ঈশ্বরের স্বরূপ হইতে অভিন্ন। কার্য্যকারণের পরিণতি হইলেও, ইহা অবিকৃত পরিণতি। কার্য্যকারণ-বিচারে আচার্য্য বল্লভ অবিকৃত পরিণামবাদ রামানুজের পরিণামবাদ স্থলে গ্রহণ করিয়াছেন। অবিকৃত পরিণামও যাহা, প্রকাশও তাহা। জ্ঞানভূমিতে ঈশ্বরের আত্মপ্রকাশই জগৎ, এই বোধই প্রতিষ্ঠিত হয়।

বল্লভের মতে জ্ঞানের তিনটী ভূমি আছে—(১) সাধারণ ভূমি (২) বিচার ভূমি (৩) অনুভূতি ভূমি।

সাধারণ ভূমিতে বস্তু পৃথক্ পৃথক্ রূপে প্রতিপন্ন হয়। বিচারের ভূমিতে ঈশ্বর, দ্রব্য, কর্ম্ম, কাল স্বভাব এবং জীব এই কয়েকটী পদার্থ নিত্যরূপে আমরা পাইয়া থাকি। কিন্তু অনুভূতির ভূমিতে অবিদ্যা অপগত হইলে, ঈশ্বর এবং ঈশ্বরে প্রকাশই একমাত্র পদার্থ বলিয়া উপপন্ন হয়। বস্তুতঃ, ঈশ্বর ভিন্ন অন্য কোন পদার্থের ঈশ্বরাতিরিক্ত বাস্তব সত্তা নাই। এই জন্য আচার্য্য বল্লভের মতকে শুদ্ধাদ্বৈতবাদ বলা হয়।

পদার্থবিচারে রামানুজ এবং বৈষ্ণবাচার্য্যেরা প্রধানতঃ তিন পদার্থবাদী—(১) চিৎ, (২) অচিৎ, এবং (৩) ঈশ্বর। কিন্তু প্রধানতঃ পদার্থ তিনটী হইলেও তাঁহারা ইহার অবান্তর ভেদরূপে আরও পদার্থ মানিয়া থাকেন। রামানুজ ছয়টী পদার্থ মানিয়াছেন—(১) প্রকৃতি, (২) কাল, (৩) শুদ্ধসত্ত্ব (৪) জ্ঞান (৫) জীব, এবং (৬) ঈশ্বর। জ্ঞান ঈশ্বর ও জীবের ধর্ম্ম। ঈশ্বরের বিভু জ্ঞান, জীবের অণুজ্ঞান। প্রকৃতি জগতের উপাদান কারণ। শুদ্ধসত্ত্ব

নিত্যবিভূতির লীলা উপকরণের উপাদান কারণ। কাল কাহারও কাহারও মতে স্বরূপ বিভূতিতেও আছে, লীলা বিভূতিতেও আছে। আচার্য্য নিম্বার্ক রামানুজের ন্যায়ই ষট্‌পদার্থ স্বীকার করিয়াছেন। মধ্বাচার্য্য নৈয়ায়িকদিগের ন্যায় দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ, বিশিষ্ট, অংশী, অংশ, সাদৃশ্য, সংখ্যা, সংযোগ এবং অভাব এতগুলি পদার্থবাদী।

জীব গোস্বামী এবং বলদেব বিদ্যাভূষণ ঈশ্বর, জীব, মায়া, স্বরূপশক্তি, এবং কালকে নিত্য মানিয়াছেন। জ্ঞান এবং শুদ্ধসত্ত্ব স্বরূপশক্তির অন্তর্গত। মধ্ব ভিন্ন অন্য কোন বৈষ্ণবাচার্য্য অভাব বলিয়া কোন পদার্থ স্বীকার করেন নাই। অভাব তাঁহারা অদ্বৈত বৈদান্তিক এবং প্রাচীন নৈয়ায়িকদিগের ন্যায় অধিকরণ স্বরূপ বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন।

পদার্থ বিচারানন্তর সম্বন্ধ বিচার বৈষ্ণবদর্শনে একটী অবশ্য-জ্ঞাতব্য বিষয়। এই বিচারই তত্ত্বের স্বরূপ লইয়া বিচার। সাধারণতঃ বৈষ্ণবশাস্ত্র একাধিক পদার্থ মানিলেও, বস্তুতঃ তাঁহারা "একমেবাদ্বিতীয়ং" তত্ত্বই প্রতিপন্ন করিয়াছেন কিন্তু এবিষয়ে বৈষ্ণবাচার্য্যগণের ভিতর পরস্পর কিছু মতদ্বৈধতা আছে। রামানুজ-মতে চিদচিৎবিশিষ্ট ঈশ্বরই তত্ত্ব। ইহা একই তত্ত্ব। চিৎ জীব, অচিৎ প্রকৃতি। রামানুজের তত্ত্ব বিশিষ্টাদ্বৈত। ঈশ্বর, জীব এবং প্রকৃতির সহিত ভেদ নাই, এমন কি ভেদাভেদ নাই। কিন্তু তত্ত্বটী বিশেষণবিশিষ্ট। বেদান্তদ্বেষিকাচার্য্য তাঁহার "ন্যায়সিদ্ধাঞ্জন" গ্রন্থে ভেদাভেদবাদের খণ্ডন করিয়াছেন। অভেদ কখনও ভেদ হয় না। কারণ, ভেদ এবং অভেদ পরস্পর বিরোধাত্মক। কিন্তু তত্ত্ব অভিন্ন হইলেও সেই অভিন্ন তত্ত্ব বিশেষণ-বিশিষ্ট হইতে পারে। নিম্বার্ক স্বাতন্ত্র্য এবং অস্বাতন্ত্র্য তত্ত্বরূপে দুই তত্ত্ব মানিয়াছেন। ঈশ্বর স্বাতন্ত্র্য তত্ত্ব। জীব এবং প্রকৃতি অস্বাতন্ত্র্য তত্ত্ব। কিন্তু অস্বাতন্ত্র্য তত্ত্বের সত্তা, স্বাতন্ত্র্য তত্ত্বের উপরই নির্ভর করে। যদিও তত্ত্ব অভিন্ন তথাপি বিশেষরূপে প্রকৃতি এবং জীব ঈশ্বর হইতে স্বতন্ত্র। পুরুষোত্তমের সত্তা জীব এবং প্রকৃতি সত্তা হইতে অতিরিক্ত সত্তা। প্রকৃতি ও জীবের সত্তা হইতে পৃথক্ হইয়াও ইহার নিজের একটী অপ্রাকৃত সত্তা আছে। নিম্বার্কের মত সাধারণতঃ ভেদাভেদবাদরূপে গৃহীত হয়।

জীবগোস্বামী তত্ত্বকে এক তত্ত্বই বলিয়াছেন। ভগবানই পরম তত্ত্ব। ভগবানের তিনটী শক্তি আছে—(১) স্বরূপশক্তি, (২) জীবশক্তি, এবং (৩) বহিরঙ্গা শক্তি। তত্ত্বস্থানে শক্তি-কল্পনা জীব গোস্বামীর দার্শনিকতায় অন্যান্য বৈষ্ণবাচার্য্যগণ

হইতে আরও সূক্ষ্ম। জীব প্রকৃতিকে তত্ত্ব বলিয়া আখ্যা দিলে অদ্বৈতহানি প্রসঙ্গ হয়। কিন্তু তাহাদিগকে শক্তি বলিলে অদ্বৈতভাবের সম্যক্ স্ফূর্ত্তি হয়। শক্তি শক্তিমানের আশ্রিত। শক্তিমান হইতে শক্তির পূর্ণ ভেদ কল্পনা হয় না। অতএব শক্তিবিশিষ্ট ব্রহ্মই পরমতত্ত্ব। জীবগোস্বামী এজন্য তত্ত্বকে অচিন্ত্য ভেদাভেদ বলিয়া নিরূপণ করিয়াছেন। তাঁহার 'সর্ব্বসংবাদিনী' গ্রন্থে তিনি লিখিয়াছেন—"ভেদত্বেন চিন্তয়িতুং অশক্যত্বাৎ অভেদং, অভেদত্বেন চিন্তয়িতুং অশক্যত্বাৎ ভেদ ইতি অচিন্ত্যভেদাভেদবাদঃ।" মায়া বা বহিরঙ্গা শক্তির সহিত ঈশ্বরের সাক্ষাৎ কোন সম্বন্ধ নাই। স্বরূপশক্তি ঈশ্বরের অন্তরঙ্গ বিলাস বৈভবের কারণ। তটস্থা শক্তি, জীবশক্তি, এবং বহিরঙ্গ শক্তি বহিরঙ্গা বিভবাদির কারণ। ঈশ্বর ব্রহ্মরূপে সম্পূর্ণ অদ্বৈত তত্ত্ব। পরমার্থরূপে তিনি বিশ্বের কারণ, মায়ার নিয়ামক, সর্ব্বজীবের আশ্রয়, ও অন্তর্যামী। ব্রহ্ম বা পরমাত্মা ভগবানের পূর্ণ প্রকাশ নহে। পূর্ণ তত্ত্বই ভগবান।

বলদেব বিদ্যাভূষণ জীবগোস্বামীর সহিত একমত। শুধু অভিন্ন তত্ত্বের ভেদপ্রতীতি নিয়ামকরূপে একটী তত্ত্ব স্বীকার করিয়াছেন এবং এইটী মধ্বসম্প্রদায় হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। মধ্বাচর্য্য সাধারণতঃ দ্বৈতবাদী বলিয়া পরিচিত। কিন্তু মধ্ব ও তাঁহার পরবর্ত্তী আচার্য্যেরা নিজেদের তত্ত্বকে একই তত্ত্ব বলিয়াছেন। ভেদ বস্তুতঃ নাই কিন্তু ভেদজ্ঞাপক বিশেষ পদার্থ ভেদপ্রতীতি করাইয়া দেয়। ন্যায়ামৃতকার একস্থানে বলিয়াছেন "নির্ব্বিশেষ অদ্বৈতবাদ এবং দ্বৈতবাদ ত্যাগ করিবার জন্য বিশেষ পদার্থের আবশ্যকতা আছে। বিশেষ না থাকিলে পরমতত্ত্ব পূর্ণ অদ্বৈতরূপে প্রতিভাত হইত। বাস্তবিক বিশেষই ভেদকে প্রদর্শন করে, বস্তুতঃ যেখানে ভেদ নাই। এই বিশেষ অচিন্ত্য বস্তু। অদ্বৈতবাদীরা যেমন জগৎ না থাকিলেও জগতের প্রতীতি অবিদ্যাজনিত এই কথা বলিয়া থাকেন; তেমনই ন্যায়ামৃতকার বলেন, তত্ত্ব অভেদ হইলেও বিশেষই ভেদ প্রতীতি করাইয়া দেয়। এই ভেদ পরস্পর সকল পদার্থকেই আশ্রয় করিয়া থাকে। মধ্ব সম্প্রদায়ের এই সিদ্ধান্ত বিচারসহ নহে। বিশেষ ভেদপ্রতিনিধি ও ভেদজ্ঞাপক, কিন্তু বস্তুতঃ তত্ত্বে যদি ভেদ নাই থাকে, ভেদ যদি সত্য না হয় তাহা হইলে বিশেষ কল্পনা কি করিয়া করা যাইতে পারে? প্রতিনিধি বস্তু-সাপেক্ষ। বস্তুই যখন নাই, তখন প্রতিনিধি কি করিয়া থাকে। বস্তুতঃ আচার্য্য মধ্বের মত দ্বৈতবাদ। তিনি অনেক ভেদ মানিয়াছেন—নিমিত্ত ও উপাদানের কারণ ভেদ, ঈশ্বর ও জীবের ভেদ, ঈশ্বর ও প্রকৃতির ভেদ, জীব ও প্রকৃতির ভেদ

ইত্যাদি তাঁহার বিচারে সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।

আচার্য্য বল্লভ ভেদবস্তু কিছুই মানেন নাই। জ্ঞান স্বরূপে তাঁহার পদার্থ একটী—ঈশ্বর ও তাঁহার প্রকাশ। অন্যান্য পদার্থ মানিলেও তিনি সেগুলি ঈশ্বরের স্বরূপভূত বলিয়া মানিয়াছেন। অনুভূতির অবস্থায় সকল পদার্থই ঈশ্বরে প্রকাশ রূপেই ফুটিয়া উঠে। এই জন্য তাঁহার মতকে শুদ্ধাদ্বৈতবাদ বলা হইয়া থাকে। বিচারের ফলে আমরা পাইতেছি রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, মধ্বের দ্বৈতবাদ, বল্লভের শুদ্ধাদ্বৈতবাদ, নিম্বার্কের ভেদাভেদবাদ, জীব গোস্বামী ও বলদেব বিদ্যাভূষণের অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদ।

ইহাই হইল বৈষ্ণব-দর্শনের মূলকথা। নিত্য বিভূতি সকলে গ্রহণ করিলেও, এই নিত্য প্রকাশের তারতম্য আছে এবং ইহা ঈশ্বরের স্বরূপ চিন্তার উপর নির্ভর করে। সমস্ত তত্ত্ব গুলি ঈশ্বর হইতে অভিন্ন হইলেও, ঈশ্বরের ব্যক্তিত্ব আছে। এই ঈশ্বর শক্তির সহিত অভিন্ন হইয়াও শক্তির আশ্রয়। ব্যক্তি হইলেও, যেহেতু ইনি সর্ব্বশক্তির আশ্রয়, ইহার অনন্তত্ব কখনও নষ্ট হয় না। সমস্ত জগৎই ইহাতে বিধৃত, সকলই ইহার শক্তির দ্বারা নিয়মিত। ঈশ্বরের অচিন্ত্য ও অপ্রতিলত শক্তিকে ইহা অতিক্রম করিতে পারে না। কি জড় জগৎ, কি চিন্ময় জগৎ, সকলই পূর্ণরূপে ইহার শক্তির দ্বারা নিয়মিত। এমন কি মুক্তিও সম্পূর্ণ ইহার কৃপার উপর নির্ভর করে।

জীবের প্রকৃত স্বরূপ হইতেছে চিদণু এবং ঈশ্বর-কিঙ্কর। কিন্তু ভগবৎ বিমুখতা এবং অবিদ্যা—ইহার স্বরূপ আবরণ করিয়াছে। এবং ইহার ফলে জীবের ভিতর একটা মিথ্যা স্বাতন্ত্র্য-ব্যক্তিত্বাভিমান প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহাই হইল জীবের স্বরূপচ্যুতি। এই স্বরূপচ্যুতি অনাদি। স্বরূপ জ্ঞান ফুটিয়া উঠিলে, এই মিথ্যা স্বাতন্ত্র্যবোধ নষ্ট হইয়া জীব নিত্যকৈঙ্কর্য্য এবং ঈশ্বরপারতন্ত্র্যবোধসম্পন্ন হয়। তখন তাহার সত্তা ও বৃত্তি সম্পূর্ণ ঈশ্বরাভিমুখী হইয়া থাকে। এখানে একটা কথা উঠিতে পারে জীবের স্বরূপাবস্থার কোন সাকার ভাব থাকে কি না এবং ঈশ্বরের স্বরূপবিভূতিতে কোন সাকার ভাব আছে কি না। তত্ত্ববিচার স্থলে এই পদার্থটীর সম্যক্ নির্ণয় অবশ্য প্রয়োজনীয়। কারণ এইটীকে অবলম্বন করিয়া বৈষ্ণবের সাধনপ্রণালী প্রতিষ্ঠিত। এই কথা সত্য, বৈষ্ণবাচার্য্যেরা জীবের বা ঈশ্বরের কোন প্রাকৃত স্থূলরূপ মানেন না, যদিও তাঁহারা আনন্দের বিগ্রহমূর্ত্তি মানিয়া থাকেন। ঈশ্বরের বিগ্রহ সম্পূর্ণ বৈষ্ণবাচার্য্যগণের নিজস্ব পদার্থ। এইরূপ বিগ্রহস্ফূর্ত্তি অপ্রাকৃত স্বরূপ স্ফূর্ত্তির প্রকার বিশেষ। বিম্বদনুভূতি ইহার

প্রমাণ। একটা কথা উঠিতে পারে অপরিচ্ছিন্নত্বই যখন নিত্যত্ব, তখন পরিচ্ছিন্ন বিগ্রহ কিরূপে নিত্য হইবে। ইহার উত্তর আচার্য্য জীবগোস্বামী তাঁহার সর্ব্বসংবাদিনী গ্রন্থে দিয়াছেন—"পরিচ্ছিন্নত্ব এবং অপরিচ্ছিন্নত্ব পরস্পর বিরুদ্ধাত্মক নহে।" ঈশ্বর সত্তার ভিতর পরিচ্ছিন্ন, অপরিচ্ছিন্ন, সসীম এবং অসীম দুই ভাবই আছে। পরিচ্ছিন্ন অপরিচ্ছিন্ন হইতে ভিন্ন হইতে পারে না। কারণ, তাহার তাহাতে অপরিচ্ছিন্নতাই নষ্ট হইবে। পূর্ণ সত্তা অপরিচ্ছিন্ন হইয়াও পরিচ্ছিন্ন হইতে পারে এবং শক্তিবাদে সশক্তিব্রহ্ম পরিচ্ছিন্ন হইয়াও অপরিচ্ছিন্ন এবং অপরিচ্ছিন্ন হইয়াও পরিচ্ছিন্ন। পূর্ণত্বের এই লক্ষণ। পরিপূর্ণতত্ত্ব সবিশেষ-তত্ত্ব। সবিশেষ বলিয়াই তাহার রূপবিশেষ, লীলাবিশেষ এবং মাধুরীবিশেষ আছে। অনন্ত তাঁহার রূপ, অপরিমেয় তাঁহার লীলা, অশেষ তাঁহার মাধুরী। অনুভূতি এই জন্যই জ্ঞানানুভূতির ন্যায় একরূপ নহে, ইহার নিত্যই নূতন স্ফূর্ত্তি। সাধারণভাবে সকল আচার্য্যেরা এই তত্ত্বগুলি স্বীকার করিলেও রসানুভূতির বিচার গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রাদায়ের আচার্য্যেরা যেরূপ করিয়াছেন, সেইরূপ আর কেহ করেন নাই।

আচার্য্য রামানুজ ঈশ্বর স্বরূপের চিদংশ-প্রধানা অনুভূতি ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। নিম্বার্ক ঈশ্বর সহিত নিত্য যোগানন্দানুভূতিকে উচ্চস্থান দিয়াছেন। কিন্তু আচার্য্য বল্লভ এবং গৌড়ীয় সম্প্রদায় প্রেম, সেবা এবং মাধুর্য্য লীলার অনুভূতিকে শ্রেষ্ঠ স্থান দিয়াছেন। তাঁহাদের মতে চিদনুভূতি ঐশ্বর্য্যাংশ প্রধান, কিন্তু আনন্দানুভূতি মাধুর্য্যাংশ-প্রধান। ঐশ্বর্য্যের বিস্মৃতি না হইলে মাধুর্য্যের পূর্ণ বিকাশ হইতে পারে না। মাধুর্য্যের বৃত্তি অপরিচ্ছিন্ন ঈশ্বরানুভূতিকে অবলম্বন করিয়া ফুটিতে পারে না। মাধুর্য্য হৃদয়ের অন্তস্তম প্রদেশে সুন্দর ও মধুরকে বরণ করিয়া লয়। এই সুন্দরের এমন একটী আকর্ষণী শক্তি আছে যাহা সকলকেই তাহাতে আকৃষ্ট করে। সুন্দরের এমন রূপ যে নয়ন তাহাকে একবার দেখিলে আর কোনদিকে তাকাইতে পারে না। এমন তাঁহার বেণু যাহার স্বর শুনিলে, কর্ণ আর কিছু শুনিতে চায় না। এমন তাঁহার বিগ্রহের ঠাম যাহা একবার দেখিলে অপরিচ্ছিন্ন ঈশ্বরে মন আর আকৃষ্ট হয় না। এমন তাঁহার লীলা—নৃত্যগীতের স্পন্দন—যাহা ত্যাগপূর্ব্বক ব্রহ্মানন্দে মগ্ন হইতে ইচ্ছা হয় না। গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের মতে এই সান্দ্রানন্দ বিশেষ আত্মাই পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ।

এখানে একটা কথা পরিষ্কার করা আবশ্যক যে অনুভূতির অবস্থায় সাধক

শ্রীভগবানকে তাঁহার সম্পূর্ণ সত্তার ভিতর দিয়া অনুভব করেন। চিন্ময় ইন্দ্রিয়ের যত দ্বার আছে, সমস্ত দ্বার দিয়া আনন্দের সত্তাকে গ্রহণ করে, এই আনন্দরসে পরিপ্লুত হইয়া কৃতকৃত্য হয়।

অনুভূতির স্তরে শক্তি শক্তিমানের লীলার বিরাম নাই; এবং প্রেম এই লীলাকে মধুরতর করিবার জন্য নিত্যমিলনের আনন্দের ভিতর বিরহের স্ফূর্ত্তি করিয়া স্বরূপানুভূতিতে একটা স্তর প্রকাশিত করে। সাধারণতঃ মিলনভূমি প্রেমবিকাশেরই পরাকাষ্ঠা ভূমি বলিয়া অভিহিত। কিন্তু, গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় মিলনের অতীত হইয়া বিরহ এবং বিরহের পর মিলন এইরূপ একটা ভূমি মানিয়া থাকেন। বিরহ মিলন হইতে উচ্চতর ভূমি। কারণ, বিরহে মিলনের সুখস্মৃতি এবং বিরহের ব্যথা একত্র হইয়া একটী নূতন রস এবং নবীন আনন্দের স্ফূর্ত্তি হয়। এবং ব্যথার অনুলেপনরূপে আবার যখন মিলনের স্ফুরণ জাগিয়া উঠে তখনই আনন্দের পরাকাষ্ঠা হয়। এই বিরহ ভূমিতে কতকগুলি অবস্থার অনুভূতি হয় যাহা মিলনে নাই, তন্মধ্যে একটী হইতেছে প্রেমবিবর্ত্তবিলাস। শ্রীভগবান্ কাছে নাই, স্বরূপগত অবিদ্যায় অন্তর্হিত। (শ্রীজীব গোস্বামী বিরহের এরূপ স্ফূর্ত্তির জন্য স্বরূপভূত অবিদ্যা স্বীকার করিয়াছেন। ইহাকে স্বরূপশক্তির বৈচিত্র্য বলিয়া স্বীকার করিলে দার্শনিক বিচারে কোন দোষ হয় না।) তখন বিরহবিধুরা, শক্তি মিলনের স্মৃতিকে আঁকড়াইয়া থাকে এবং সেই স্মৃতির সুখধারা পান করিতে করিতে প্রিয়তমের সঙ্গপিপাসার জন্য উদ্বুদ্ধ ও কাতর হন্। প্রেম এইরূপ অবস্থায় নিজের স্বরূপের বিবর্ত্ত করিয়া তাঁহার ভিতর 'আমি কৃষ্ণ' এইরূপ অনুভূতি ফুটাইয়া তুলে। এই অনুভূতি বস্তুতঃ প্রেমের স্বরূপ—অনুভূতি নহে। স্বরূপানুভূতি না হইলেও ইহা প্রেমানুভূতির একটী উচ্চ অবস্থা। ইহা প্রেমানুভূতির অন্তর্গত এবং অবস্থাবিশেষ। এইজন্য ইহাকে বিবর্ত্ত বলা হইয়াছে।

প্রেমানুভূতিতে প্রেম আত্মবিরোধকে প্রকাশ করিয়া থাকে। অর্থাৎ বিচিত্র বিরোধাত্মক ভাবকে প্রকাশ করিয়া থাকে। কখনও ইহা সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বর শরণাপন্ন হইয়া পূর্ণ আত্মনিবেদনের ভাব প্রকাশ করে, কখনও বা পূর্ণরূপে কেন্দ্রীভূত হইয়া কর্তৃত্ব ভাবের পূর্ণ বিকাশ করে। পূর্ব্ব ভাবটীতে পূর্ণ কৈঙ্কর্য্য, অপরটীতে পূর্ণ প্রভুত্ব ভাব ফুটিয়া উঠে। একটীকে মদীয়া রতি এবং অন্যটীকে তদীয়া রতি বলা হয়। ভাববিচারে তদীয়া হইতে মদীয়ার স্থান অতি উচ্চে। তদীয়া ভাবে শক্তি শক্তিমানের পূর্ণ আকৃষ্ট এবং নিবেদিত। তাহার ফলে

শক্তিমানের সত্তার ভিতর শক্তি নিজেকেই বিলাইয়া দিতে প্রস্তুত। তদভিমুখী হইয়া তদনুমত সেবাতেই শক্তি নিযুক্তা; কিন্তু ইহার ফলে আনন্দের বৈচিত্র্য অনুভূতি বেশ তীব্রভাবে উপলব্ধি হয় না। কিন্তু মদীয়া রতিতে শক্তি নিজ মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হইয়া শক্তিমানকে নিজেই আকর্ষণ করে। এবং তাহার ফলে আনন্দের নানাবৃত্তি স্ফুরণ হয়। এখানে শক্তি শক্তিমানের আকর্ষণ বিকর্ষণে নানাবিধ রসের উদ্গম হয়। বস্তুতঃ এইরূপ স্থলে শক্তিমান্ হইতে শক্তিরই প্রাধান্য বেশী। কিন্তু একথা ভুলিলে চলিবে না যে শক্তিরও লক্ষ্য এখানে শক্তিমানকে নানাবিধ আনন্দরসে সিঞ্চিত করা। শক্তি কখনই শক্তিমান্ হইতে পৃথক হইয়া কোন আনন্দ অনুভব করে না। আনন্দের উচ্চতম অনুভূতিতে শক্তি অদ্বৈতানন্দ উপভোগ করে। শক্তিমানের অঙ্গীভূত হইয়াই এক আনন্দ উপভোগ করে। মদীয়া রতিতে শক্তিমান্ তদীয়া রতি হইতে আনন্দের অধিকতর বৈচিত্র্য অনুভব করিয়া থাকেন। এখানে শক্তি এই বৈচিত্র্যকে ফুটাইয়া তুলিবার জন্য এত উদ্বুদ্ধা যে সময়ে সময়ে শক্তিমানকেও পরাজিত হইয়া শক্তির কাছে আত্মনিবেদন করিতে হয়। প্রেমরস বৈচিত্র্যে ইহা এক অভিনব সৃষ্টি। শক্তিমান্ শক্তির নিকট পরাজিত হইয়া আত্মসমর্পণ করেন। এই আত্মসমর্পণের ভাব জয়দেব গোস্বামী উজ্জ্বল ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন :—

"স্মর-গরল-খণ্ডনং　　মমশিরসি মণ্ডনং
দেহি পদপল্লবমুদারম্॥"

এখানে শক্তিমান্ নিজেই ভিখারী, নিজেই প্রেমাভিলাষী। সাধারণতঃ তিনি নিজেই সব সময় প্রেমের গৃহীতা এবং শক্তিই দাতা। কিন্তু তদীয়া রতিতে শক্তিমান্ গৃহীতা হইলেও, শক্তির পদপল্লব গ্রহণ করেন না। কিন্তু মদীয়া রতিতে শক্তিমান শক্তির পদপল্লব গ্রহণ করিয়া ধন্য হইতেছেন। বস্তুতঃ এখানে প্রেমাভিব্যক্তির পূর্ণ রূপান্তর (inversion) হইতেছে। প্রেমের অভিলাষে কি সুখ আছে শক্তিমানকে ইহাই অনুভব করাইবার জন্য শক্তি এইরূপ রূপান্তর পরিগ্রহ করিয়া থাকেন। মদীয়া রতিতে এইরূপে শক্তি শক্তিমান্‌কে নানাবিধ রস অনুভূত করাইয়া থাকেন। এখানেও কিন্তু শক্তির নিজ সুখের প্রতি দৃষ্টি নাই। শক্তিমানের সুখই তাঁহার সুখ। এই বিষয়ে তদীয়া ও মদীয়া রতিতে কোন পার্থক্য নাই।

বর্ণাশ্রমধর্ম্মতত্ত্ব প্রচার।

বঙ্গবাসী হইতে উদ্ধৃত।

[ভট্টপল্লীতে ব্রাহ্মণ মহাসম্মিলনের সপ্তম অধিবেশনে পণ্ডিতপ্রবর যুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয়ের আভাষণ।]

ওঁ নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ।

মাননীয় সভাপতি মহাশয় ও সভ্যবৃন্দ,

বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের তত্ত্ব প্রচার বড়ই কঠিন; এ তত্ত্ব প্রচারে যে শক্তির প্রয়োজন, তাহা আমার নাই,—তথাপি যে সে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছি, তাহা দুঃসাহস হইলেও, সাধুগণের মার্জ্জনীয়, ক্ষমাসারা হি সাধবঃ।

যখন দেশে বৌদ্ধধর্ম্ম আসে নাই, জৈন ধর্ম্মের উদয় হয় নাই, তখন ধর্ম্মতত্ত্ব প্রচার বলিলেই যথেষ্ট হইত; আজ কিন্তু সেই ধর্ম্মকেই বিশেষণ-বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া বলিতে হইতেছে 'বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম'। যাহা ধর্ম্ম—লোকরক্ষা যাহার কর্ম্ম—সেই ধর্ম্ম বর্ণাশ্রমেই বিদ্যমান, অন্যত্র যে 'ধর্ম্ম' শব্দ ব্যবহার, তাহাও এই বর্ণাশ্রম ধর্ম্মেরই এক এক অংশমাত্র। ভগবান্ মনু সংক্ষেপে বর্ণধর্ম্ম নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—'অহিংসা সত্যমস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ। এতৎ সামানিকং ধর্ম্মং চাতুর্ব্বর্ণ্যেঽব্রবীন্মনুঃ।" ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, এই চতুর্ব্বর্ণের সাধারণ ধর্ম্ম অহিংসা, সত্য, অস্তেয় (চুরি না করা,) শৌচ এবং ইন্দ্রিয় সংযম। শৌচ দ্বিবিধ,-বাহ্য ও আন্তর; বাহ্য শৌচ মৃত্তিকা ও জলে সম্পন্ন হয়, আন্তর শৌচ ভাবশুদ্ধি, অন্তঃকরণের নির্ম্মলতা।

পৃথিবীতে এমন কোন ধর্ম্ম নাই, যাহাতে এই সাধারণ বর্ণধর্ম্মের গাঢ় সম্বন্ধ সুলভ নহে।

"ধৃতিঃ ক্ষমা দমোঽস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্ম্মলক্ষণম্।
* * * নিত্য আশ্রমিভির্দ্বিজৈঃ।
দশলক্ষণকো ধর্ম্মঃ সেবনীয়ঃ প্রযত্নতঃ॥"

ধৃতি, ক্ষমা, দম, অস্তেয়, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, বুদ্ধি, বিদ্যা, সত্য এবং অক্রোধ,—এই দশটী ধর্ম্মের লক্ষণ; ব্রহ্মচারী, গৃহী, বনস্থ, এবং সন্ন্যাসী, এই চতুরাশ্রমী দ্বিজই এই দশ লক্ষণ ধর্ম্মের সেবা প্রযত্নপূর্ব্বক করিবেন।

ধৃতি অর্থে অসন্তোষ বা অবসন্ন দেহ, বাক্য ও মনকে যে প্রযত্নবলে সন্নস্থিত ও উৎসাহযুক্ত করিয়া রাখে, সেই প্রযত্নই ধৃতি। দম,—বাহেন্দ্রিয়-সংযম। ইন্দ্রিয়নিগ্রহ—শম—অর্থাৎ অন্তঃকরণ-সংযম। বুদ্ধি—যে বুদ্ধিবলে মানব সাধারণের অজ্ঞেয় তত্ত্ব জানিতে সমর্থ হন—সেই জন্মান্তরজ্ঞান, শাস্ত্রবিশ্বাস, ঈশ্বর তত্ত্বজ্ঞান যে বুদ্ধির ফল, সেই বুদ্ধি—ধর্ম্মশ্রেণী মধ্যে স্থাপিত। বিদ্যা—অপরা ও পরা, যজ্ঞাদিবিদ্যা ও ব্রহ্মবিদ্যা। যে বিদ্যা হইতে জন্মান্তরবিশ্বাস, স্বর্গপ্রাপ্তি, তৎসাধন ও ঈশ্বরতত্ত্বজ্ঞানসাধন চিত্তশুদ্ধি লাভ হয়, তাহা অপরা বিদ্যা এবং যে বিদ্যা হইতে ব্রহ্মলাভ হয়, তাহাই পরা বিদ্যা,—বিদ্যা এই দ্বিবিধ। যাহার সীমা কেবল ইহকালেই নিবদ্ধ, তাহা প্রকৃত বিদ্যার অন্তর্গত নহে, তাহার নামান্তর কলা; শিল্পবিদ্যা প্রভৃতি এই কলা শ্রেণীর অন্তর্গত, তাহার 'বিদ্যা' নাম গৌণ। প্রতীচ্য গ্রন্থে বিদ্যার আসন নাই বলিলেই হয়, কলাই প্রায় সমগ্র স্থানটা অধিকার করিয়া বসিয়া আছে। বিদ্যার যে একটু ক্ষুদ্র অসম্পূর্ণাংশ তথায় আছে, তাহাও উপেক্ষিত ও অনাদৃত। দশলক্ষণ ধর্ম্মের অন্তর্গত আর আর সমস্ত শব্দই প্রসিদ্ধ, তাহার ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। পূর্ব্বোক্ত চতুর্ব্বর্ণধর্ম্ম এই আশ্রমধর্ম্মের অভ্যন্তরে স্থাপিত, কারণ আশ্রম ত আর বর্ণ পরিত্যাগ করিয়া থাকে না, আশ্রমধর্ম্মে সাক্ষাৎ অহিংসার উল্লেখ না থাকিলেও,—ধৃতি, ক্ষমা, অক্রোধ এবং শৌচ হইতেই অহিংসা সংস্থাপন। অসন্তোষ অসহিষ্ণুতা, ক্রোধ ও অশুচিতা হইতেই হিংসা প্রবৃত্তির উদয়; ধৃতি, ক্ষমা প্রভৃতি থাকিলে অসন্তোষ প্রভৃতি থাকে না, অতএব অহিংসা তাহাতে থাকিবেই। এই যে বর্ণধর্ম্ম ও আশ্রমধর্ম্ম, ইহা সর্ব্বসাধারণ সর্ব্ববর্ণের ও সর্ব্বাশ্রমের পালনীয়। অধিকন্তু বিশেষ বর্ণধর্ম্ম ও বিশেষ আশ্রমধর্ম্ম আছে; ব্রাহ্মণের তপস্যা, ক্ষত্রিয়ের দেশ-রক্ষা, বৈশ্যের গোরক্ষা ও শূদ্রের সেবা ইত্যাদি বিশেষ বর্ণধর্ম্ম। ব্রহ্মচারীর বেদপাঠ, গৃহস্থের অতিথিসেবা, বনস্থের কঠোর ব্রত ও যতির ব্রহ্মজ্ঞান ইত্যাদি বিশেষ আশ্রম ধর্ম্ম।

এই যে বর্ণধর্ম্ম ও আশ্রমধর্ম্ম—আত্মার সনাতনত্বে এই সমস্ত ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত। সনাতন আত্মাই পুনঃ পুনঃ দেবতা পশু মানব কীট পতঙ্গরূপে উৎপন্ন ও বিনষ্ট হইয়া থাকেন। এই জন্ম মরণ প্রবাহ, ইহাই সংসার। এই সংসারের নিবৃত্তিই মোক্ষ। মোক্ষে সনাতন আত্মা স্বপ্রতিষ্ঠিত, দেহাদি সম্বন্ধ আর তাঁহাতে হয় না। বিষয়কামনাই সংসারের হেতু—বিষয়কামনা নিবৃত্তিই মোক্ষের হেতু।

সনাতন আত্মাই কর্ম্মপ্রভাবে কখন হীন ভাব, কখন শ্রেষ্ঠ ভাব প্রাপ্ত

হইয়া থাকেন। এই যে কর্ম্ম, তাহার মুখ্য লক্ষ্য সনাতন আত্মার হীনতানিবৃত্তি। যে সকল কর্ম্ম শাস্ত্রনিষিদ্ধ, তাহাই সনাতন আত্মার হীনতা সম্পাদন করিয়া থাকে। তৃণ তরু হইতে মানব পর্য্যন্ত সকলেই জীব—সকলেই সেই সনাতন আত্মা—কিন্তু জ্ঞানের অভাবে সনাতনের সনাতনত্ব আচ্ছন্ন, ভস্মস্তূপে অগ্নি-কণার ন্যায় প্রচ্ছন্নায়িত। বর্ণাশ্রমধর্ম্ম সেই ভস্ম অপসারিত করিয়া অগ্নিকণাকে প্রবর্দ্ধিত করিবার পক্ষে অনুকূল। কেবল ইহলোক লইয়া ত' বর্ণাশ্রমধর্ম্ম নহেই, পরন্তু প্রধানতঃ ইহলোক লইয়াও নহে। ইহলোকের স্থিতি সীমাবদ্ধ; জীবনকাল—কালসমুদ্রের এক একটী ক্ষুদ্র বুদ্বুদ্ মাত্র; পরলোক অনন্ত। অনন্তের উৎকর্ষে বর্ণাশ্রমী ধাবমান, সেই ধাবন পথের আরম্ভ ইহলোক, অতএব ইহলোক প্রধান না হইলেও বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের পুণ্যস্পর্শ ইহলোককেও পবিত্র করিয়াছে। বর্ণাশ্রমধর্ম্মের অমৃতধারাসিক্ত ইহলোকে বিপ্লবতাপের বিভীষিকা থাকে না,—যে দুর্ভাগ্য দেশ এই অমৃতধারাসেকে বঞ্চিত, তথায় বিপ্লবতাপ প্রবল। আমাদের সজাতি ও সধর্ম্মা অনেক ব্যক্তি ভ্রমবশে বর্ণা-শ্রমধর্ম্মের তত্ত্ব বিস্মৃত হইয়াছেন, তাঁহারা ধর্ম্মকে একটা লৌকিক যুক্তি বা বন্ধন মাত্র মনে করেন, তাঁহাদের প্রভাব বিস্তৃত হইলে,—আমাদের দেশও বিপ্লবের ভীষণ তাপে দগ্ধ হইয়া যাইবে, তাহার সূচনা এখনই দেখা দিয়াছে।

জন্মান্তরকৃত কর্ম্মফল পাপপুণ্যের ভোগ ইহজন্মে করিতে হয়। ইহজন্মের উৎকট পুণ্যপাপেরও কচিৎ ইহজন্মে ভোগ হইয়া থাকে। জন্ম পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্মফলেই হয়; আয়ু সাধারণতঃ পূর্ব্ব কর্ম্মফলে; ইহজন্মের যোগ প্রভৃতি বিশেষ কর্ম্মে আয়ুর হ্রাসবৃদ্ধিও হইয়া থাকে। ইহা শাস্ত্রসিদ্ধান্ত; এ সিদ্ধান্তে বিশ্বাস থাকিলে নীচজাতি বলিয়া উল্লিখিত মানবশ্রেণীর মন অসন্তোষ বা বিদ্বেষকলুষিত হইতে পারে না; প্রত্যুত সর্ব্বদাই মনে হয় ইহজন্মে সাধুভাবে জীবনযাপন করি, সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করি, তাহা হইলে পরজন্মে বিশেষ অভ্যুদয় প্রাপ্ত হইব।

পূর্ব্বজন্মকর্ম্মফলে বিশ্বাস থাকিলে উচ্চজাতিরও গর্ব্ব ও মানের কোন কারণ থাকে না, বরং যে গর্ব্ব ও যে অভিমান মানুষকে অধোগতির দিকে নিক্ষিপ্ত করে, বর্ত্তমান জন্মের উৎকর্ষ হইতে বিচ্যুত করিয়া হীনজন্মে—এমন কি পশু-জন্মে—স্থাপিত করিতে পারে, তাহার পরিহারেই সর্ব্বদা প্রযত্ন রাখিতে তাঁহারা তৎপর থাকেন। যে কর্ম্মফলে ধনী দরিদ্র, পণ্ডিত মূর্খ, দয়ালু নির্দ্দয় ইত্যাদি অপরিহার্য্য অসংখ্য ভেদ মানবমণ্ডলে দেদীপ্যমান, সেই কর্ম্মফল জাতিভেদের

নিয়ামক, এ বিশ্বাস যতদিন প্রবল ছিল, ততদিন সকল বর্ণই সকল বর্ণের আনুকূল্য করিতেন, সকলের সহিতই একটা ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা ছিল, যাহা সৌহার্দ্য প্রীতি তাহা ছিল, একত্র পান ভোজন না থাকিলেও, ক্বচিৎ স্পর্শ অস্পর্শ বিচার থাকিলেও, যৌনসম্বন্ধ একবারে না থাকিলেও, আত্মীয়তার অভাব ছিল না, কেন না সকলেই সকলের মুখাপেক্ষী—কি সাংসারিক কর্ম্ম, কি ধর্ম্মকার্য্য, সকল বিষয়েই পরস্পর মুখাপেক্ষা ও আনুকূল্য ছিল। একই ধর্ম্মবিশ্বাসে সকলেই সম্বদ্ধ—ইহাই ছিল তখনকার সঙ্ঘশক্তির মূল। ব্রাহ্মণ ত্যাগী সংযমী, কারুণিক সত্যনিষ্ঠ; ব্রাহ্মণ স্বয়ং একপ্রকার অনশনে থাকিয়া অর্থাৎ কাহারও মুখের অন্ন স্বয়ং গ্রহণ না করিয়া, অতি নিঃস্ব অবস্থায় অথচ পরমসন্তোষে সমস্ত দেশের অন্ন সংস্থান করিয়া দিতেন, জগতের কল্যাণচিন্তায় নিযুক্ত থাকিতেন, জ্ঞানীকে পবিত্র রাখিবার জন্য ধনের আবিলতা হইতে দূরে রাখিতেন। এই যে ব্রাহ্মণকর্ম্ম তাহাও মানবকল্পিত একটা সম্প্রদায়গঠন নহে, ইহার মূলে সেই জন্মান্তর কর্ম্মফল বর্ত্তমান, সেই কর্ম্মফল ও ঐশীশক্তি মিলিত হইয়া এই জাতিভেদ সৃষ্টি করিয়াছেন। বাহ্যতঃ বৈষম্য বা ভেদ প্রাকৃতিক নিয়মতন্ত্র, মূলতঃ অভেদ ব্রহ্মভাব-তন্ত্র। যাহার বৈষম্য সর্ব্বথা বর্ত্তমান, তাহার ব্রহ্মভাব আবৃত, ব্রহ্মভাবতন্ত্র অভেদ তাহার পক্ষে অচিন্তনীয়, অভাবনীয়। এই যে সর্ব্বজাতির একাকারতা প্রয়াস ইহাতেও ঘোর বৈষম্য—ইহাতে স্বজাতিদ্বেষ স্বধর্ম্মদ্বেষ দেদীপ্যমান, আচার-নিষ্ঠগণও ত স্বজাতি, তাঁহাদের হৃদয়ে দারুণ বেদনা প্রদানে যে আনন্দবোধ বা উপেক্ষা, তাহা কি বৈষম্যচিহ্ন নহে, তাহাতে কি বিদ্বেষের বিষোদ্গার অনুভূত হয় না?

বিকৃত শিক্ষায় যাঁহাদের মস্তিষ্ক আচ্ছন্ন তাঁহাদিগের কার্য্য সমাজধ্বংসী, তাঁহাদের কার্য্য বর্ণাশ্রমধর্ম্মের প্রতিকূল। বর্ণাশ্রমধর্ম্মের একটি ক্ষুদ্র রেখা—বর্ণাশ্রমধর্ম্মের একটি অমৃতময়ী দীধিতি—ইহলোকেও উদ্ভাসিত। সেই অমৃত-দীধিতি মৃতসঞ্জীবনী; সমাজের সর্ব্বস্তরে এই যে মৃত্যুচ্ছায়া উপস্থিত, এই যে সনাতনের অবিনশ্বরত্ব বিস্মৃতিজনিত মৃত্যুমুখ প্রবেশভীতি করাল মুখ ব্যাদান করিয়া দণ্ডায়মান ইহা অপসারিত করিতে হইলে সেই মৃতসঞ্জীবনী অমৃতময়ী দীধিতিকে সঞ্চারিত করিতে হইবে; অনন্যকর্ম্মা হইয়া ব্রাহ্মণগণ—ত্যাগব্রত ধর্ম্মনিষ্ঠ নিরভিমান সদ্‌ব্রাহ্মণগণ—অযাচিত ভাবে দ্বারে দ্বারে সেই দীধিতির আলোক বিকীর্ণ করিবেন। তাহাই বন্ধনের অন্ধকারে একমাত্র পুণ্যালোক।

সনাতনধর্ম্ম মানবকল্পনার অতীত, সমগ্র সমস্যার সমাধান এই সনাতন

ধর্ম্মতত্ত্বেই—এই বর্ণাশ্রম ধর্ম্মতত্ত্বেই—সুসম্পন্ন। মনে থাকে যেন এই ধর্ম্মের সুবিস্তৃত বিশাল ক্ষেত্র জন্মজন্মান্তরের দীর্ঘভূমি আশ্রয়ে অবস্থিত। যে নমঃশূদ্র আজ কত দাবি করিতেছেন, তিনি যদি বুঝেন, যদি তাঁহার পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত সৌভাগ্যে—যে সৌভাগ্যে তিনি হিন্দুকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সেই সৌভাগ্যে—জন্মান্তরীয় কর্ম্মফলে প্রগাঢ় বিশ্বাস হয়, তাহা হইলে তিনি আর অভিমান বৃদ্ধির জন্য লৌকিক উপায় অবলম্বনে অগ্রসর হইবেন না, যাহাতে তিনি প্রকৃত অভ্যুদয়ে উপনীত হইতে পারেন, তাহাতেই মনোনিবেশ করিবেন।

সিদ্ধশবরী শ্রমণার উপাখ্যান, মতঙ্গমুনির বৃত্তান্ত ও গুহক চণ্ডালের শ্রীরাম-ভক্তি স্মরণ করিলে সকলেই বুঝিবেন,—জাতিকুলের হীনতা মানুষকে হেয় করে না, মনের হীনতাই মানুষকে হেয় করে। আমি অস্পৃশ্য হইয়াছি, কেননা পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফলে। ইহজন্মে এমন কর্ম্ম আমি করিব যাহাতে পরজন্মে বিশেষ অভ্যুদয়প্রাপ্ত হইতে পারি। সে কর্ম্ম শাস্ত্রোক্ত ধর্ম্মাচরণ, চিত্তশুদ্ধি; সে কর্ম্ম শাস্ত্রদ্বেষ নহে, ব্রাহ্মণবিদ্বেষ নহে। যদি ধর্ম্ম একটা খেলার বস্তু হয়, তবে তাহাকে লইয়া যথেচ্ছ ব্যবহার করা চলে। আমি হিন্দুধর্ম্মের অর্থাৎ বর্ণাশ্রমধর্ম্মের শাসনে অস্পৃশ্য, অতএব আমি বর্ণাশ্রমধর্ম্মশাসন মানিব না, এই যে রক্তচক্ষুঃ প্রদর্শন, ইহাতে কাহার অনিষ্ট? সমাজের অনিষ্ট। কেমন করিয়া? বর্ত্তমান শিক্ষায় বিভ্রান্ত জনগণ হিন্দুর সংখ্যা হ্রাসে অনিষ্টের বিভীষিকায় শিহরিতে পারেন, কিন্তু শাস্ত্রবিশ্বাসী বর্ণাশ্রমধর্ম্মী ইহাতে একেবারেই ভীত নহেন; যে হিন্দু পরলোকে অবিশ্বাসী, শাস্ত্রে অবিশ্বাসী, সে নামে হিন্দু হইলেও বর্ণাশ্রমধর্ম্মী নহে; সে মুসলমান নহে, খৃষ্টান নহে, অর্থাৎ ক্ষুদ্র বৃহৎ কোন ধর্ম্মই সে মানে না, ইহাই প্রমাণিত হয় মাত্র। তেমন ধর্ম্মহীন মানবকে 'হিন্দু' আখ্যা প্রদান করিয়া সমাজের অঙ্গে মিশ্রিত রাখা আর নিজ শরীরে পারদ প্রবেশন সমান।

যাহারা ধর্ম্মহীন, শাস্ত্রবিশ্বাসহীন, তাহাদের আকাঙ্ক্ষা অপূরণীয়। একত্রে পান-ভোজনেও ত' সে আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয় না, পানভোজনের পর রক্তসম্বন্ধও আকাঙ্ক্ষিত হইবে। শাস্ত্র ভুলিয়া পরকাল ভুলিয়া রাজনীতি মাত্র সার করিতে যাঁহারা চাহেন, তাঁহাদের লক্ষ্য এক এবং আমাদের লক্ষ্য অন্য। তাঁহারাও সমাজের অভ্যুদয় চাহেন, আমরাও চাহি; কিন্তু তাঁহাদের অভ্যুদয় ইহলোকেই সীমাবদ্ধ, আমাদের আকাঙ্ক্ষিত অভ্যুদয় ইহলোক পরলোক উভয়ত্র বিস্তৃত। রাজনীতি পরায়ণগণের ধর্ম্মরক্ষা একটা কল্পিত আচরণ মাত্র, আমাদের ধর্ম্মরক্ষা

শাস্ত্রবিশ্বাসের সহজাত। অবশ্য আমরা সে বিশ্বাস হারাইতেছি। যদি সঙ্ঘশক্তি গঠন আবশ্যক হয়, তবে সেই বিশ্বাসকেই প্রবর্দ্ধিত করিতে হইবে। একত্র পানভোজনে মিলন হইলে খৃষ্টান ইহুদি খৃষ্টান-রুষিয়ানের বিদ্বেষপাত্র হইত না; মনের মিলনেই প্রকৃত মিলন, বর্ণাশ্রমধর্ম্মের গূঢ়তত্ত্ব হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলে, মৈত্রী করুণা মুদিতা ও উপেক্ষায় হৃদয়ক্ষেত্রকে পরিশুদ্ধ করিতে পারিলে শাস্ত্রবিশ্বাসের বারি সেচনে হৃদয়ক্ষেত্রকে সিক্ত করিতে পারিলে, শাস্ত্রবিশ্বাসের অনুকূল যুক্তিবলে হৃদয়ক্ষেত্র-কর্ষণ প্রাপ্ত হইলে, তাহাতে প্রীতিবীজ রোপিত হয় এবং তাহা হইতেই মিলনতরু উদ্ভূত হইয়া থাকে। সেই তরুচ্ছায়াতেই সঙ্ঘশক্তির অভ্যুদয়।

যাঁহারা রাজনীতিপরায়ণ, তাঁহারা শাস্ত্র ও শাস্ত্রবিশ্বাসীকে অনেক সময়ে অনুদার বলিয়া থাকেন; কিন্তু চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ ঠিক তাহার বিপরীত সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন। শাস্ত্র ও শাস্ত্রবিশ্বাসীর দৃষ্টিতে মুসলমান ও খৃষ্টান যদি পরলোক বিশ্বাসী হন, তাহা হইলে পরলোক-বিশ্বাসহীন হিন্দু অপেক্ষা তাঁহাদের স্থান উচ্চ। শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট পথে বর্ণাশ্রমধর্ম্মানুসারে সঙ্ঘশক্তি গঠন সম্ভবপর। বর্ণাশ্রমাচারীর সঙ্ঘশক্তি গঠন করিতে হয় ত বর্ণাশ্রমধর্ম্মতত্ত্বই তাহার ভিত্তি, স্ব স্ব জাতির ঐহিক অভ্যুদয়ে ঐকান্তিক অনুরাগ সঙ্ঘশক্তিগঠনের পরিপন্থী। কোন একটী জাতির সঙ্ঘশক্তি তাহাতে গঠিত হইলেও, অন্য জাতির সহিত তাহা বিচ্ছিন্ন—সর্ব্বজাতির সঙ্ঘশক্তি গঠনে চেষ্টা করিতে হইলে, হয় বর্ণাশ্রমধর্ম্ম একেবারে ত্যাগ করিতে হয়, নচেৎ উৎকৃষ্টরূপে সেই বর্ণাশ্রমধর্ম্ম আশ্রয় করিতে হয়। প্রথম কার্য্য করিবার জন্য একদল বিশেষভাবে উদ্যোগী, তাঁহাদের আচরণ কিন্তু বিচিত্র; তাঁহারা হিন্দু থাকিবেন, অথচ বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ত্যাগ করিবেন,—এ হিন্দুত্ব যে কি, তাহা দুর্ব্বোধ্য হইলেও, লজ্জাকর; এ হিন্দুত্ব অর্থে সর্ব্বধর্ম্মহীনতা, ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ধর্ম্মহীনের ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী, সুতরাং বর্ণাশ্রমধর্ম্মত্যাগে জাতিধ্বংস অনিবার্য্য। এই যে বর্ত্তমানে হিন্দুসংখ্যা হ্রাস, তাহার কারণও সেই ধর্ম্মহীনতা। যে হিন্দুকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া হিন্দুর আচার পালন করিতেছে না, বর্ণাশ্রমধর্ম্মাবলম্বীর পবিত্রবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া বর্ণাশ্রমধর্ম্ম শাস্ত্র শাসনে বিদ্বেষী বা উপেক্ষাশীল,—তাহার মৃত্যুর পর হিন্দুকুলে বর্ণাশ্রমাবলম্বীর বংশে জন্মগ্রহণ অসম্ভব। মনের গতি অনুসারে জন্ম হয়, সেই গতি যদি বর্ণাশ্রমাচারের প্রতিকূল হয়—তাহা হইলে হিন্দুকুলে জন্মগ্রহণ তাহার হইতে পারে না। অপর কুলে তাহার জন্ম হয়; অল্পায়ুঃ অল্পভোগ, এ সমস্ত

ধর্ম্মহীনতার ফল। এ ধর্ম্ম কল্পিত ধর্ম্ম নহে, যে যে বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছে সেই বংশের পুরুষপরম্পরাগত সংস্কারপ্রতিষ্ঠিত শাস্ত্রোক্ত ধর্ম্মই সেই ধর্ম্ম; সেই ধর্ম্মহানি যত ঘটিতেছে, কুলক্ষয় জাতিক্ষয় ততই ঘটিতেছে, ভবিষ্যতেও ঘটিবে। অতএব বর্ণাশ্রমধর্ম্মকে প্রকৃষ্টভাবে আশ্রয় করাই একমাত্র অভ্যুদয়ের উপায়, রক্ষার উপায়। যাহারা হিন্দু নহে তাহাদের জাতিযোগ্য ধর্ম্ম শ্রীশ্রীভগবান্ কৃপা করিয়া বিভিন্ন মূর্ত্তিতে উপদেশ করিয়াছেন, সে ধর্ম্মে তাহারা যতদিন আস্থাবান্ থাকিবে, ততদিন তাহাদিগের কুলক্ষয় বা জাতিক্ষয় হইবে না। নিজ নিজ জাতিধর্ম্ম—অধিকারানুসারে প্রতিষ্ঠিত। যে স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিবে, তাহারই পরিণাম ভয়াবহ; "স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ।" এ সকল শাস্ত্রবাক্যে যাঁহারা শ্রদ্ধা হারাইয়াছেন, তাঁহারা যে পথে যাইতেছেন, আমাদের পন্থা তাহার বিপরীত।

অতএব সঙ্ঘশক্তিগঠনও বর্ণাশ্রম ধর্ম্মতত্ত্ব-প্রচারেরই একটা অংশমাত্র, ইহা বুঝিতে হইবে।

ব্রাহ্মণাদি বর্ণ নির্ব্বিশেষে যে জাতি তর্পণ করিবার সময়ে নিজ নিজ পিতৃপিতামহের তর্পণ করিবার পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ-পিতৃগণ, ক্ষত্রিয় পিতৃগণ ও শূদ্র পিতৃগণের তর্পণ করিতে বাধ্য, বিশ্বাসীর পক্ষে সে জাতির সংঘবন্ধন অক্ষুণ্ণ অনুন্মোচনীয়; সুতরাং সে সংঘের শক্তিও সুদৃঢ়। বিশ্বাসের হ্রাস যত হইতেছে—অজ্ঞান যতই প্রবল হইতেছে—সংঘশক্তি ততই দুর্ব্বল হইতেছে, এক একটী অঙ্গ—অন্যাঙ্গের সহিত বিচ্ছিন্ন হইতেছে, প্রাণরক্ষার জন্য এক প্রযত্নে পরিচালিত হইতেছে না।

শাস্ত্রে আপদ্ধর্ম্ম আছে, বা নির্য্যাতিতা রমণীর প্রায়শ্চিত্তান্তে ব্যবহার্য্যতাও আছে, তাহা আমাদের এই সভার নূতন আলোচ্য মধ্যে নিবেশনীয় হইতে পারে না। যাঁহার নামে নব্যশিক্ষিতগণ অনেকেই খড়গহস্ত, সেই রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যও বলাৎকারস্থলে যে প্রায়শ্চিত্ত আছে এবং প্রায়শ্চিত্তান্তে ব্যবহার্য্যতা হয়, তাহা স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছিলেন। ময়মনসিংহ-জামালপুরের যবন নির্য্যাতন সময়ে তদনুসারে মহামহোপাধ্যায় ৺চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার-প্রমুখ অধ্যাপকগণ ব্যবস্থা প্রদান করিয়াছিলেন, আমরাও করিয়াছিলাম, এখনও করিতে পারি, কিন্তু ঘোষণা করা চলে না, অবস্থা বিবেচনা করিয়া তবে ব্যবস্থা প্রদান করিতে হয়। সকলের অবস্থা এক প্রকার নহে, কোন সাধ্বী রমণী যদি বলপূর্ব্বক ধর্ষিতা হয়, প্রায়শ্চিত্তান্তে তাহার ব্যবহার্য্যতা আছে। এই প্রায়শ্চিত্ত পুনর্ব্বার

রজোদর্শন হইবার পর কর্ত্তব্য এবং যতদিন প্রায়শ্চিত্ত না হইবে, ততদিন পৃথকভাবে তাহাকে থাকিতে হইবে, ইহাই শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত। কিন্তু সতীধর্ম্ম, নির্য্যাতন, রজোদর্শন, এই কয়টী প্রকৃতই সত্যপ্রতিষ্ঠ হওয়া আবশ্যক, নতুবা সমস্তই বিফল। সন্ধ্যা আহ্নিক পূজাদি বর্ণাশ্রমধর্ম্মের একটা প্রধান অংশ; তীর্থরক্ষা, গোরক্ষা, পবিত্র বিবাহ, এ সমস্তও বর্ণাশ্রম ধর্ম্মতত্ত্ব প্রচারেরই এক এক অংশ; সুতরাং বর্ণাশ্রমধর্ম্মের রক্ষা হইলেই সমস্ত রক্ষা হয়।

বর্ণাশ্রমধর্ম্মের প্রকৃষ্টরূপে আশ্রয় গ্রহণ বর্ত্তমান সময় অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, অতএব আপৎকালানুরূপ বর্ণাশ্রমধর্ম্ম অবলম্বনীয়, ইহা সামঞ্জস্যবাদীদিগের মত। এ বিষয়ে আমার বক্তব্য এই যে, আপদ্ধর্ম্মও সংযমপ্রধান; কেবল জীবিকা বিষয়ে আপদ্ধর্ম্মে কিঞ্চিৎ অধিকার বৃদ্ধির পরিচয় আছে। কিন্তু সে আপদ্‌ও কল্পিত আপদ্ নহে, সত্য আপদ্। সে আপদে যে পরিবর্ত্তন—যে সাত্ত্বিকভাব রক্ষণার্থ সংযম তাহা শাস্ত্রীয়; আর এক প্রকার পরিবর্ত্তন আছে, তাহা অশাস্ত্রীয়, অশক্তিমূলক; সে পরিবর্ত্তন ধীরে ধীরে হয়, সে পরিবর্ত্তন সাধনের জন্য সমাজের কোন অংশে শক্তিপ্রয়োগ করিতে নাই, যাহা অশক্তিমূলক পরিবর্ত্তন বা কালকৃত পরিবর্ত্তন, তাহা ক্রমে হইয়া থাকে, শাস্ত্রে যে আমান্ন ও জল সমপর্য্যায়ে বর্ণিত, আমান্ন বিষয় সেই অস্পৃশ্যদোষ এখন সাধারণে অবগত নহে, জলে সে দোষ এখনও একটু আছে, যাহা আছে তাহা ক্রমে দূর হইবে; অশক্তিমূলক অনাচার এইরূপে সমাজে প্রবেশ করে। ইহার প্রতিকূলে শক্তিপ্রয়োগ করিলে, বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম শাস্ত্রে অবজ্ঞাপ্রদর্শন করা হয়। এই অশক্তিমূলক অনাচারের দৃষ্টান্তে নূতন নূতন অনাচার বা তত্তুল্য অনাচার নিমন্ত্রণ করিয়া আনিতে নাই; এক চরণ বাতব্যাধি বা পক্ষাঘাতগ্রস্ত বলিয়া অন্য চরণকে কি লগুড়াঘাতে খঞ্জ করিতে হইবে? এক চক্ষু দৃষ্টিশক্তিহীন বলিয়া অন্য চক্ষুকে কি সেইরূপ করিতে হইবে?

অশক্তিকৃত অনাচারের দৃষ্টান্তে সর্ব্বত্র অনাচার প্রচলন চেষ্টা সমাজ বিধ্বংসেরই প্রকারান্তর মাত্র। সমাজকে সজীব রাখিতে হইলে, তাহাতে বলপ্রকাশ করিতে নাই। সৎশিক্ষাই প্রদান করিতে হয়। অনাচার প্রবর্দ্ধনের চেষ্টা বর্ণাশ্রম সমাজে একেবারেই অকর্ত্তব্য।

অতএব বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মশাস্ত্রে সম্যক্ বিশ্বাস রক্ষা করিয়াও তাহার পরিবর্ত্তন যে আমাদের কর্ত্তব্য নহে, তাহা মনে রাখিয়া নিজ নিজ ব্যক্তিগত আচার রক্ষায় যত্নবান হইতে হয়, যাহারা সে আচার পালনে অসমর্থ, তাহাদিগকেও বিদ্বেষ বা অবজ্ঞা করিতে নাই; সাধু উপদেশ শাস্ত্রতত্ত্বের সদ্ব্যাখ্যা, এক সম্প্রদায়

ব্রাহ্মণের শাস্ত্রানুগত সত্যাচরণ বর্ত্তমান সময়ে বিশেষ কর্ত্তব্য। বর্ত্তমান সময়ে ইহাই প্রকৃতরূপে বর্ণাশ্রমধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ, এ সময়ে রাজনীতি-পরায়ণেরা যদি প্রতিবাদী হন, তাহা হইলে তাঁহারা অকল্যাণকর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন, ইহাই দুঃখের সহিত আমাদিগকে বলিতে হইবে।

বর্ণধর্ম্মতত্ত্ব প্রচার প্রসঙ্গে এই কথাটি সকলেরই স্মরণীয় যে রক্ত সম্বন্ধে সঙ্কর দোষ না ঘটিলে পতিত ব্যক্তিরও জাতিচ্যুতি ঘটে না, তিনপুরুষ পর্য্যন্ত এই পদ্ধতি। ত্রিপুরুষান্তে যে সন্তান জন্মগ্রহণ করে, তাহার পিতৃজাতি হয় না, তখন হইতেই জাতিচ্যুতি। অতএব, অসবর্ণা বিবাহশূন্য ব্রাহ্মণবংশ আচার-ভ্রষ্ট হইলেও তিন পুরুষ পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণই থাকিবেন, ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিলেও তাহার ব্রাহ্মণ্য নষ্ট হয় না। অন্য জাতির পক্ষেও এই নিয়ম তবে সেই ব্রাহ্মণ পাপভাগী, সুতরাং প্রায়শ্চিত্তার্হ ; অবস্থাবিশেষে প্রায়শ্চিত্তের ভেদ আছে। এ সকল কথা সবিস্তারে পূর্ব্বে কতক বলিয়াছি, প্রয়োজন হইলে ভবিষ্যতে বলিতে পারি। ফলতঃ ইহা নিশ্চয় যে, পরলোক বিশ্বাস ও শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট পথাবলম্বনে কর্ম্মাচরণ ব্যতীত বর্ণাশ্রমধর্ম্মীর কল্যাণ নাই, বর্ণাশ্রমধর্ম্মীর কল্যাণ ব্যতীত জগতের কল্যাণ নাই, ত্যাগব্রত শিক্ষা, পশুবধের সংবরণশিক্ষা সত্যব্রত বর্ণাশ্রমী বিশেষতঃ সর্ব্ববর্ণশিক্ষক ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণই প্রদান করিতে পারেন, সমগ্র মানব জাতির ভাবসংশোধক ব্রাহ্মণ্য রক্ষাই বর্ণাশ্রমধর্ম্মতত্ত্ব প্রচারের প্রধান সহায়।

আমরা শাস্ত্রানুগত, কিন্তু রাজনীতিচতুরগণের রাজনীতিক্ষেত্রে পরিকল্পিত হিন্দুনামের বিরোধ আমরা করি নাই, করিব না। কেহ যদি আপনার অন্ধপুত্রের পদ্মলোচন নাম রাখেন, অন্যের তাহাতে আপত্তি থাকিতে পারে না। পরিকল্পিত হিন্দুর আচার ব্যবহার যাহাই হউক না কেন, যতদিন তাহার ধর্ম্মান্তর গ্রহণ না ঘটিবে, ততদিন তাহার হিন্দুনামচ্যুতি ঘটিবে না। কিন্তু এই হিন্দুসংজ্ঞা প্রচলিত ব্যবহারমূলক, ইহাতে বর্ণাশ্রমধর্ম্মের সম্বন্ধ নাই। ব্রাহ্মণ মহাসম্মিলনের প্রকৃষ্ট কর্ত্তব্য বর্ণাশ্রমধর্ম্ম রক্ষা ; তাহার ফল ব্রাহ্মণ মহাসম্মিলনের প্রকৃত বাঞ্ছনীয়। পরিকল্পিত হিন্দু নাম রক্ষা রাজনীতিবিদের বাঞ্ছনীয় হইলেও, তাহাতে প্রকৃত অভ্যুদয়ের আশা নাই।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, বর্ণাশ্রমধর্ম্ম-সনাতন, ইহার মূল সনাতন, যত অপচয় হউক—ইহার ধ্বংস কখনই হইবে না, ইহা দৃঢ়ভাবে বলিতে পারি। অপচয় নিবারণও ভগবান্ করিয়া থাকেন, প্রয়োজন হইলে তিনিই এই অপচয় নিবারণ করিবেন।

"ব্রাহ্মণ্যেন রক্ষিতেন রক্ষিতঃ স্যাদ্ বৈদিকো ধর্ম্মঃ" সেই বৈদিকধর্ম্মই ধরাধারক, "যৎস্যাদ্ধারণসংযুক্তং স ধর্ম্ম ইতি নিশ্চয়ঃ" লোকধারণ বর্ণাশ্রম ধর্ম্মেই হইয়া থাকে, ইহাই বর্ণাশ্রমধর্ম্মতত্ত্বের সংক্ষিপ্ত সূত্র।

বৈদিক সাহিত্যের কাল-নিরূপণ।

লেখক—শ্রীক্ষিতিনাথ ঘোষ বি, এ, বি, ই।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

যদি অগ্রহায়ণী শব্দ দ্বারা পূর্ণিমা ও নক্ষত্র উভয়ই প্রতিপন্ন হইত, তবে পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্ত সম্ভবপর হইত। ভিত্তি যাহাই হউক না কেন, ভগবদ্গীতার প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়া ঐ অনুমানের প্রতিকূল যুক্তির খর্ব্বতা হইয়াছিল, এবং পাণিনি অগ্রহায়ণ শব্দের উল্লেখ করেন নাই বলিয়া অমরসিংহ ঐ মতানুবর্ত্তী হইয়া মৃগশিরা নক্ষত্রকে অগ্রহায়ণের পরিবর্ত্তে অগ্রহায়ণী নামে অভিহিত করিয়াছিলেন। গীতা ও অমরকোষ ভ্রমশূন্য বলিয়া যাঁহাদের বিশ্বাস এরূপ পরবর্ত্তী অভিধান-প্রণেতৃগণ নানাপ্রকার অস্বাভাবিক উপায়ে ধাতুপ্রত্যয় দ্বারা অমর সিংহের উক্তির সমর্থন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন এবং জ্যোতির্ব্বিদগণও তাঁহাদের সহিত অভিন্ন-মতাবলম্বী হইয়া বৎসরের কাল্পনিক ও প্রকৃত প্রারম্ভের সামঞ্জস্য-জ্ঞাপক মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এই সকল কারণে উপর্য্যুক্ত মতামত পরিহার করিয়া নক্ষত্রের প্রকৃত নাম অবধারণ করিবার জন্য আমরা বিশুদ্ধতর পাণিনিযুগে গমন করিব। পাণিনি আগ্রহায়ণ শব্দটী জানিতেন এবং তিনি যে ইহাদ্বারা মার্গশীর্ষ মাস বুঝিতেন তাহা আমি বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি। সুতরাং ইহাদ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে তিনি কাল-বাচক অর্থে অগ্রহায়ণ শব্দ হইতে এই শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে এরূপ ব্যবহার করিয়াছেন।* যদি ইহাই সিদ্ধান্ত হয় তবে বুঝিতে হইবে যে তিনি অগ্রহায়ণ শব্দ দ্বারা মৃগশিরা নক্ষত্রকে লক্ষ্য করিয়াছেন। সুতরাং অমরকোষোক্ত আগ্রহায়ণী শব্দ হয় ভ্রমাত্মক নতুবা মৃগশিরা তারার বিশেষণ (স্ত্রীলিঙ্গে) এবং অগ্রহায়ণ শব্দের সহিত

* নক্ষত্রেণ যুক্তঃ কালঃ (পা ৪-২-৩)

একার্থবোধক। অগ্রহায়ণ + অণ্ † আগ্রহায়ণ ; আগ্রহায়ণ + ঙীপ্ ‡ আগ্রহায়ণী। এই যুক্তির অনুকূলে বলা যাইতে পারে যে মৃগশিরাকে একসময়ে স্ত্রীলিঙ্গ-জ্ঞাপক শব্দরূপে গণ্য করা হইত। মুকুট ও ভানুদীক্ষিত * বোপলিত (Bopalita)

† প্রজ্ঞাদিভ্যশ্চ (পা ৫-৪-৩৮)

‡ টিড্ঢাণঞ্ দ্বয়সজ্ দঘ্নজ্ মাত্রচ্ তয়প্ ঠক্ ঠঞ্ কঞ্ ক্বরপ্ খ্যুনাম্ (পা ৪-১-১৫)

মন্তব্য—আগ্রহায়ণী শব্দটী পাণিনি জানিতেন কেননা ৪-১-৪১ সূত্রে গৌরাদি আকৃতিগণের তালিকায় ঐ শব্দের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। অগ্রহায়ণ শব্দ হইতে ঐ সূত্র অনুসারে উহা উৎপন্ন হইয়াছে, "ষিদ্ গৌরাদিভ্যশ্চ" সূত্রে পাণিনি বলিয়াছেন যে অকারান্ত—যকারলোপি শব্দের পর ও গৌরাদি তালিকাভুক্ত শব্দের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে ঙীষ্ প্রত্যয় হয়। অগ্রহায়ণ + ঙীষ্ = আগ্রহায়ণী। কিন্তু তিনি ঐ শব্দের দ্বারা যে মার্গশীর্ষ মাস বুঝেন নাই ইহা মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। কেননা তাহা হইলে তিনি আগ্রহায়ণী শব্দ ৪-২-২৩ সূত্রে উল্লেখ করিতেন। ঐ সূত্রে "বিভাষা ফাল্গুনী শ্রবণা কার্ত্তিকী চৈত্রীভ্য" তিনি বলিয়াছেন যে ফাল্গুনী প্রভৃতি চারিটী শব্দের পর ঐ পৌর্ণমাসী যাহাতে এই অর্থে বিকল্পে ঠক্ প্রত্যয় হয় কারণ এই সকল স্থলে মাস বুঝাইতেছে। অধিকন্তু তিনি "আগ্রহায়ণ্য শ্বত্থাট্ ঠক্" (পা ৪-২-২২) সূত্রে অশ্বথ শব্দের সহিত উহার উল্লেখ করিয়াছেন। এই সূত্র হইতে "আগ্রহায়ণিক" পদ নিষ্পন্ন হয়। সুতরাং মাস অর্থে পাণিনি আগ্রহায়ণিক শব্দই ব্যবহার করিয়াছেন। এবং আগ্রহায়ণী শব্দ নক্ষত্রবোধক অগ্রহায়ণ শব্দ হইতে গঠিত করিয়াছেন "নক্ষত্রেণ যুক্তঃ কালঃ" পা ৪-২-৩ সূত্রে বলা হইয়াছে নক্ষত্রবাচক শব্দের পর তদ্‌যুক্ত কালার্থে অণ্ প্রত্যয় হয়। অগ্রহায়ণ + অণ্ = আগ্রহায়ণ, "তদ্ধিতেষ্বচামাদেঃ" ৭-২-১১৭ এই সূত্রে বলা হইয়াছে যে "ণকার লোপ হয় এরূপ তদ্ধিত প্রত্যয় পরে থাকিলে শব্দের প্রথম স্বরবর্ণের বৃদ্ধি হয়, সেজন্য "আগ্রহায়ণ" পদ হইল। তাহার উত্তর—স্ত্রীপ্রত্যয় "ঙীপ্" হওয়ায় আগ্রহায়ণী শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। টিড্ঢাণঞ্ সূত্রে বলা হইয়াছে টকারলোপি শব্দ, বা টকারলোপি ঢকার লোপি বা অণ্ প্রভৃতি প্রত্যয়ান্ত শব্দের পর স্ত্রীলিঙ্গে ঐ প্রত্যয় হয়। ইহাই স্বাভাবিক ব্যাখ্যা। আর যদি অগ্রহায়ণ শব্দের উত্তর স্বার্থে অণ্ প্রত্যয় করা হইয়াছে মনে করা হয় এবং অগ্রহায়ণ ও আগ্রহায়ণ একার্থবোধক মনে করা যায়, তাহা হইলে পদ সিদ্ধ হয় বটে। যে সূত্রের দ্বারা (প্রজ্ঞাদিভ্যশ্চ ৫-৪-৩৮) ঐ পদ নিষ্পন্ন হয় অগ্রহায়ণ শব্দকে তাহার আকৃতিগণের তালিকাভুক্ত করিতে হয়। ইহা অস্বাভাবিক হইতে পারে, কারণ প্রজ্ঞাদি তালিকায় ঐ শব্দের উল্লেখ নাই।

* অমর ১-৩-২৩। ভানুদীক্ষিতের টীকা মুদ্রিত হইয়াছে। মুকুট ও ক্ষীরস্বামীর টীকা আনন্দরাম বড়ুয়ার অসম্পূর্ণ অমরকোষে দ্রষ্টব্য।

হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং মৃগশিরা নক্ষত্রের ক্লীবলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গসূচক রূপ প্রকাশ করিয়াছেন। রমানাথ তাঁহার ত্রিকাণ্ডবিবেকে রাভস হইতে এবং অন্য একজন স্মৃতি হইতে ঐরূপ লিঙ্গসূচক পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছেন §। যদি মৃগশিরা শব্দটী স্ত্রীলিঙ্গে ব্যবহৃত হইত তাহা হইলে আগ্রহায়ণী শব্দটী অন্বর্থ হইত। ইহা ঐ পূর্ণিমার নাম বলিয়া নহে, ঐ নক্ষত্রটীর নাম স্ত্রীলিঙ্গে ব্যবহৃত হইত, সেজন্য উক্তরূপে গণ্য হইত।

ভক্তিকথা।

লেখক—শ্রীআদ্যনাথ বিদ্যাভূষণ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

ইদং হি পুংসঃ তপসঃ শ্রুতস্য বা।
স্বিষ্টস্য সূক্তস্য চ বুদ্ধদত্তয়োঃ।
অবিচ্যুতোঽর্থঃ কবিভির্নিরূপিতো,
যদুত্তমশ্লোক-গুণানুবর্ণনং। ভা ১। ৫। ২২

মনুষ্যদিগের তপস্যা, শাস্ত্রপাঠ, যজ্ঞ, মন্ত্র, জ্ঞান, দান প্রভৃতির ইহাই অখণ্ড ফল, যাহাতে হরিগুণানুকীর্ত্তন ঘটে, ইহাই শাস্ত্রকারগণ নিরূপণ করিয়াছেন। এই শ্লোক হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, ভগবৎ-গুণকীর্ত্তন কেবল যে কলিযুগেরই মুখ্য ধর্ম্ম তাহা নহে, সকল যুগেরই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। ভগবানের নাম গান করিতে সমর্থ হইবে বলিয়াই তিনি মানবের বাগ্‌যন্ত্ররূপ বীণা ভাল করিয়া নির্ম্মাণ করিয়া বাঁধিয়া দিয়াছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য নিবন্ধন সেই বীণা কুৎসিত স্বরে বাজিতে লাগিল। বিবরান্তর্গত ভেক-জিহ্বার ন্যায় কর্কশ স্বরে রব করিয়া কাল ভুজঙ্গকে ডাকিয়া আনিল। নিজ দোষে কালভুজঙ্গ-কবলে কবলিত হইল। করুণাসিন্ধু দীনবন্ধু শ্রীহরির কোন দোষ নাই। তিনি জীবকে নিজ কোলে টানিয়া লইতে সদাই বাহু প্রসারণ করিয়া আছেন, আমরাই বিমুখ। বৈদ্য নিজ হৃদয়-শুক্তিতে, স্বীয় ভক্তিরসে নামামৃত-রসায়ন মাড়িয়া স্বপ্রেম-মধু প্রক্ষেপ দিয়া জীবের গলায় ঢালিয়া দিতেছেন। আমাদের দুর্ভাগ্য, আমরা গলাধঃকরণ

§ আনন্দরাম বড়ুয়ার সংস্করণের পৃঃ ১১২ দ্রষ্টব্য।

না করিয়া তুলিয়া ফেলিতেছি। সেই বৈদ্যরাজ ভবরোগার্ত্ত জীবের পরিত্রাণার্থ শত সহস্রবার অবতীর্ণ হইয়া জীবের হিতার্থ আত্মোৎসর্গ করিতেছেন। কিন্তু আমরা জ্ঞানান্ধ, হয়ত দেখিয়াও তাঁহাকে সামান্য মানববোধে অবজ্ঞা করিতেছি। সেটা আমাদেরই কুকর্ম্মের দুর্নিবার প্রভাবজাত ফল। ইচ্ছা না থাকিলেও আমাদিগকে সুকর্ম্মে বা কুকর্ম্মে নিয়োজিত করে কে? অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাই, প্রবৃত্তিই তাহার কারণ। প্রবৃত্তি রিপুসম্ভূত, রিপুকুল রজঃ বা তমোগুণ হইতে উৎপন্ন। গুণ কোথা হইতে আইসে? প্রকৃতি হইতে। সেই প্রকৃতির গুণ হইতেই দেহেন্দ্রিয়াদি সম্ভূত। সেই প্রকৃতিকে জয় করা, শক্তিহীন মানবের সাধ্যাতীত বিষয়। কারণ, জ্ঞানীরাও প্রকৃতির গুণে বশীভূত হইয়া থাকেন। তবে সেই দুর্জ্জয় প্রকৃতিকে জয় করিবার উপায় কি? উক্ত প্রকৃতিই ভগবানের মায়া, সেই গুণময়ী মায়াকে জয় করা দুর্ব্বল মানবের পক্ষে সহজসাধ্য নহে। অসাধ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বেশ কথা; ইহাই যদি স্থির হইল, তবে জীব কি কখনও কোন উপায়ে সুখ দুঃখের অতীত অবস্থা প্রাপ্ত হইবে না? নিরাশ হইবার আবশ্যকতা নাই, ভগবানের শ্রীমুখের আশ্বাসবাণী আছে। তিনি বলিয়াছেন যে অনন্যপরায়ণ, আমা ভিন্ন জগতে আর কিছু জানে না, সেই গুণময়ী অর্থাৎ ত্রিগুণাত্মিকা মায়ার হাত হইতে সে অব্যাহতি পাইবে। ইহার তাৎপর্য্য এই, মন প্রাণ একান্তভাবে ভগবানে লীন হইলে, প্রকৃতির গুণসম্ভূত ইন্দ্রিয় বা রিপুগণের দেহ বা মনের উপর প্রভুত্ব থাকে না। তখন মন সত্ত্বগুণাবলম্বী হয়, ও শান্ত হয় এবং নির্ম্মল হয়। ক্রমশঃ স্বচ্ছ মনে ভগবানের অর্থাৎ আত্মার প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হয়। পরে জীব বুঝিতে পারে যে, আমিই উহার স্বরূপ। জানিতে পারিবামাত্রেই সে সমস্ত সুখ দুঃখের অতীত হইয়া যায়। এইটুকু জানিবার জন্যই উপাসনা আবশ্যক। উপ অর্থে নিকটে, আসনা অর্থে উপবেশন করা অর্থাৎ ভগবানের নিকটবর্ত্তী হওয়া, ইহাই উপাসনা শব্দের অর্থ। উপাসনায় আমাদেরই প্রয়োজন, ভগবানের কোনও প্রয়োজন নাই। ভগবানের সহিত মিলিত হওয়াই উপাসনার প্রকৃত তাৎপর্য্য। সেটুকু ফুল তুলসী, গঙ্গাজল লইয়াই হউক, গির্জ্জায় বা মস্‌জিদে যেয়েই হউক, হইলেই গুটী পাকিয়া যাইবে। পাকা খেলোয়াড়ের মত খেলা আবশ্যক। নচেৎ সময় নষ্ট, মনের কষ্ট অদৃষ্টে সবই ঘটে। এখন বুঝুন, যারা বলেন জীব যখন স্বকর্ম্মাধীন, এ জগতের উপর ঈশ্বরের কোনই হাত নাই, সুতরাং ঈশ্বরোপাসনার কোনই আবশ্যকতা নাই। এ কথা খাটিল না, কারণ তাঁর কোন হিতের জন্য

আমরা উপাসনা করি না, আমরা নিজের হিতের জন্যই, নিজের স্বরূপ চিনিবার জন্যই উপাসনা করি। যখন আমরা স্বভাবতঃ অন্ধ, পথ চিনি না, সুযোগ্য চালক নাই, অথচ দয়ালু ভগবান হাত ধরিয়া লইয়া যাইতে সতত উৎসুক, তখন আমরা তাঁহারা প্রশংসা গান করিব না কেন? অহেতুক দয়ালুর গুণ-গান কে না করে? আত্মারাম মুনিগণও তাঁহার গুণগানে তৃপ্তিবোধ করেন। ভক্তেরা বলেন, তিনি ভক্তের বাসনানুরূপ শরীর পরিগ্রহপূর্ব্বক দেখা দেন এবং বাসনা পূর্ণ করেন। তিনি স্বাধীন-ইচ্ছাসম্পন্ন এবং সর্ব্বশক্তিমান, তাঁহার পক্ষে কিছুই অসম্ভব নহে।

দৃঢ়প্রত্যয় এবং শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাস না জন্মিলে ভগবানের অস্তিত্ব উপলব্ধি করা সম্ভবপর নহে। মন একাগ্র না হইলে লক্ষ্যবেধ করা যায় না। সুতরাং শাস্ত্রাদিষ্ট সাধনা দ্বারা দুর্নিবার মনকে স্থির করাই সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য। আত্ম মনঃ-সংযোগ ব্যতীত কোন জ্ঞানই জন্মে না। কিন্তু সেই মন যদি সতত বিবিধ বিষয়ে বিক্ষিপ্ত থাকে, তাহা হইলে তাহা দ্বারা লক্ষ্য স্থির হইবে কিরূপে? সুতরাং সর্ব্বাগ্রে মন স্থির করা আবশ্যক। মন অন্যান্য ইন্দ্রিয়বর্গের পরিচালক। মন যদি ইন্দ্রিয়দিগকে বিষয়াভিমুখে পরিচালিত করিয়া তাহাদের সংগৃহীত বিষয়ের অনুভব করিতে ব্যাপৃত থাকে, তাহা হইলে সে মনকে অন্তর্মুখী করা সহজসাধ্য নহে। মনই দেহরথের সারথি, জীবনরাজ্যের রাজা। গল্প করা বা বক্তৃতা করা যত সহজ, কার্য্যে সিদ্ধিলাভ করা তত সহজ নহে। তাহা না হইলেও ধর্ম্ম, বিমল আনন্দপ্রদ ও মনোহর। কতকগুলি অর্ব্বাচীন লোকে ধর্ম্মটাকে ভয়প্রদ করিয়া তুলিয়াছে। তাহাদের মতে ঐহিক সমস্ত সুখসম্পদ ত্যাগ না করিলে আর ধর্ম্ম হইবে না; বলিতে পারি না, ভিন্নরুচির্হি লোকঃ, জগতে সর্ব্ববাদিসম্মত সিদ্ধান্ত সুদুর্লভ। কিন্তু আর এক শ্রেণীর লোক আছে, যাহারা কোনই তর্কের ধার ধারে না, শাস্ত্র পড়ে না, ঠাকুর দেবতা বা মতামত লইয়া বিবাদ করে না, কেবল দৃঢ়নিশ্চয়তাবলে ভগবানের উপর নির্ভর দিয়া থাকে। তাহাদের মত এই যে ভগবান নিশ্চিতই আছেন, আমরা আর কিছু জানি না বা জানিতে চাহি না। আমরা ধর্ম্মাধর্ম্ম, কর্ম্মাকর্ম্ম, সমস্তই তাঁহারি রাতুল চরণে সমর্পণ ক'রে নিশ্চিন্ত হইব। ইহাকে ভগবদুদ্দেশ্যক কর্ম্ম সমর্পণ কহে। তাদৃশ কর্ম্ম, বন্ধের হেতু নহে। যাহারা সর্ব্বান্তঃকরণে ভগবানে আত্মসমর্পণ করিয়াছে, ভগবানও তাহাদের হিতার্থে নিযুক্ত থাকেন। শ্রীকৃষ্ণের নিজমুখের উক্তি শুনুন, তেষাং সতত-যুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহং। তাহাদের জীবন ধারণোপযোগী দ্রব্যাদির জন্য কিছুই ভাবিতে হয় না।

আমরা দেহেন্দ্রিয় দ্বারা প্রতিনিয়ত নশ্বর জগতের মুটেগিরি করিতে পারি, উহা ভগবৎ-সেবায় নিযুক্ত করিলে কি কোন ক্ষতি আছে? যাহা নিশ্চিত বিনশ্বর, যাহার পরিণাম, কৃমি, বিট্, ভস্ম, সে দেহে মণি মাণিক্য ঝুলাইয়া সম্রাট্ বলিয়া পরিচয় দিয়া কি চরিতার্থতা জন্মে, বুঝি না। এই স্বপ্নতুল্য জীবন, শয়নে, ভোজনে, পর্য্যটনে, বিবাদে গত হইয়া যাইতেছে। যাহা একটু সময় থাকে, তাহাও অর্থচিন্তায় ও বিষয়চিন্তায় গত হইয়া যায়। দেখিতে দেখিতে জীবন ফুরাইয়া যায়, পথের সম্বল কিছুই সংগ্রহ হয় না। তখন শেষ মুহূর্ত্তে মনে হয়! হায়! কি করিলাম, এমন দুর্লভ জীবন বৃথাই গত হইল! সময়ের সদ্ব্যবহার ঐহিক জীবনের যেমত উপকারক, পারমার্থিক জীবনেরও সেইরূপ উপকারক। এ জগতে কেহ কাহাকে ধরিয়া তুলে না, সবাইকে নিজে উঠিতে চেষ্টা করিতে হয়। তবে প্রকৃত গুরু পথ-প্রদর্শক বটে, কিন্তু তাহা হইলেও সাধনা স্বসাধ্য। ভগবৎ-প্রাপ্তিই সাধনার মুখ্য উদ্দেশ্য। ভগবৎ-প্রাপ্তি ভিন্ন মানবের স্বরূপ জ্ঞান হয় না। যতদিন তাহা না জন্মে ততদিন মানব মৃত্যুভয়ে শঙ্কিত ও ভয়ে মুহ্যমান হইয়া থাকে। আমি কে, ইহা জানা আবশ্যক, নিত্য অনিত্য নির্ণয় করা আবশ্যক, কাহার মৃত্যু হয়, কাহার জন্ম হয় ইহা জানা আবশ্যক। এই সবগুলি ঠিকরূপে জানিতে পারিলে, তখন আর মৃত্যুভয় বা কোন শঙ্কা থাকে না। কলির মন্দভাগ্য মানবের এ সব জ্ঞান সুদুর্লভ; সুতরাং এ যুগে একমাত্র ভগবচ্চরণাগতিই সর্ব্বশ্রেয়ো-বিধানহেতু। ভগবৎ-বিমুখ জীবের কোন মতেই নিস্তারের উপায় নাই। যুগের ভীষণতা এবং মানবের অল্পায়ুষ্কতা প্রভৃতি দোষ দর্শনে ভগবান যুগের অনুরূপ ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন। তিনি নাম-যজ্ঞই কলির জীবের প্রধান ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। স্বতঃ-পবিত্র শ্রীহরির মধুর নাম জিহ্বাস্পর্শে আচণ্ডাল মানবকে পবিত্র করে। অথচ এই নামযজ্ঞের কোনও কঠোর সাধনা নাই। বিশ্বাসস্থাপনপূর্ব্বক নাম করিতে পারিলেই মুক্তি হইবে সন্দেহ নাই।

নাম-সংকীর্ত্তন প্রভাবেই সর্ব্বানর্থ দূর হইবে তারস্বরে শাস্ত্রও এই কথাই ঘোষণা করিতেছেন।

শৃণ্বতাং স্বকথাঃ কৃষ্ণঃ পুণ্যশ্রবণকীর্ত্তনঃ।
হৃদ্যন্তঃস্থো হ্যভদ্রাণি বিধুনোতি সতাং সুহৃদ্। ভা ১।

যাঁহার নাম শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিলে মানব পবিত্র হয়, সেই শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় নাম শ্রবণকারীদিগের হৃদয়ের অন্তর্ব্বর্ত্তী হইয়া অশুভকর কামাদি রিপু বিতাড়িত

করেন। যেহেতু তিনি সততই সাধুদিগের সুহৃদ। সুহৃদের যাহা কর্ত্তব্য, অমঙ্গল দূর করা, তাহাই তিনি করেন। সুতরাং অমঙ্গলের জন্য আর কিছু ভাবিতে হইবে না, নাম-সংকীর্ত্তন করিলেই সমস্ত অমঙ্গল বিনষ্ট হইবে। আমরা যাহাকে পাপ বলি, সেই পাপ কামাদি রিপু হইতে উৎপন্ন হয়। কাম, ক্রোধ, লোভ এই তিনটী রিপুই দুর্জ্জয়, যত কিছু অনর্থ, যত কিছু পাপ, উক্ত তিনটী রিপু হইতেই সাধিত হয়। পৃথিবীর ইতিহাস, ধর্ম্মশাস্ত্র, সাহিত্য এই কথা সর্ব্বদা প্রমাণ করিতেছে। মনকে বাসনা-বহ্নি-শিখায় দগ্ধ করিতে এবং বিক্ষিপ্ত করিতে ঐ তিনের সমান আর কিছুই নাই। মনুষ্যের মনুষ্যত্ব বিনষ্ট করিতে, পশুত্ব সংস্থাপন করিতে, ঐ তিন রিপুর তুল্য আর কিছুই নাই। জীবন-সংগ্রামে মানব স্বতঃই উহাদের নিকট পরাজিত। বাহ্য শত্রুর হাত হ'তে রক্ষা করিবার এক জন সুহৃদও মিলে না, দারুণ অন্তঃ-শত্রুর অত্যাচার হইতে আর কে রক্ষা করিবে? ভাই আছে, বন্ধু আছে, পুত্র আছে, মিত্র আছে, কিন্তু অন্তঃ-শত্রুর দুর্ব্বিষহ অত্যাচার হইতে রক্ষা করিতে একজনও সমর্থ নহে। যদি এমন কোনও বন্ধু থাকেন, যিনি অন্তরের অন্তর্ব্বর্ত্তী শত্রুদিগকে বিতাড়িত করিয়া দেন, তাহা হইলে তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর বন্ধু আর জগতে কে হইতে পারে? তাঁহার চরণে আমাদের জীবন বিক্রয় করা কর্ত্তব্য কিনা? সেই মহান উপকারের বিনিময় কি? কেবল তাঁহার গুণ শ্রবণ ও কীর্ত্তন করা। তুচ্ছ প্রত্যুপকার, সে উপকারের ঋণ পরিশোধ করিবার মানবের কিছুই নাই। শুধু ইহাই কি পর্য্যাপ্ত, তাহা নহে, আরও উপকার আছে। যে কামাদি রিপু হৃদয়ে বাসনা-শিখা প্রদীপ্ত করিয়া দিয়া সতত ভব-দাবদহনে দগ্ধ করিতেছে, সেই দুর্ব্বিষহ তাপ নির্ব্বাণ করিতে একজনও সুহৃদ এ ত্রিভুবনে নাই। যদি অহেতুক কোন বন্ধু নিজ গুণে সেই দাব-দহন সুধাধারা-বর্ষণে নির্ব্বাপিত করেন, তবে তাঁহার চরণে আমরা আত্ম-সমর্পণ করিতে প্রস্তুত হই কিনা? অবশ্যই হইব। তাদৃশ বন্ধু কে? শ্রীকৃষ্ণ। তিনি সেই অতুল উপকারের বিনিময়ে কিছুই চান না, কেবল তাঁহার গুণ গান শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিলেই তিনি সুহৃদ্ হইয়া সমস্ত বাসনা, সমস্ত অমঙ্গল, সমস্ত তাপ নিবৃত্ত করেন। কল্পতরু যাহা চাও তাহাই দিতে প্রস্তুত; কিন্তু, আমরা মূঢ়; কি লইলে, কি চাহিয়া লইলে, আমাদের একান্ত শ্রেয় হইবে তাহাই আমরা জানি না। নিজেদের দুর্দ্দিন দুর্ভাগ্য ঘুচে না, সুতরাং ঠিক পথ দেখিতে পাই না। আমাদের পথপ্রদর্শকও সেই সুহৃদ্। কাঁদিয়া কাঁদিয়া তাঁর চরণে ধরিয়া বল "ক্ষম মম গত অপরাধ, প্রাণনাথ!

করি প্রণিপাত চরণে"—এইরূপ কাঁদিয়া আকুল হয়ে তাঁর চরণে ধরিলে অবশ্যই তাঁর দয়া হবে। তিনি কৃপাসিন্ধু, বিন্দু দানে তিনি কৃপণতা প্রকাশ করিবেন না। তাঁর কৃপাবিন্দু লাভেই তোমার প্রেমসিন্ধু উছলিয়া উঠিবে। জীবের এমন সুহৃদ্ থাকিতে এত দুর্গতি, সে কেবল জীবের মূর্খতা। যোগ, নিয়ম, যম, আসন, প্রাণায়াম, তপস্যা প্রভৃতি কঠোরতা দ্বারা যাহা সাধিত না হয়, একমাত্র ভগবচ্চরণাগতি হইতেই তাহা লাভ হয়। ভগবান্ গীতায় নিজ মুখে বলিয়াছেন "হে পার্থ! যোগ, তপস্যা, বেদাধ্যয়ন, দান প্রভৃতি কোন কার্য্য-বলেই মানব আমাকে বশীভূত করিতে পারে না, একমাত্র উত্তমা ভক্তিই আমাকে বশীভূত করিতে পারে।" এত সহজ পথ যিনি দেখাইয়া দিলেন তাঁর প্রতি বিমুখ হয়ে জীব নিজ দোষে জন্মে জন্মে দারুণ ক্লেশ পাইতেছে।

পার্থিব জগতেও অপার করুণা প্রকাশ। জল, বায়ু, সূর্য্য, চন্দ্র যেন তাঁরই আদেশে ভৃত্যবৎ জীবসেবা করিতেছে। ঊর্দ্ধে গগনতলে বিস্ময়কর সৌর জগৎ। যাঁহারা ঐ সৌরজগতের অত্যাশ্চর্য্য নিয়মাবলী পর্য্যালোচনা করেন তাঁহারা ভগবানের অপার মহিমা কীর্ত্তন না করিয়া থাকিতে পারেন না। আমরা ভ্রান্ত, সেইজন্য তাঁহার অপার করুণা বুঝিতে পারি না। তোমার শোক তাপ আধি ব্যাধির জন্য তিনি দোষী নহেন, তিনি পক্ষপাতী নহেন। শোক তাপ প্রভৃতির কতকটা প্রকৃতির নিয়ম লঙ্ঘনের ফল, কতকটা স্বকর্ম্মার্জ্জিত ফল। যদি বল তাঁর রচিত ভুবনে এত দুঃখ, এত বাধা বিঘ্ন কেন? সত্য কথা, কিন্তু তিনি যদি সুখ-দুঃখ-প্রদাতা হন, তবে তিনি ভগবান নহেন। ভগবানে দোষ স্পর্শিতে পারে না। বেশ কথা, যদি ভগবান সুখদুঃখদাতা না হন, তবে এ জগতে এত দুঃখ কোথা হইতে আসিল? ইহার দুটী উত্তর আছে, একটী আস্তিকের আর একটী নাস্তিকের। নাস্তিক বলেন, শরীর ধারণ করিলেই সুখদুঃখ, শোক তাপ ঘটিতে পারে, তজ্জন্য পূর্ব্ব জন্ম বা প্রাক্তন কর্ম্মফল স্বীকার করিবার আবশ্যকতা নাই। আস্তিকেরা বলেন কারণ ব্যতীত কখনও কার্য্য ঘটে না, শরীর ধারণ করিলেই যদি আধি ব্যাধি অবশ্যম্ভাবী হয়, তবে, সকলেরই একরূপ সুখ দুঃখ না হইয়া ভিন্নরূপ হয় কেন? শরীর ধারণ কারণ সর্ব্বত্রই তুল্যরূপে বিদ্যমান আছে। যদি বল নিজ কার্য্য, আহার ব্যবহার, দেশ, কাল, পাত্র ও প্রকৃতির অবস্থাভেদে সুখ দুঃখের তারতম্য ঘটে। ইহা বলিলেও জগতের যাবতীয় বৈষম্যের মীমাংসা হয় না। সুতরাং নিত্য অনিত্য, চেতন অচেতন ভিন্ন ভিন্ন দুটী বস্তু স্বীকার

করিতেই হইবে। সমস্ত কারণের যেখানে অবসান হয়, সেই সর্ব্বকারণকারণ নিত্য, ইহা অবশ্য-স্বীকার্য্য। নচেৎ বিনা কারণে কার্য্যোৎপত্তিদোষ উত্থিত হয়। যেখানে কোন কারণ নির্ণয় করা যায় না, সেখানেও মানবের অজ্ঞেয় কারণ নিশ্চিত আছে। যিনি সর্ব্বকারণকারণ তিনি জন্ম, মৃত্যু, ক্ষয়োদয়বিহীন অবিনাশী। তাঁহারই অংশ জীবরূপে জগতে ব্যাপ্ত। সুতরাং জীবদেহে যে চেতনার উপলব্ধি হয়, তাহা সেই অনন্তশক্তি ভগবানের অংশ। আমরা অনেক সময় প্রাণ বা মনকে আত্মা বলিয়া মনে করি। বস্তুতঃ তাহা নহে; কারণ, মন ও প্রাণ পরিণামী প্রকৃতিসম্ভূত, সুতরাং অনিত্য। তবে, আত্মা কোষকার কীটবৎ অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, জ্ঞানময়, কোষ নির্ম্মাণকরতঃ দেহ-পিঞ্জরে বদ্ধ হন। বস্তুতঃ তাহা হইলেও তিনি বিনাশী বা জন্ম মৃত্যুর অধীন নহেন। সুতরাং তাঁহার উপলব্ধি করিতে হইলে কোষ বা আবরণগুলি বাদ দিয়া করা যায় না। কাযেই মন, প্রাণ সহযোগে আত্মার অনুভব হয়। জীবই ইন্দ্রিয়গ্রামসহ মৃত্যুর পর দেহান্তর আশ্রয় করেন। সুতরাং কর্ম্মজনিত সংস্কারও মনের সহিতই যায়। সেই সংস্কারবশে পরদেহে জীব কার্য্য করিতে থাকে। অতএব জীবের নিজ নিজ কর্ম্মই অদৃষ্ট বা ভাগ্যরূপে পরদেহে সুখ দুঃখের নিয়ামক হয়। সুতরাং তজ্জন্য জগতে বৈষম্য সাধিত হয়। ঈশ্বরের পক্ষপাতিত্ব কিছুমাত্র নাই। অনন্ত কাল ধরিয়া সংসার-সাগরে জন্মমৃত্যু-প্রবাহ চলিতেছে। যে দিন সমগ্র বাসনা পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইবে, সেই দিন জীবের জন্ম মৃত্যু ধারা নিবৃত্তি হইবে। স্বর্গাদি স্থান হইতেও পতন আছে, গীতাদি শাস্ত্র দেখুন, কথা সত্য কিনা। সুতরাং স্বর্গে গেলেও জন্ম-মৃত্যু-প্রবাহ হইতে নিস্তার নাই। ইহাই হিন্দু-শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত। সুতরাং জগতের সুখ দুঃখ বৈষম্য দেখিয়া ভগবানের প্রতি নিষ্ঠুরতার যে শঙ্কা হইতেছিল, তাহা আর হওয়া অসম্ভব। বরং তিনি জীবের দুঃখ-নিবৃত্তি ও মুক্তির জন্য দেহ ধারণ করিয়া যুগে যুগে কত শত বার অবতীর্ণ হইয়া পতিত জীবকে হাত ধরিয়া ভবপারে লইয়া যাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। আরও কত শত বার করিবেন। প্রকৃত কাতর জনের প্রাণ-স্পর্শী ক্রন্দনে তিনি বিগলিত হইয়া দুঃখ দূর করিতে ছুটিয়া আইসেন। তাঁর দয়ার সীমা নাই, তুলনা নাই, বর্ণনার ভাষা নাই।

(ক্রমশঃ)

আত্মকথা।

লেখক—শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ বসু।

(গীত ; রামপ্রসাদী সুর।)

১। সঁপেছি মন প্রাণ তাঁরে,
আর কি ভয় করিব কারে ?
২। মৃত্যুঞ্জয় নাইক আমার কি ভয় আর সেই যম রাজারে,
আমার অন্তরে যা গাঁথা আছে যম দেখে তা মরে ডরে।
৩। জন্মিলে মরিতে হবে, মরিলেও জনম পরে,
তবে কেন এত ঘোর চিন্তা, জীবগণের হয় এ সংসারে ?
৪। ভবের হাটে বেচা কেনা কর্ত্তে গিয়ে—ভুলনারে,
(ওরে) কিনিতে দুর্গার নাম, দুর্গতি যে নাশ করে।
৫। বিকি দেহ কিনি সে নাম দান কর তায় রসনারে,
অতি উপাদেয়, পরিতৃপ্ত হবে যারা দেহের ভিতরে।
৬। দেহের মধ্যে সুজন যে জন, তার ঘরেতে ঘর কর রে,
দিয়ে ধৈর্য্য-খোঁটা ধর্ম্ম-বেড়া, রাখনা চৌদিকে ঘিরে।
৭। সুখ দুঃখ ভেবে সমান, মনের আগুন নিবাও না রে,
(ওরে) আশা বায়ুগ্রস্ত হ'য়ে ঘুরনারে দ্বারে দ্বারে।
৮। দুর্গা নামে ঘরে বসে যা চাবে মন তাই পাবে রে,
ভক্তি-দড়ায় বান্ধি তাঁরে, আস্থা রাখ হৃদ্-মাঝারে।
৯। অনিবার জপ কর মন, দেহ বিসর্জ্জন কর রে,
(ওরে) বদ্ধ হ'য়ে মায়াজালে শ্যামার চরণ ভুলনা রে।
১০। দুর্গা শ্যামা একই ভাবো, তথা কৃষ্ণ দিগম্বরে,
(ওরে) ক'র না মন দ্বেষা-দ্বেষি, সে সব কেবল রূপান্তর রে।
১১। জয়কালী জয়কালী বল, মনের কালি থাকবে নারে,
(ওরে) পাগল বলে বলুক সবে, তোমার বা তায় কি হবে রে।
১২। ভাল মন্দ দুটো কথা আছে ত জগৎ মাঝারে,
তবে যা ভাল তাই করাই ভাল, জপ কর সেই সারাৎসারে।
১৩। ধনে মানে মত্ত হ'য়ে ভুল না মন শ্রীহরিরে,
(ওরে) সে ধনেতে ধনী হ'লে, পারবি যেতে ভবপারে।

১৪। ব'য়ে যেন যায় না বেলা এই ভবেতে খেলা করে,
(ওরে) ওরে মায়ের কোলে করবি খেলা তার চেয়ে আর কি বাড়ারে।
১৫। মনের মতন মন তুই আমার, হতে যদি পারিস রে,
তবে এ রঙ্গভূমির খেলা সাঙ্গ কর্ত্তে হবে যত্ন করে।
১৬। বারংবার ডাকিস না ভাই, আসিতে এই সংসারে,
(ওরে) মায়ের ছেলে মায়ের কোলে, রাখিস্ এই শ্রীকৃষ্ণেরে॥

তিনটী "দ"।

লেখক—শ্রীবিধুভূষণ শাস্ত্রী বেদান্তভূষণ ভক্তিরঞ্জন।

বৃহদারণ্যকোপনিষদে এই দেখিতে পাওয়া যায় যে মনুষ্যের তিনটি গুণ শিক্ষা করা কর্ত্তব্য, যথা—দম, দান ও দয়া—

এতৎ ত্রয়ং শিক্ষেৎ দমং দানং দয়ামিতি।

৫ অধ্যায়ে ২ ব্রাহ্মণে ৩ মন্ত্র।

এই তিনটি গুণ থাকিলে মনুষ্য পরমার্থলাভ করিতে পারেন। মনুষ্য-জীবনের সার্থকতা সম্পাদন করিতে হইলে এই তিনটি গুণ শিক্ষা করা কর্ত্তব্য। দুর্লভ মানব জন্মলাভ করিয়া যদি উক্ত তিনটি গুণ না থাকিল ও পশু-জীবনের ন্যায় ব্যয়িত হইল তাহা হইলে মনুষ্য-জীবনের প্রয়োজন কি? আহার, নিদ্রা ভয় ও মৈথুনে আমরা পশুদিগের সদৃশ—

আহার-নিদ্রা-ভয়-মৈথুনঞ্চ
সামান্যমেতৎ পশুভির্নরাণাম্।
ধর্ম্মো হি তেষামধিকো বিশেষো
ধর্ম্মেণ হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ।

উত্তর গীতায়াং ৪৪।

সুতরাং এই সকল বৃত্তিতে আমরা পশু হইতে যত পৃথক থাকিব, যত আমাদের ইন্দ্রিয় দমন থাকিবে, ততই আমাদের মনুষ্যত্ব। আহার, তিন প্রকার—সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক; "নিরামিষ" সাত্ত্বিক, "সামিষ" রাজসিক এবং সুরা ও মাংসাদি যুক্ত হইলে তাহাকে 'তামসিক' আহার কহ গিয়া থাকে।

সাত্ত্বিকা যপযজ্ঞাদ্যৈর্নৈবেদ্যৈশ্চ নিরামিষৈঃ।
রাজসী বলিদানেন নৈবেদ্যৈঃ সামিষৈস্তথা॥
সুরামাংসাদ্য আহারৈর্জপযজ্ঞৈর্বিনা তথা।
বিনামন্ত্রৈস্তামসীস্যাৎ কিরাতানাস্তু সম্মতাঃ॥

ভবিষ্যপুরাণে।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়ও আহার ত্রিবিধ বলিয়াছেন—

আয়ুঃ-সত্ত্ববলারোগ্য-সুখপ্রীতিবিবর্দ্ধনাঃ।
রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরাহৃদ্যা আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ॥
কট্বম্ল-লবণাত্যুষ্ণ-তীক্ষ্ণরূক্ষ-বিদাহিনঃ।
আহারা রাজসস্যেষ্টা দুঃখশোকাময়প্রদাঃ॥
যাতযামং গতরসং পূতিপর্য্যুষিতঞ্চ যৎ।
উচ্ছিষ্টমপিচামেধ্যং ভোজনং তামস-প্রিয়ম্॥

১৭ অধ্যায়ে ৮—১০।

অন্যত্র—

উচ্ছিষ্টমবশিষ্টং বা পথ্যং পূতমভীপ্সিতম্।
ভক্তানাং ভোজনং বিষ্ণোর্নৈবেদ্যং সাত্ত্বিকং মতম্।
ইন্দ্রিয়-প্রীতিজননং শুক্রশোণিত-বর্দ্ধনম্।
ভোজনং রাজসং শুদ্ধমায়ুরারোগ্যবর্দ্ধনম॥
অতঃপরং তামসানাং কট্বম্লোষ্ণবিদাহিনম্।
পূতিপর্য্যুষিতং জ্ঞেয়ং ভোজনং তামসপ্রিয়ম্॥

কল্কীপুরাণে ১১ অধ্যায়ে।

তন্ত্রে কথিত হইয়াছে যে পঞ্চমকার ব্যতীত মুক্তিলাভ হয় না। পঞ্চমকার যথা—মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা ও মৈথুন—

মদ্যং মাংসং তথা মৎস্যো মুদ্রামৈথুনমেব চ।
পঞ্চতত্ত্বমিদং দেবি! নির্ব্বাণমুক্তিহেতবে॥

গুপ্তসাধনতন্ত্রে ৭ম পটলে।

কিন্তু এই সকল শব্দের সাধারণ অর্থ-বাচ্য দ্রব্য মুক্তির হেতু নহে; উহাদের প্রকৃত অর্থ এই—

যদুক্তং পরমং ব্রহ্ম নির্ব্বিকারং নিরঞ্জনম্।
তস্মিন্ প্রমদনজ্ঞানং তন্মদ্যং পরিকীর্ত্তিতম্॥
মাং সনোতি হি যৎ কর্ম্ম তন্মাংসং পরিকীর্ত্তিতম্।
মৎ সমানং সর্ব্বভূতে সুখদুঃখাদি যৎ প্রিয়ে!

ইতি যৎ সাত্ত্বিকং জ্ঞানং তন্মৎস্যং পরিকীর্ত্তিতম্ ।
সৎসঙ্গেন ভবেন্মুক্তিরসৎসঙ্গেন বন্ধনম্ ।
নাসৎসঙ্গমুদ্রণং যৎ তন্মুদ্রা পরিকীর্ত্তিতা ॥
কুলকুণ্ডলিনী শক্তির্দেহিনাং দেহধারিণি !
তয়া শিবস্য সংযোগো মৈথুনং পরিকীর্ত্তিতম্ ॥

তন্ত্রসারে ।

মহাদেব পার্ব্বতীকে কহিয়াছিলেন, নির্ব্বিকার নিরঞ্জন ব্রহ্মে যে প্রমদ (আনন্দ) জ্ঞান, তাহাকে 'মদ্য' কহে ; হে প্রিয়ে ! যে কর্ম্মদ্বারা পরমেশ্বরকে জানা যায়, উহাকে 'মাংস' কহে ; সর্ব্বভূতে সুখদুঃখাদিকে আমার সমান যে সাত্ত্বিক জ্ঞান, তাহাকে 'মৎস্য' কহে ।

সৎসঙ্গে মুক্তি ও অসৎ সঙ্গে বন্ধন এবং অসৎ সঙ্গে মুদ্রন (আবদ্ধ) না হওয়াকে 'মুদ্রা' কহিয়া থাকে ।

হে মানবশরীরধারিণি ! কুলকুণ্ডলিনী শক্তির সহিত শিবের মিলনকে 'মৈথুন' কহা গিয়া থাকে ।

মদ্যপান করিলে যদি মনুষ্য সিদ্ধিলাভ করে তাহা হইলে সমুদায় মদ্যপায়ী পামরগণ সিদ্ধিলাভ করুক । মাংস ভক্ষণ করিলে যদি মনুষ্য পুণ্যগতি লাভ করে তাহা হইলে সকল মাংসাশী পুণ্যবান্ হউক ; যদি স্ত্রীসম্ভোগ করিলে মুক্তিলাভ করা যায় তাহা হইলে পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি জন্তুগণ স্ত্রীসম্ভোগ করিয়া মুক্ত হউক—

মদ্যপানেন মনুজো যদি সিদ্ধিং লভেত বৈ ।
মদ্যপানরতাঃ সর্ব্বে সিদ্ধিং গচ্ছন্তু পামরাঃ ॥
মাংসভক্ষণমাত্রেণ যদি পুণ্যা গতির্ভবেৎ ।
লোকে মাংসাশিনঃ সর্ব্বে পুণ্যভাজো ভবন্তু হি ॥
স্ত্রীসম্ভোগেন দেবেশি ! যদি মোক্ষং ভবতি বৈ ।
সর্ব্বেঽপি জন্তবো লোকে মুক্তাঃ স্যুঃ স্ত্রীনিষেবনাৎ ॥

কুলার্ণবতন্ত্রে ২ উল্লাসে ।

সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক খাদ্যানুসারে লোকের তদ্রূপ প্রবৃত্তি হইয়া থাকে । রাজসিক ও তামসিক দ্রব্য আহারে পরমায়ু হ্রাস হইয়া থাকে । সাত্ত্বিক দ্রব্য আহার করিয়া মুনিগণ তজ্জন্য দীর্ঘজীবী হইতেন । পীড়াগ্রস্ত জীব ভক্ষিত হইলে তাহার মাংসে ভোক্তার রক্ত দূষিত করে, সুতরাং তাহা হইতে পীড়া হইয়া থাকে । শরীরে যত সত্ত্ব গুণ থাকিবে, তত সাত্ত্বিক আহারে

প্রবৃত্তি হইবে। বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণ বসুদেব শব্দে অভিহিত হইয়া থাকেন; যেহেতু সত্ত্বগুণে পরম পুরুষ বাসুদেব প্রকাশ পাইয়া থাকেন—

সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেব-শব্দিতং

যদীয়তে তত্র পুমানপাবৃতঃ।

শ্রীভাগবতে ৪।৩।২৩।

সত্ত্ব গুণ ভিন্ন দম গুণ-প্রাপ্তি সম্ভবপর নহে। বাহ্যেন্দ্রিয় নিগ্রহকে "দম" কহা যায়।

বাহ্যেন্দ্রিয়নিগ্রহঃ দমঃ।

বেদান্তসারে।

অথবা—

কুৎসিতাৎ কর্ম্মণো বিপ্র! যচ্চিত্তবিনিবারণম্।
স কীর্ত্তিতো দমঃ প্রাজ্ঞৈঃ সমস্তত্ত্বদর্শিভিঃ॥

পদ্মপুরাণে—ক্রিয়াযোগসারে ১৬।৯২।

হে বিপ্র! কুৎসিত কর্ম্ম হইতে যে চিত্তের নিবারণ সমুদয় তত্ত্বদর্শী পণ্ডিতগণ তাহাকে "দম" কহিয়াছেন।

অন্যত্র—

আশ্রমেষু চতুর্ষ্বাহুর্দমমেবোত্তমং ব্রতম্।
তস্য লিঙ্গং প্রবক্ষ্যামি যেষাং সমুদয়ো দমঃ॥
ক্ষমা-ধৃতিরহিংসা চ সমতা সত্যমার্জ্জবম্।
ইন্দ্রিয়াভিজয়ো ধৈর্য্যং মার্দ্দবং হ্রীরচপলম্॥
অকার্পণ্যমসংরম্ভঃ সন্তোষঃ শ্রদ্দধানতা।
এতানি যস্য রাজেন্দ্র! স দান্তঃ পুরুষঃ স্মৃতঃ॥
কামো লোভশ্চ দর্পশ্চ মন্যুর্নিদ্রা বিকত্থনম্।
মানং ঈর্ষা চ শোকশ্চ নৈতদ্দান্তো নিষেবতে॥
অজিহ্মমশঠং শুদ্ধমেতদ্দান্তস্য লক্ষণম্।
অলোলুপস্তথাল্পেপ্সুঃ কামানামবিচিন্তিতা॥
সমুদ্র-কল্পঃ পুরুষঃ স দান্তঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥

মহাভারতে—উদ্‌যোগপর্ব্বণি ৬৩ অধ্যায়ে

মহাত্মা বিদুর দুর্য্যোধনকে কহিয়াছিলেন যে হে রাজেন্দ্র! চারি আশ্রমেই দমকে উত্তম ব্রত বলিয়া পণ্ডিতগণ বর্ণন করিয়াছেন। দম যে সকল গুণের উৎপত্তির হেতু হয় তৎ সমুদয়ের লক্ষণ কহিতেছি।

যাঁহার ক্ষমা, ধৃতি, অহিংসা, সমতা, সত্য, সারল্য, ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ, ধৈর্য্য, প্রিয়-ভাষিতা, অকার্য্য-নিবৃত্তি, অচঞ্চলতা, অকার্পণ্য, অক্রোধ, সন্তোষ এবং শ্রদ্ধালুতা থাকে তাঁহাকেই দান্ত কহা গিয়া থাকে।

দান্তপুরুষ কাম, লোভ, দর্প, ক্রোধ, নিদ্রা, আত্মশ্লাঘা, অভিমান, ঈর্ষা এবং শোক এ সমুদায় সেবা করেন না।

অক্রুরতা, অশঠতা এবং শুদ্ধতা ইহাই দান্তের লক্ষণ। যে ব্যক্তি অলোলুপ, অল্পপ্রার্থী, কাম সমুদায়ের অবিচিন্তনকারী এবং সমুদ্রের ন্যায় গম্ভীর, তিনিই দান্ত বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হন।

মহাত্মা বিদুর পুনরায় কহিয়াছিলেন—

ইহ নিঃশ্রেয়সং প্রাহুর্ব্বৃদ্ধা নিশ্চিতদর্শিনঃ।
ব্রাহ্মণস্য বিশেষেণ দমোধর্ম্মঃ সনাতনঃ॥
তস্য দানং ক্ষমা সিদ্ধির্যথাবদুপপদ্যতে।
দমোদানং তপো জ্ঞানমধীতঞ্চানুবর্ত্ততে॥
দমস্তেজোবর্দ্ধয়তি পবিত্রং দমউত্তমম্।
বিপাপ্মা বৃদ্ধতেজাশ্চ পুরুষো বিন্দতে মহৎ॥
ক্রব্যাদ্ভ্যইবভূতানামদান্তেভ্যঃ সদা ভয়ম্।
তেষাঞ্চপ্রতিষেধার্থং ক্ষত্রং সৃষ্টং স্বয়ম্ভুবা॥

মহাভারতে—উদ্যোগ-পর্ব্বণি ৬৩ অধ্যায়ে

বিদুর কহিয়াছিলেন—নিশ্চিতদর্শী পণ্ডিতগণ এই সংসারে দমগুণকেই পরম শ্রেয়ঃ-সাধন কহিয়া থাকেন; বিশেষতঃ ব্রাহ্মণের পক্ষে দম সনাতন ধর্ম্ম। দমশালী ব্যক্তির দান, ক্ষমা ও সিদ্ধি প্রকৃতরূপে উৎপন্ন হয়। দম, দান, তপস্যা, জ্ঞান ও অধ্যয়নের অনুবর্ত্তন এবং তেজের সংবর্দ্ধন করে। দমই উত্তম পবিত্র বস্তু। দম-প্রভাবে মনুষ্য বিগত-পাপ এবং সমৃদ্ধতেজা হইয়া পরম পদার্থ লাভ করেন।

রাক্ষস হইতে প্রাণিগণের যেরূপ ভয় হয়, অদান্ত লোকসকল হইতেও সর্ব্বদা সেইরূপ ভয় হইয়া থাকে; তাহাদিগের দমন নিমিত্তই ব্রহ্মা ক্ষত্রিয়ের সৃষ্টি করিয়াছেন।

সনৎ সুজাত মুনি মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকে কহিয়াছিলেন—

ধর্ম্মশ্চ সত্যঞ্চ দমস্তপশ্চ
অমাৎসর্য্যং হ্রীস্তিতিক্ষানসূয়া।
যজ্ঞশ্চ দানঞ্চ ধৃতিঃ শ্রুতঞ্চ
ব্রতানি বৈ দ্বাদশ ব্রাহ্মণস্য॥ ২০॥
যস্ত্বেতেভ্যঃ প্রভবেদ্দ্বাদশেভ্যঃ
সর্ব্বামপীমাং পৃথিবীং স শিষ্যাৎ।
ত্রিভির্দ্বাভ্যামেকতো বার্থিতো য
স্তস্য স্বমস্তীতি স বেদিতব্যঃ॥ ২১॥
দমস্ত্যাগোঽপ্রমাদশ্চ এতেষ্বমৃতমাহিতম্।
তানি সত্য মুখাস্যাহুর্ব্রাহ্মণা যে মনীষিণঃ॥ ২২॥

দমোহষ্টদশগুণঃ প্রতিকূলং কৃতাকৃতে।
অনৃতঞ্চাভ্যসূয়াচ কামার্থৌচ তথা স্পৃহা ॥ ২৩ ॥
ক্রোধঃ শোকস্তথাতৃষ্ণা লোভঃ পৈশুন্যমেব চ।
মৎসরশ্চ বিহিংসাচ পরিতাপস্তথা রতিঃ ॥ ২৪ ॥
অপস্মারশ্চাতিবাদস্তথা সম্ভাবনাত্মনি।
এতৈর্বিমুক্তো দোষৈর্যঃ স দান্তঃ সদ্ভিরুচ্যতে ॥ ২৫ ॥

ঐ ঐ ৪৩ অধ্যায়ে।

মহারাজ! ধর্ম্ম (বর্ণাশ্রম নিয়ত সন্ধ্যা উপাসনাদি), সত্য (হিংসা ব্যতিরেকে যথার্থ সম্ভাষণ), দম (জিহ্বা ও উপস্থাদির নিগ্রহ), তপস্যা (কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণাদি), অমাৎসর্য্য (পরগুণে অসহিষ্ণু না হওয়া), হ্রী (লজ্জা), তিতিক্ষা (ক্রোধের কারণ উপস্থিত হইলেও ক্রুদ্ধ না হওয়া), অনসূয়া (পরগুণে দোষাবিষ্কার না করা), যজ্ঞ (জ্যোতিষ্টোমাদি), দান (বহির্ব্বেদি সংবিভাগ), ধৃতি (অত্যন্ত আপদেও ব্রতাদি ত্যাগ না করা) এবং শ্রুত (অর্থগ্রহণ সহিত বেদাধ্যয়ন) এই দ্বাদশটি ব্রাহ্মণের ব্রত। ২০।

যিনি এই দ্বাদশ গুণের প্রভু হইতে পারেন, সেই সকল গুণসম্পন্ন ব্রহ্মবিৎ পণ্ডিতগণ সমুদায় পৃথিবী শাসন করিতে সমর্থ হন। যে ব্যক্তি এই গুণ সকলের মধ্যে তিন, দুই কিম্বা একটিরও অধিকারী হইতে পারেন, তাঁহাকে ঐশ্বর্য্যশালী বলিয়া জ্ঞান করা কর্ত্তব্য। ২১।

দম, ত্যাগ ও অপ্রমাদ এই তিনটী অমৃত অর্থাৎ মুক্তির আধার, মনীষী ব্রাহ্মণগণ সে গুলিকে সত্যমুখ বলিয়া বর্ণন করেন অর্থাৎ সত্যপ্রধান হইলেই এ সমুদায় ফলসাধন করিয়া থাকে। ২২।

দম অষ্টাদশ গুণ বিশিষ্ট। কৃত ও অকৃত কর্ম্মে প্রতিকূলতা অর্থাৎ বৈদিক কর্ম্মে অশ্রদ্ধা এবং উপবাস ব্রতাদি কর্ম্মে ভোজনের লালসা, মিথ্যা, অভ্যসূয়া, কাম, অর্থ (ধন অর্জ্জনের জন্য অতি যত্ন), স্পৃহা (ধনাদিতে অভিলাষ), ক্রোধ, শোক, তৃষ্ণা, লোভ পৈশুন্য (পরদোষ বর্ণনে তৎপরতা), মাৎসর্য্য, বিহিংসা, পরিতাপ, অরতি (সৎ ক্রিয়াতে অভিলাষশূন্যতা), অপস্মার (কর্ত্তব্যকর্ম্মের বিস্মরণ), অতিবাদ (অন্যের গ্লানি) এবং আত্মাতে সম্ভাবনা (মহত্ত্ব বুদ্ধি) এই সমস্ত দোষ হইতে যে ব্যক্তি পরিবর্জ্জিত, তাঁহাকেই পণ্ডিতগণ দান্ত বলিয়া থাকেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীহরিঃ।

(১৮৪৫ সালের ২০ আইন্ মতে রেজেষ্টীকৃত)

হিন্দু-পত্রিকা।

৩১শ বর্ষ, ৩১শ খণ্ড
৮ম সংখ্যা।

অগ্রহায়ণ।

১৩৩১ সাল।
১৮৪৬ শকাব্দাঃ

সুখ।

লেখক—শ্রীপশুপতি সরকার।

জগতের সর্ব্ব স্থান খুঁজিয়া খুঁজিয়া
না পাইয়া সুখ
অনিবার দুঃখে সদা কাঁদিয়া কাঁদিয়া
ফাটে মোর বুক।
কবি বলে পার যদি বাসনা দুর্ব্বার
করিবারে দূর
দেখিবে বিমল সুখে হৃদয় তোমার
হবে ভরপুর।

রবীন্দ্রনাথ।

প্রতিভার মূর্ত্তি ওগো স্বভাবের কবি,
প্রদীপ্ত ভাস্কর সম সুবর্ণ কিরণে
মুহূর্ত্তেক মধ্যে তুমি আলোকিয়া সবি
উদিলে ভারত-নভে প্রসন্ন-আননে।

"মানসী" প্রতিমা গড়ি হৃদয়-নিকুঞ্জে
সজ্জিত 'নৈবেদ্য'-ডালা 'গীতাঞ্জলি' সনে
"গীতিমাল্য" রবি আর সুপ্রসূন-পুঞ্জে
দিয়েছ মায়ের পদে পুলকিত মনে।

তোমার 'সোণার তরি' বঙ্গ-ভাষা-সরে
আনন্দ-হিল্লোলে ভাসে তুলিয়া লহরী,
'খেয়া'য় করিছ পার মানব-নিকরে
ও পারের 'গান' গেয়ে বিমোহিত করি।

মায়ের পুজারী তুমি, তুমি কর্ণধার,
তাই আজি বিরাজিছ অন্তরে সবার।

অতৃপ্তি।

অসন্তোষ নর হয় না সন্তুষ্ট পেলে ধরার ধনরাশি,
স্বল্পে তুষ্ট সেই জন মুখখানি যার সদা হাসি হাসি।
অসন্তোষ-অগ্নি গ্রাসিলে ধরণী মিটেনা তাহার ক্ষুধা,
স্বল্প তোয়ে তুষ্ট দ্রুম-দল বিতরে সবে ফল-সুধা।

মহাদ্রুম।

নীরবে নিয়ত ওগো মহাদ্রুম কি তব সাধনা
দিবা-যাম কার ধ্যানে রত তুমি ডুবায়ে আপনা?
বিবশা নারীর মত কভু ভূমে লুটে লুটে প'ড়ে
অন্তর্লীন হৃদি-ব্যথা জানাতেছ কারে এত ক'রে?

আঁখি দিয়ে গ'লে প্রেম বুক বেয়ে ঝ'রে ঝ'রে পড়ে,
মহাযোগে সমাসীন যোগী সম আছ যুক্তকরে,
আত্মহারা যোগী ওগো মহাযোগে আত্মা করি লীন
জগতের লাভ-ক্ষতি পরিহরি রবে কতদিন?

কত ঝড় কত ঝঞ্ঝা—তবু তুমি অচল অটল,
ধন্য আরাধনা তব এ ধরাতে বড়ই বিরল,
এই দীর্ঘ তপস্যায়, তাঁর সহ হবে পরিচয়
তাই তপ ত্যজ নাই, অনুক্ষণ প্রেমার্দ্র তন্ময়।

তব সম স্থির থাকি সংসারের তীব্র যাতনায়
তাঁর পথে যাব কবে বাধা বিঘ্ন ঠেলি অন্তরায়।

কালী-পূজা।

লেখক—শ্রীনরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ, বি, টি।

কালী আদ্যাশক্তি গুণময়ী প্রকৃতি। এ জগতে পুরুষ ও প্রকৃতি ব্যতীত আর কিছুই নাই। পুরুষ প্রকৃতি-হীন হইলে, জড়-ব্যতীত আর কিছুই নহে। তাই শবরূপী (নির্ব্বিকার ও ক্রিয়ারহিত) শিব চিরচাঞ্চল্যময়ী প্রকৃতির চরণ-তলে নিপতিত। আবার জড়-পুরুষের আশ্রয়-ব্যতীত প্রকৃতি আত্ম-প্রকাশে অশক্তা। তাই কালী-মূর্ত্তিতে শক্তি-রূপিণী প্রকৃতির একমাত্র অবলম্বন শবরূপ (জড়) শিব। ইহা কোনও উগ্র-প্রকৃতি রমণীর পতি-নির্য্যাতনের চিত্র নহে,

এই প্রকট প্রকৃতি বিভিন্নরূপে এই বিশাল বিশ্বের প্রত্যেক স্থানে প্রত্যেক অবস্থায় ও প্রত্যেক বস্তুতে বিরাজমান। যিনি সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া ওতঃপ্রোত ভাবে বিজড়িত আছেন, ক্ষুদ্রবুদ্ধি মানব স্বীয় সসীম বুদ্ধির সাহায্যে এমন কোন্ একটিমাত্র আবরণের কল্পনা করিতে পারে, যদ্দ্বারা এই অনন্তরূপিণী চিরপরিবর্ত্তনময়ী প্রকৃতিকে আবৃত করা যায়? তাই প্রকৃতি-রূপিণী কালী বিবস্ত্রা। দিগাবরণ-ব্যতীত বিশ্ব-জননীর অন্য আবরণ বা বসন অসম্ভব। তাই মা আমার দিগম্বরী; উলঙ্গিনী নহেন। যে দেশ বস্ত্র-শিল্পে সর্ব্বাপেক্ষা উন্নতি লাভ করিয়াছিল, যে দেশে ঘরে ঘরে চরকা বিরাজ করিত, সে দেশের লোকের উপাস্য দেবতা উলঙ্গ কেন? যে দেশে স্ত্রীলোক স্বভাবতঃ লজ্জাশীলা ও বিনয়াবনতা, সেই দেশের উপাস্যা দেবী এরূপ উগ্রা নগ্না কেন? কেনই বা সলজ্জা কুলবধূগণ ভক্তিভাবে এই উলঙ্গিনীর উপাসনা করেন? অবশ্য ইহার মধ্যে রহস্য আছে, যাহা সাধারণ লোকের অজ্ঞাত। অন্য সব দেব দেবীর পরিধেয় বস্ত্র আছে, কেবল কালীর বেলায় কি দেশের লোক তাঁহাকে বস্ত্র দিতে ভুল করিল এবং যুগ-যুগান্তর ধরিয়া সকলেই সেই ভুলে মত্ত রহিল, সংশোধনের কোনও চেষ্টা বা কল্পনা মনেই আনিল না, না, এই দলাদলির দেশে কালী কি এক ঘ'রে হইয়াছেন? অতি বড় শত্রুর বা দীন-হীন পথের ভিখারীরও ছিন্নবস্ত্র থাকে, তবে এ উপাস্য জননী-মূর্ত্তির এমন দুর্দ্দশা কেন? মহাসমরের পর আজকালকার বস্ত্র-সমস্যার দিনে হইলে এরূপ রূপের কল্পনা হয়ত অস্বাভাবিক বা অসম্ভব বলিয়া মনে হইত না, কিন্তু এদেশে কালী বহুদিন হইতে পূজিতা। কাজেই ইহার মধ্যে কোনও গূঢ় অর্থ অবশ্যই আছে এবং সে অর্থের কিঞ্চিৎ আভাষ উপরে দেওয়া হইয়াছে।

যোগিগণের মতে কালী মূলাধারবাসিনী কুণ্ডলিনী শক্তি। এই শক্তি সহজে আপনাকে প্রকাশ করেন না। ইনি নিদ্রিতাবস্থায় আছেন। সাধন দ্বারা ইহাকে জাগ্রত করিতে হয়। "মা জাগিলে একবার, ঘুম পাড়ান ভার।" তখন জীবের তত্ত্বজ্ঞান আপনিই জন্মে। ইহা গেল অন্তর্জ্জগতের কথা।

বাহ্যজগতে শক্তিরূপিণী কালী মূল প্রকৃতি। প্রকৃতির অসীম সৌন্দর্য্যের মধ্যে তিনটী বস্তু সর্ব্বদা বিরাজ করিতেছে,—সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়। প্রকৃতির বিশাল রাজ্যে প্রতিনিয়তই দৃশ্য ও অদৃশ্যভাবে সৃষ্টি স্থিতি ও লয় সাধিত হইতেছে। প্রকৃতির অলঙ্ঘ্য নিয়মে এ তিনটী ঘটিবেই। ইহা রোধ করিবার ক্ষমতা কাহারও নাই। তাই প্রকৃতিরূপিণী কালীতে ঐ তিনটী দৃশ্যই পরিস্ফুট

কটিতে সৃষ্টি, বক্ষে (স্তনদ্বয়ে) স্থিতি বা পালন এবং প্রকাশ্য লয় মুখে ও অদৃষ্ট লয় উদরে। মুখে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া লোকচক্ষুর অন্তরালে মায়ের উদরে অদৃশ্য-ভাবে বস্তুনিচয় পুনরায় সৃষ্টির উপযোগী হইতে থাকে। ধ্বংসের পর কি ঘটে, তাহা কেহই বলিতে পারে না। তাই গীতায় বিশ্বরূপ-বর্ণনে গীতাকার জীব অবারিত-বেগে পুরুষোত্তমের করাল-বদনে তীব্র স্রোতোবেগে ধ্বংসের জন্য প্রবেশ করিতেছে দেখাইয়াছেন; তাহার পর কি হয়, দেখাইতে পারেন নাই বা দেখান নাই।

সৃষ্টিতত্ত্ব গুহ্য। একাল যাবৎ কেহই সৃষ্টিতত্ত্বরূপরহস্য-যবনিকার উদ্ঘাটন করিতে পারেন নাই এবং কখনও পারিবেন বলিয়াও মনে হয় না। কেন, কোথায় বা কিরূপে সৃষ্টি হয়, তাহা চির-অপরিজ্ঞাত ও অন্ধকার-গুহায় নিহিত। ইহাই বুঝাইবার জন্য মায়ের অঙ্গে সৃষ্টিস্থান কটিবিলম্বিত ছিন্ন (দুর্জ্ঞেয় ও সূত্র-বিহীন) হস্ত দ্বারা আবৃত।

প্রকৃতির প্রত্যেক কার্য্যই নিয়মাধীন ও তাহাতে বিন্দুমাত্রও ব্যভিচার বা ব্যতিক্রম নাই। সর্ব্ব কার্য্যে ও বিষয়ে পূর্ণমাত্রায় সংযম পরিলক্ষিত হয়। তাই বিধিবিরুদ্ধ আচরণে স্ত্রী-স্বভাব-সুলভ লজ্জা বা সংযম জিহ্বা-দংশন দ্বারা জ্ঞাপিত হইয়াছে।

দিগন্ত-প্রতিধ্বনিত কলকলনাদ তাঁহার অট্টহাস্য। এই অট্টহাস্য মাত্রার তারতম্যানুসারে গগনবিদারী বজ্রনাদ হইতে শ্রুতির অগোচর ক্ষীণতর শব্দ মাত্রেই বিরাজমান।

এই অট্টহাস্যের কিঞ্চিৎ আভাষ পাঠক-পাঠিকা মাত্রেই (লক্ষ্য করিলে) অনুভব করিতে পারেন। ঘোর ঘন গর্জ্জনে বা নিশাশেষে উষার আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই যে অস্ফুট অব্যক্ত গুঞ্জন বিহঙ্গকূজন ও মানবাদি কণ্ঠনিঃসৃত ধ্বনি ব্যতীত আরও বহুবিধ ক্ষীণ ও অশ্রুত শব্দ মানবের অজ্ঞাতসারে নভো-মণ্ডলে ও ধরণী-বক্ষে উৎপাদিত হইয়া অনন্ত অম্বরে বিলীন হইতেছে; শ্রুত, অশ্রুত, জ্ঞাত, অজ্ঞাত সেই সমস্ত ধ্বনিই চিরনিনাদময়ী প্রকৃতিরূপিণী কালীর অট্টহাস্য মাত্র। এই অট্টহাস্য শ্রোতার মানসিক অবস্থানুসারে কখনও ভীষণ, কখনও মনোরম হয়। মায়ের উজ্জ্বল বদনে এই হাস্য-বিজলী চমকবৎ তীব্র ও উজ্জ্বল হইলেও সময়ে সময়ে বড়ই মনোরম বলিয়া বোধ হয়।

সাধারণতঃ কালীকে কালো করিয়া চিত্রিত করা হয়। কিন্তু কালীর বর্ণ বাস্তবিকই কি কালো? কালীর রূপের প্রকৃত স্বরূপ বর্ণনা আমাদের সাধ্য

নয়। তবে আভাষে যতদূর বলিতে পারি, বলিব ; বুদ্ধিমান পাঠক অনুমানে অনুভব করিয়া লউন। রাত্রির দুর্ভেদ্য অন্ধকার, বর্ষার পরিপূর্ণ নিবিড় জলদ-জাল, গভীর নির্ম্মল জলরাশি—এ সমস্তের যে বর্ণ, দুর্জ্ঞেয়া, কালরূপিণী, রহস্যময়ী কালীর বর্ণও তাই। দুর্বোধ্যতাই অন্ধকারের ন্যায় কালো। প্রকৃত-পক্ষে উল্লিখিত বস্তু কয়টির কোনটিই কালো নয়, অথচ সময়ে সময়ে ঠিক কালো বলিয়াই প্রতীয়মান হয়।

তাই বড় ধাঁধায় পড়িয়াই সাধক ৺রামপ্রসাদ লিখিয়াছেন, "কালরূপ অনেক আছে, এ বড় আশ্চর্য্য কালো।" সময়-বিশেষে হৃদয়-মন্দিরে উদিত হইলে এই কালরূপেরই জ্যোতিতে (মাতার অসিতবর্ণ-সন্তান-দর্শনের ন্যায়) হৃদয় পুলকে পূর্ণ হইয়া উঠে।

প্রকৃতির তিনটি নিত্যলীলার (সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের) সঙ্গে সঙ্গে কর্ম্মফল বিজড়িত। তাই মায়ের মূর্ত্তিতে দুষ্টের দমন বা পাপীর (প্রাকৃতিক নিয়ম-লঙ্ঘনকারীর) শাস্তি ও শিষ্টের পালন প্রকট রহিয়াছে। ভাল ও মন্দ লইয়াই সংসার। ভালর পুরস্কার ও মন্দের শাস্তি না হইলে সংসার (সৃষ্টি) রক্ষা হইত না। প্রকৃতির শাস্তি নিশ্চিত ও ভীষণ এবং বাসনাপূর্ণ জীবের পক্ষে সে শাস্তির দৃশ্য অসহ্য। তাই কালীর একদিকের হস্তে নিয়মভঙ্গকারীর জন্য খড়গ (শাস্তি) ও ছিন্নমুণ্ড (কুকর্ম্মের পরিণাম) ; সেইরূপ অপরদিকে প্রকৃতির সুসন্তানগণের জন্য বর ও অভয় বা পুরস্কার।

মায়ের হৃদয়োপরি দোদুল্যমান ভূষণ নর-মুণ্ড-মালা। অর্থাৎ প্রকৃতির মধ্যে যাহা সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর ও নিশ্চিত—যাহা সৃষ্টির আদিকারণ ও স্থিতির একমাত্র পরিণাম—সেই ধ্বংসই মালার এক একটি মুণ্ড। প্রকৃতির রাজ্যে সুন্দর, কুৎসিত, উচ্চ, নীচ, সাধু ও অসাধু সকলেরই এই একই গতি।

মায়ের সুদীর্ঘ কেশপাশ বায়ুভরে উড়িতেছে এই কেশপাশরূপ শক্তিসূত্র-রাজি অবলম্বন করিয়া মহাকাশবাসিনী অনন্ত শক্তিশালিনী প্রকৃতির সৃষ্টিরক্ষা-কারিণী শক্তি নিখিলবিশ্বে সঞ্চারিত হইতেছে। এই অক্ষয় অনন্তশক্তির একমাত্র আধার ব্যোমমণ্ডল (Ether).

সাধনার ফলে আরও অনেক সূক্ষ্মতত্ত্ব জ্ঞাত হওয়া যায়। কিন্তু যাঁহারা সাধনমার্গে ততদূর অগ্রসর হইতে পারেন নাই তাঁহারাও এ সমস্ত বিষয় একটু আলোচনা করিলেই বুঝিতে পারিবেন যে, হিন্দুর উপাস্য দেবতা কালী আদিম অসভ্যজাতির বর্ব্বরোচিত কল্পনা বা সাধনার ফল নহে। ইহা ন্যায়-দণ্ডধারিণী ত্রিগুণময়ী আদ্যাশক্তি প্রকৃতির মহাদর্শ বা সাধকের মহীয়সী মানসী মূর্ত্তি ॥

আদর্শ রমণী ও পুরুষ।

(সত্য ঘটনা অবলম্বনে লিখিত)

(লেখক—শ্রীবিধুভূষণ শাস্ত্রী, বেদান্তভূষণ ভক্তিরঞ্জন, F. T. S.)

আমার জ্ঞাতি মাধব কাকার মাতা নিরক্ষরা ছিলেন, কিন্তু তাঁহার পতিভক্তি ও আত্মনির্ভরতা অতুলনীয় ছিল। আমার জ্ঞান হইতে তাঁহার পতিকে অন্ধ দেখিয়াছিলাম। তিনি সেই অন্ধ স্বামী, নাবালক পুত্র ও দৌহিত্র লইয়া সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। ৬ বিঘা জমি মাত্র ছিল, তাহাও ভাগে বিলি ছিল। প্রাতে অন্ধ স্বামীকে বাড়ীর নিকট খালের ধারে যষ্টি ধরাইয়া শৌচে বসাইয়া দিয়া আসিতেন। শৌচের পর বাড়ীতে আনিয়া মুখ ধুইবার ব্যবস্থা করিয়া দিতেন। একটু বেলা হইলে নিজে ঝুড়ি লইয়া মাঠে গোময় কুড়াইতে যাইতেন। এক ঝুড়ি গোময় কুড়াইয়া তথা হইতে বাড়ী আসিয়া স্বামীকে স্নান করাইয়া জল খাওয়াইতেন। পরে পাক করিয়া স্বামী, পুত্র ও দৌহিত্রকে খাওয়াইয়া আপনি আহার করিতেন। মাধব কাকা গ্রামে ছাত্রবৃত্তি স্কুলে আমার সহিত পাঠ করিয়া পরে পাঁচপোয়া দূরবর্ত্তী বামনে গ্রামে মাইনর স্কুলের পাঠ শেষ করিয়া বৃত্তি পাইয়া কলিকাতা নর্ম্ম্যাল স্কুলে পাঠ সমাপন করিয়া পণ্ডিতি করিয়া বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহার মাতা বা "ছোট আয়ী" গোবরের ঘুঁটা দিয়া চাউল ভিন্ন অন্যান্য খরচ নির্ব্বাহ করিতেন। চাউলে কুলাইত কিনা তাহা জানিতাম না, কিন্তু কখনও কাহারও দ্বারস্থা হন নাই; কিন্তু সতীর এমনই প্রভাব, কিসে কি করিতেন তাহা কেহ জানিতে পারিতেন না। কাহারও বাটীতে কখনও পাক করিয়া জীবিকা-নির্ব্বাহ করিতেন না, আমার জ্যেষ্ঠ সহোদর সবজজ ছিলেন, কিন্তু বিনা আহ্বানে কখনও আমাদের বাটীতে প্রবেশ করিতেন না। আত্মসম্মান-জ্ঞান তাঁহার সম্পূর্ণ ছিল। অন্ধ স্বামীর সেবা করিতেন কিন্তু তজ্জন্য কখনও নিজ অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতে কিম্বা তাঁহার পতি-দেবতাকে কিম্বা ভগবানকে গালি দিতে শ্রবণ করি নাই। তিনি সদানন্দ-ময়ী ছিলেন; বার্দ্ধক্যবশতঃ স্বামীর ভীমরতিবশতঃ তাঁহাকে গালাগালি দিতেন, কিন্তু তিনি হাস্য করিতেন। মস্তক তৈলহীন, পরিধানে ছিন্নবস্ত্র, তথাপি যে তারাসুন্দরী সে "তারা সুন্দরী" ছিলেন। এরূপ পতিদেবতা রমণী যদি গ্রামে গ্রামে এক একটি থাকেন তাহা হইলে এই রোগ-শোক-জরা-অশান্তি-

সঙ্কুল সংসারই স্বর্গ হইত। স্বর্গ বলিয়া পৃথক স্থান নাই; যে স্থানে মনের শান্তি লাভ করা যায় তাহাই স্বর্গ—

"দৌর্ণ কাচিদথবাস্তি নিরূঢ়া
সৈব সা বলতি যত্র হি চিত্তম্॥"

নৈষধ-চরিতে ৫। ৫৭

এরূপ স্ত্রীও দেখিতে পাওয়া যায় যে স্বামী তাঁহাকে স্বর্ণে মণ্ডিত করিয়াছেন; কিন্তু একটু ত্রুটিতে তাঁহার সধবার চিহ্ন (হস্তের লৌহ প্রভৃতি) খুলিয়া "আমি রাঁড় হনু" "আমি রাঁড় হনু" "আমি রাঁড় হনু" বলিয়াছেন; তাঁহার পতির পীড়িত শয্যায় প্রতিদিন প্রাতে আসিয়া দ্বারে দাঁড়াইয়া নাকে কাপড় দিয়া জিজ্ঞাসা করিতেন "কেঁমঁন আঁচ?" যেন পত্নী নহে, পেত্নীর বাক্য! গৃহে প্রবেশও করিতেন না। অপরাধ যে পতির পায়ে কারবঙ্কল্-বশতঃ কার্ব্বলিক তৈলের গন্ধ! পদ্মিনী ছিলেন কিনা? পতি-দেবতার সহানুভূতিপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া, পতি পার্শ্ব-পরিবর্ত্তন করিয়া অশ্রু-বিসর্জ্জন করিতেন। হায়! নরক! তুমি কোথায়?

"অনুকূলং কলত্রং চেৎ ত্রিদিবেন হি কিং ততঃ।
প্রতিকূলং কলত্রং চেন্নরকেন হি কিং ততঃ॥"

পদ্মপুরাণে উত্তরখণ্ডে ২২৩ অধ্যায়ে (পুনা মুদ্রিত)

"The treasures of the deep are not so precious
As are the conceal'd comforts of a man
Locked up in a woman's love."

Middleton.

তজ্জন্য মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য তাঁহার প্রিয়তমা পত্নী মৈত্রেয়ীকে কহিয়াছেন যে পত্নী যে পতিকে ভালবাসেন, তাহা কি পতির সুখের জন্য? না, তাঁহার নিজের সুখের জন্য—

"ন বা অরে পত্যুঃ কামায় পতি প্রিয়ো ভবতি, আত্মনস্তু কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি।"

বৃহদারণ্যকোপনিষদি ২। ৪। ৫; ৪। ৫। ৬

তজ্জন্য জগতে নিঃস্বার্থময় প্রেম নাই; স্বার্থময় কাম আছে। কাম ও প্রেমের তারতম্য যথা—

"কাম প্রেম দোঁহাকার বিভিন্ন লক্ষণ।
লৌহ আর হেম যৈছে স্বরূপে বিলক্ষণ॥

আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি-বাঞ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম॥
কামের তাৎপর্য্য নিজের সম্ভোগ কেবল।
কৃষ্ণ-সুখ তাৎপর্য্য হয় প্রেম মহাবল॥

* * * *

অতএব কাম প্রেম বহুত অন্তর।
কাম অন্ধতম, প্রেম নির্ম্মল ভাস্কর॥"

শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে আদি লীলায়াং ৪র্থ পরিচ্ছেদে।

পাশ্চাত্য অমর কবি এই কামের দুর্গন্ধ পাইয়াছিলেন. তিনিও কাম ও প্রেমের তারতম্য দেখাইয়াছেন—

"Love comforteth, like sun-shine after rain,
But Lust's effect is tempest after sun.
Love's gentle spring doth always fresh remain,
Lust's winter comes ere summer half be done.
Love surfeits not ; Lust like a glutton dies.
Love is all truth, Lust full of forged lies.'

Shakspeare—Venus and Adonis.

কামে তৃপ্তি কিন্তু প্রেমে অতৃপ্তি—

"Other women
Cloy th' appetites they feed ; but she makes hungry
Where most she satisfies."

Ibid—Antony and Cleopatra, Act II, Scene II.

কাম মর্ত্ত্যের কিন্তু প্রেম স্বর্গের সম্পত্তি—

"Call it not love, for love to heaven is fled
Since sweating Lust on earth usurps his name."

Ibid—Venus and Adonis.

অন্য কোন পাশ্চাত্য কবি প্রেম সম্বন্ধে কহিয়াছেন—

"And love is still an emptier sound,
The modern fair one's jest ;*
On earth unseen ————"

Goldsmith—Hermit.

কামের গতি সোজা, স্বার্থের হানি হইলেই সাহারা মরুভূমির ন্যায় ধূ ধূ করিবে ; * কিন্তু প্রেমের গতি বক্র—

"অহেরিব গতিঃ প্রেম্ন স্বভাব কুটিলা ভবেৎ।
অত হেতো রহেতোশ্চ যূনোর্মান উদঞ্চতি॥"

উজ্জ্বল নীলমণৌ শৃঙ্গার-ভেদ-প্রকরণে ৪২।

এই ভাবকে পাশ্চাত্য অমর কবি এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন—

"The Course of true love never did run smooth."

Shakspeare—Mid Summer Nights' dream Act I, Scene I.

পূজ্যপাদ কবি শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ও প্রেম সম্বন্ধে উত্তম বর্ণনা করিয়াছেন, যথা—

"জ্বলে প্রাণ যাতনায়, জ্বলুক কি ক্ষতি তায়,
সে আমার সুখে থাক, নাহি সাধ অন্য কোন।"

অশ্রুমতী।

অন্য কোন গীত-রচনাকারী, যথা—

"যাতনা জানাও না তায়।
মম দুঃখ শুনি পাছে যাতনা সে পায়।" ইত্যাদি।

যে রমণী এই ভাব হৃদয়ে ধারণা করিতে পারিবেন, তিনি তাঁহার পতি-দেবতাকে ভাল বাসিতে পারিবেন, নচেৎ পারিবেন না।

ভালবাসা একটি মহাযজ্ঞ, স্বার্থ তাহার আহুতি, যিনি এই স্বার্থকে প্রেম-রূপ যজ্ঞে আহুতি দিতে পারিবেন, তিনিই তাঁহার পতিকে ভাল বাসিতে পারিবেন।

আবার কোথাও দেখিয়াছি যে পতি পত্নীকে নানারূপ মিষ্টান্ন ভোজন করাইয়া নানারূপে সেবা করিয়াছেন; পত্নী বহুদিন যাবৎ পতির পাদোদক গ্রহণ করিয়াছেন; কিন্তু সেই পাদোদক টক লাগিয়া মিষ্টান্ন-ভক্ষণকারী রসনা দ্বারা কহিয়াছিলেন "পরজন্মে তোমার সহিত যেন মিলন না হয়।" তিনিও আদর্শ রমণী নহেন কি? তবে তিনি প্রথমা স্ত্রীর ন্যায় নিরক্ষরা নহেন—

"মাতা যস্য গৃহে নাস্তি ভার্য্যা চ প্রিয়বাদিনী।
অরণ্যং তেন গন্তব্যং যথারণ্যং তথা গৃহম্॥"

ভারতে শান্তি পর্ব্বণি ১৪৩ অধ্যায়ে।

এ জীবনও বিড়ম্বনা—ইহাও নরক। যখন তিনি পরজন্মে মিলন চাহেন নাই তখন পরজন্মে মনোমত পতি লাভ করিয়া সুখী হইবেন সন্দেহ নাই। মনুষ্যের স্বভাব ও সতী পতিকে জন্ম জন্ম আশ্রয় করিয়া থাকেন—

"সতীব যোষিৎ প্রকৃতিঃ সুনিশ্চলা।
পুমাংস মভ্যেতি ভবান্তরেষ্বপি॥"

মাঘঃ ১। ৭২॥

কোন পাঠক মহোদয় যেন পত্নীকে এরূপ অলঙ্কার-মণ্ডিত করিয়া কিম্বা পাদোদক পান করিতে দেখিয়া আত্মহারা না হন। খুব সাবধানে যেন স্ত্রীর চরিত্রাভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করেন। কারণ—

পুরুষস্য ভাগ্যং স্ত্রিয়াশ্চরিত্রং।
দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ॥

চাণক্য-শতকে।

আর একটি আদর্শ রমণী—আমাদের গ্রামে একটি উগ্রক্ষত্রিয় নিরক্ষরা রমণী দেড় বৎসরের পুত্র লইয়া বিধবা হন। তাঁহার পিতা সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তি ছিলেন; বিধবা কন্যাকে নিজ গৃহে লইতে আসিয়াছিলেন। কন্যা অন্য লোকের ন্যায় কহিয়াছিলেন যে "পরমুখ-প্রত্যাশী হইয়া থাকিতে পারিব না"। অগত্যা পিতা স্বগৃহে প্রত্যাগমন করেন। কন্যা ভাচা ভানিয়া (১) পুত্র বিজয়কে পালন করিতেছেন; তাঁহার পুত্র বিজয় এক্ষণে তোড়কোণা গ্রামে ডাক্তার ঘোষের ম্যাট্রিকিউলেশন স্কুলে দ্বিতীয় শ্রেণীতে বিনা বেতনে প্রতিদিন এক ক্রোশ দূরে গমন করিয়া লেখা পড়া করিতেছে। তাহার হৃদয়ও পরোপকার-ব্রতে ব্রতী। স্কুলের বোর্ডিং গৃহে একটি মুসলমান ছাত্র পীড়িত ছিল; বিজয় তাহার জন্য নিজের গৃহের গাভীর দুগ্ধ লইয়া যাইত; তাহাতে একটি শিক্ষক মহোদয় মুসলমানের জন্য দুগ্ধ লইয়া যাইবার কারণ নিন্দা করিয়াছিলেন। বোধ হয় মুসলমানের গন্ধে দুর্গন্ধ বাহির হয়; তজ্জন্য তিনি নিন্দা করিয়াছিলেন। হিন্দু ও মুসলমানে এরূপ বিদ্বেষ করা যে কতদূর দূষণীয়, তাহা সহৃদয় শিক্ষক মহোদয় জানেন না। উভয় জাতির ধর্ম্মের মূল এক (২) তাহা শিক্ষক মহোদয় যদি জানিতেন তাহা হইলে তিনি কখনই নিন্দা করিতে পারিতেন না। ইহা তাঁহার শিক্ষার অভাব।

(১) অনেক সহরবাসী পাঠক "ভাচা ভানা" শব্দের অর্থ বুঝিবেন না, তাঁহাদের জন্য ঐ শব্দের অর্থ লিখিত হইতেছে—কুড়ি সেরে এক শলি, আট শলি কিম্বা এক মাপ ধান দিলে তাহার অর্দ্ধেক চারি শলি চাউল ধান্যদানকারীকে দিতে হয় এবং পারিশ্রমিক জন্য এক শলি ধান্য বা দশ সের চাউল যে ধান ভানে সে পায়। ইহাই ভাতের চাউলের নিয়ম; কিন্তু মুড়ির চাউল প্রস্তুত করিতে হইলে তাহার অন্য নিয়ম, কারণ তাহাতে অধিক পরিশ্রম। অবস্থাপন্ন লোকই ভাচা দিয়া থাকেন; নচেৎ নিজ নিজ বাটীতে চাউল প্রস্তুত করেন। ইহাই পল্লীগ্রামের প্রথা। এই বিবরণ বিজয় কহিল।

(২) এ বিষয়ে হিন্দু-পত্রিকায় ২৭ বর্ষে ১০ম সংখ্যায় "হিন্দু ও মুসলমান" প্রবন্ধে লিখিয়াছি। লেখক।

আত্ম-নির্ভরতা ইংরাজদিগের একটি মহৎ গুণ। তাঁহারা পরমুখ-প্রত্যাশী হইতে ভাল বাসেন না। আমার জ্যেষ্ঠ সহোদর যৎকালে ঢাকার সবজজ ছিলেন, তখন একটি ইংরাজ জজ আসিয়াছিলেন, তিনি দাদাকে নিজের পরিচয় দিয়া কহিয়াছিলেন যে তাঁহারা সাত ভাই ছিলেন। তিনি কনিষ্ঠ ছিলেন, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃগণ স্নেহবশতঃ তাঁহাকে বাটীতে থাকিতে কহিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি কহিয়াছিলেন "তোমাদের উপার্জ্জনের টাকা আমি খাইব কেন?" তজ্জন্য তিনি বিলাত হইতে জজ হইয়া আসিয়াছিলেন। কিন্তু বাঙ্গালীর গৃহে একটি অবস্থাপন্ন লোক হইলে অনেক দূরের সম্পর্কীয় ব্যক্তিগণও তাঁহার বাটীতে আসিয়া তাঁহার অন্নের উপর উপদ্রব করিয়া থাকেন, ইহা প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু পরমুখ-প্রত্যাশী হওয়া যে অতীব দুঃখজনক তাহা তাঁহারা একবারও ভাবেন না—

"পরাশা পরমং দুঃখং মরণঞ্চ দিনে দিনে ॥"

শ্রীদেবী-ভাগবতে ১। ১৫। ১২।

উক্ত রমণী যেরূপ পরোপকারী, তাঁহার পুত্র বিজয়ও তদ্রূপ। এরূপ পরোপকারী ব্যক্তিও অধুনাতন সময়ে বিরল! সকলেই পশুর ন্যায় নিজ সংসার লইয়াই ব্যস্ত, কিন্তু পরোপকার কত আনন্দদায়ক সে সুখভোগ ঐ পশুগণের ভাগ্যে ঘটে না—

"এতাবজ্জন্ম-সাফল্যং দেহিনামিহ দেহেষু।
প্রাণৈ রর্থৈর্ধিয়া বাচা শ্রেয় এবাচরেৎ সদা ॥"

শ্রীভাগবতে ১০। ২২। ৩৫

পরোপকার যদি সকাম হয় তাহা হইলেও কহিয়াছেন—

ন ধর্ম্মস্তাদৃশোঽন্যোস্তি ন চান্যো যস্য সাধকঃ।
নিরয়াপ্তিরপি শ্রেয় উপকৃত্যা পরস্য বৈ ॥"

স্কন্দপুরাণে আবন্ত্য খণ্ডে ৭৪। ৯।

ভরত ঋষি হরিণ-শাবককে নদীর জল হইতে উঠাইয়া আনিয়া নিজ আশ্রমে রাখিয়া লালন-পালন করিয়াছিলেন, মৃত্যুকালে অসহায় হরিণ-শাবকের বিষয় চিন্তা করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। মৃত্যুকালের চিন্তাবশতঃ তিনি হরিণী-গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সুতরাং পূর্ব্ব শ্লোকে কহিয়াছেন যে উপকার করিয়া নরক-ভোগও ভাল। প্রাণ, অর্থ দিয়া উপকার করা ত দূরের কথা এরূপ হতভাগাও আছে যে বাক্য দ্বারাও বাটীর পার্শ্বের কোন

রোগীর সংবাদ লয় না! পরের উপকার করিতে গিয়া যদি জন্ম জন্ম জন্মগ্রহণ করিতে হয় তাহাও ভাল—

ভবে ভবে তেন মমৈব ভূয়াৎ।
পরার্থ-হেতোঃ খলু দেহ-লাভঃ॥

নাগানন্দে ৪র্থ অঙ্কে।

একটি আদর্শ পুরুষের বিষয় বলা যাইতেছে। আমার মধ্যম পুত্র সুকুমার তাহার পীড়িতা মধ্যমা ভগ্নীকে চিকিৎসার্থ ময়মনসিংহে লইয়া গিয়াছিল। কিছুদিন পরে তাহার ভগ্নী গিরিজার রোগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকায়, সে ভগ্নীকে ছাড়িয়া কর্ম্মস্থানে যাইতে পারে নাই। কনিষ্ঠা ভগ্নীকে কহিত "দিদি! যাই?" গিরিজা বলিত "যাবে যাও, কিন্তু দেখা হ'বে না।" এইরূপে তিন মাস না গিয়া বেতন ৪। ৫ শত টাকা ক্ষতি করিল। এদিকে সাহেব ডাক্তারের ফিজ্ ও ঔষধের মূল্য অধিক হইয়া পড়িল, তথাপি তাহার ভগ্নীর শেষ সময় পর্য্যন্ত কর্ম্মস্থানে যাইতে পারে নাই! ভগ্নীর দিকে দৃষ্টিবশতঃ তাহার একটি কন্যা প্রকৃত চিকিৎসা না পাইয়া প্রাণত্যাগ করিল! আজকাল স্ত্রীর খাতিরে অনেক পুরুষ তাহার ভগ্নীর প্রতি সদ্ব্যবহার করেন না। যদি সকল মনুষ্য তাঁহার ভগিনীর এরূপ ব্যবহার করিতেন, তাহা হইলে এ শোক-তাপ-জরা-দুঃখ-সঙ্কুল সংসারই স্বর্গ হইত। সুকুমারের পত্নীও সরলতা-প্রতিমা। তিনিও তাঁহার ননদিনীকে সহোদরা ভগ্নীর ন্যায় স্নেহ করিতেন; কিন্তু কোন কোন কুটিল-হৃদয়া ইতর গৃহের কন্যা পতিকে উপদেশ দিয়া ননদিনীর প্রতি সদ্ব্যবহার করিতে দেন না, তিনিও করেন না, এরূপও দেখিতে পাওয়া যায়! সংসারে স্ত্রীই কি মূলাধার! কোথাও এরূপ দেখিতে পাওয়া যায় যে গুণধর পুত্র স্ত্রীর কথায় নিজের মাতার বক্ষে পদাঘাত করিয়াছেন! হা হরি! কোথাও বা এরূপ দেখা যায় যে পুত্র পদাঘাতে মাতাকে এ ভব-যন্ত্রণা হইতে মুক্তি দিয়াছেন! হায় কলি! গিরিজা একটি পুত্র রাখিয়া গিয়াছে। কমলাকান্ত এরূপ বুদ্ধিজীবী যে অষ্টম বর্ষ বয়সে আমায় বলিত "তুমিন্!" "আপনি" স্থানে এ শব্দ। "করেন্ চেন্" বলিত, কারণ মাতামহ গুরুর গুরু! আজকাল অনেকে ভাষার পরিবর্ত্তন করিতেছেন। বাঙ্গলা ভাষা যেন বাইরের ঢেঁকির ন্যায়—যাঁহার মন যেরূপে চায় তিনিই একবার ঢেঁকিতে পাদ দিয়া যাইতেছেন! এত মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হইতেছেন, কৈ সংস্কৃতভাষার একটা অক্ষর পরিবর্ত্তন করুন দেখি? পাঠক! কিছুদিন অপেক্ষা করুন, কমলাকান্ত বাঙ্গলাভাষাকে কাটিয়া জোড়া দিবে।

কমলাকান্তের অন্যান্য কথাও হাস্যকর—একদিন বলিতেছিল "অমন বয়সে আমি জল চিবিয়া খেয়েচি।" গিরিজা বলিল "জল চিবিয়ে খাওয়া কিরে?" উত্তর "কি জানি অভ্যাস!" পাঠক মহোদয়গণ আশীর্ব্বাদ করুন যেন মাতাপিতৃ-হীন বালকটি দীর্ঘজীবন লাভ করে। মহতের আশীর্ব্বাদ কখনও নিষ্ফল হয় না—

মহদ্ বিচলনং নৃণাং গৃহিণাং দীনচেতসাম্।
নিঃশ্রেয়সায় ভগবন্ কল্পতে নান্যথা ক্বচিৎ॥"

শ্রীভাগবতে ১০।৮।৪



আর কি চাহিব আমি?

লেখক—শ্রীগোপালচন্দ্র কবিকুসুম।

(১)

প্রভো!

আর কি চাহিব আমি?——
হৃদয়-সরোজে, চির-বিরাজিত
থাক অন্তরযামী!

(২)

ভকতি-অর্ঘ্য সাজায়ে রেখেছি
তোমার তরে;
বাসনা মানসে সঁপিব তোমার
চরণোপরে!
স্নেহের নয়নে বারেক চাহিয়া,
প্রীতি-ফুলদল দাও বিকাশিয়া
পবিত্র কর প্রাণ-মন-হিয়া,
ধন্য হইগো আমি।
হৃদয়-সরোজে চির-বিরাজিত
থাক' অন্তরযামী!

(৩)

আর কি চাহিব আমি ?
তোমারি আজ্ঞা মাথায় বহিয়া
এসেছি ভবে ;——
সাধিয়া জগতে তোমারি কার্য্য
ফিরিব যবে,
তুলে নিও তব চির-প্রেমলোকে,
সান্ত্বনা দিও সুখে দুখে শোকে,
তাপিত হৃদয় জাগিবে পুলকে
নাচিবে দিবস-যামী।—
হৃদয়-সরোজে চির-বিরাজিত
থাক' অন্তরযামী !

(৪)

আর কি চাহিব আমি ?
না আসিতে আমি ধরণীর পরে
তুমিগো, আগে,
সাজায়ে রেখেছ, মানব-জীবনে
যা কিছু লাগে।
প্রথম যখন মেলিনু নয়ন,
ভাতিল তোমার সুচারু ভুবন ;
জননীর স্নেহ-করুণ আনন,
হেরিনু তখনি আমি !
হৃদয়-সরোজে চির-বিরাজিত—
থাক' অন্তরযামী।

(৫)

আর কি চাহিব আমি ?
সে দিন নবীন জীবন-প্রভাতে
দেখিনু জাগি ;——
জননীর স্তনে ঝরে ক্ষীর-ধারা
আমারি লাগি।

সে দিন প্রথম উষার বাতাস
দিল উপহার চারু ফুলবাস;
বিনিময়ে তারে দিনু সুধা-হাস,
সে কি আনন্দ! স্বামী!
হৃদয়-সরোজে চির বিরাজিত
থাক' অন্তরযামী।

(৬)

আর কি চাহিব আমি?
কিশোর-সীমায় ভ্রমিতে ভ্রমিতে,
আপনা মাঝে—
গৌরব-বাণী ধ্বনিল সহসা
সকল কাজে!
যৌবন তবে উঠিল বিকাশি
চৌদিকে ফুটে ফুল রাশি রাশি,
মধুময় হাসি, বিশ্ব-বিলাসী
অনন্ত প্রেম-কামী!
হৃদয়-সরোজে চির-বিরাজিত
থাক' অন্তরযামী।

(৭)

আর কি চাহিব আমি?
তোমারি আদেশে বহে সমীরণ
আমার তরে,
নিত্য বিকাশে কাননে কুসুম
থরে বিথরে!
ঊর্দ্ধে শোভিছে অসীম গগন,
উদারে নীলিম মহিমা-মগন;
স্নিগ্ধোজ্জ্বল চন্দ্রকিরণ
দূর দিগন্তগামী।
হৃদয়-সরোজে চির-বিরাজিত
থাক' অন্তরযামী।

(৮)

কি আর চাহিব আমি ?
কি আছে আমার   কি দিব তোমার
চরণ-তলে,—
বরষিছ তবু   আশীষ-আসার
কত কি ছলে !
মোর শুভদিনে কিবা দুর্দ্দিনে,
আলোকে আঁধারে বিজনে বিপিনে
কত না যতনে পালিছ এ দীনে,
কতেক কহিব আমি ?
হৃদয়-সরোজে   চির-বিরাজিত
থাক' অন্তরযামী।

(৯)

কি আর চাহিব আমি ?
চির আনন্দ   তোমার ভবনে
জাগিছে নিতি !
গাহিছে বিহগ   বন-নিকুঞ্জে
বিজয়-গীতি !
কুল কুলু ধায় চটুলা তটিনী ;
পূজিছে নিত্য প্রকৃতি-কামিনী ;
নিবিড় নীরদে   হাসিয়া দামিনী
প্রণমে তোমারে, স্বামী !
হৃদয়-সরোজে   চির-বিরাজিত
থাক' অন্তরযামী !!



আমাদের সমাজ।

লেখক—শ্রীপ্রমথনাথ সিকদার।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

একদিকে এ সমাজে মনুষ্যত্বধ্বংসী বৈষম্য অপরদিকে সাম্যমন্ত্রে দীক্ষিত, ভ্রাতৃপ্রেমে সংবদ্ধ ইস্‌লাম ও খৃষ্টীয় সমাজ প্রেমহস্ত বিস্তার করিয়া আহ্বান করিতেছে। তাহাতে দলিতগণ যে এরূপ ভীষণ নিষ্পেষণ হইতে মুক্তি লাভার্থ সেই প্রেমধর্ম্ম গ্রহণ করিবে তাহাতে বিস্মিত হইবার কি আছে? একটা মজার কথা—হিন্দু-সমাজে থাকিলে যে ব্যক্তি সকল অধিকার হইতে বিচ্যুত ও ঘৃণিত, অপর ধর্ম্ম গ্রহণ করিলে শুধু যে সে সেই ধর্ম্মিগণের নিকট সকল অধিকার প্রাপ্ত হয় তাহা নহে, হিন্দুর চক্ষেও সে উন্নত। তাহা হইলে কি অপ্রত্যক্ষভাবে হিন্দু বলিতেছে না—হে পদদলিত তুমি আমাদের সমাজ ত্যাগ করিয়া অপর সমাজভুক্ত হও? অপর ধর্ম্ম গ্রহণ করিলে তাহার পারিপার্শ্বিক অবস্থা তাহার উন্নতির সহায়ক হইয়া যায়, সে তখন বুঝে তাহার জীবনের উচ্চ লক্ষ্য ও সার্থকতা আছে; সে তখন ঘৃণার পরিবর্ত্তে সহায়তা প্রাপ্ত হয়। এরূপ অবস্থায় যাহা হওয়া উচিত তাহাই হইয়া আসিতেছে, ফলে হিন্দু-সমাজ ধংসোম্মুখ। হিন্দু সমাজ বলিতে প্রত্যেক হিন্দুর; হিন্দু-জাতির কোনও ক্ষতি হইলে সকলকেই সে ক্ষতি সহ্য করিতে হয়, অতএব প্রত্যেক হিন্দুর অবশ্য-কর্ত্তব্য মৃত্যু হইতে, লাঞ্ছনা হইতে সমাজকে রক্ষা করা। অপর কাহারও উপর ভার দিয়া আরামের তৃপ্তি লাভ করিতে চেষ্টা করিলে আরাম মিলিবে না—চিরবিশ্রাম মিলিতে পারে। এরূপ কখনই হয় নাই—হয় না—হবে না।

এখন জিজ্ঞাসা করি, আমাদিগকে বাঁচিয়া থাকিতে হইবে কিনা? প্রত্যেকের বাঁচিয়া থাকিবার অধিকার আছে কিনা? আমাদের সভ্যতা, ঋষি-প্রচারিত সত্য-সমূহ বাঁচাইয়া রাখা যুক্তিযুক্ত কিনা? যদি বাঁচিয়া থাকা অভিপ্রেত হয় তবে ঘরে ও বাহিরে লাঠি ও লাথি খাইয়া জীবনের সার্থকতা লাভ করিতে হইবে? অথবা অপরজাতি গুলি যেমন ভাবে বাঁচিয়া থাকিতে চায়—সেইরূপ ভাবে বাঁচিয়া থাকিতে হইবে? যদি মানুষের মত বাঁচিতে হয়—তবে আমাদের যাহা কিছু ভাল তাহা বাঁচাইতে হইবে এবং অপরের গৃত হইতে

রত্ন সংগ্রহ করিয়া জাতীয় জীবনকে অলঙ্কৃত করিতে হইবে। শুধু তাহাই নহে, নূতন তেজে নব নব কল্যাণ-পন্থা আবিষ্কার করিতে হইবে। জাতির জীবন-ধারা রক্ষা করিতেই হইবে। জগতে বিভিন্ন সভ্যতার প্রয়োজনীয়তা আছে। আমাদের সভ্যতারও প্রয়োজনীয়তা আছে। তাহা রক্ষার্থ চাই আত্মপ্রতিষ্ঠা। এ আত্মপ্রতিষ্ঠা এমনভাবে করিতে হইবে যে জগতের কল্যাণই তাহার লক্ষ্য হইবে। জীবনীশক্তির মূল উৎস ধর্ম্ম যাহা মনকে চালিত করে—সেইস্থানে আবিলতা আসিয়াছে; সে স্থানকে পবিত্র ও বিশুদ্ধ করিতে হইবে। নতুবা রাজনীতি, অর্থনীতি প্রভৃতি রূপ Patchwork অচিরস্থায়ী সংস্কারে স্থায়ী মঙ্গল সাধিত হইবে না। স্বার্থের মধ্যে ধ্বংস-বীজ নিহিত। আমাদিগকে জ্ঞান কর্ম্ম ও ধর্ম্মে উন্নত হইতে হইবে। কর্ম্মচ্যুতিতে সমাজ-দেহ অচল হইবে। জ্ঞানচ্যুতিতে অন্ধকার আসিবে, শুধু ভাবুকতায় মনকে দুর্ব্বল ও অকর্ম্মণ্য করিবে, ব্যভিচার আসিবে। আমাদের ধর্ম্ম জ্ঞান ও কর্ম্মকে পূত করিবে। সকল কুসংস্কারচ্যুত মনুষ্যত্ব-বিকাশোপযোগী—অনন্তশক্তির উন্মেষক ধর্ম্মই আমাদের বরণীয়। সাবধান হইতে হইবে ধর্ম্মের নামে যেন ধ্বংস না আনি। অতীতের ইতিহাস আমাদের পথ-নির্দ্দেশের সহায়ক হইবে। অতীত-কালে ধর্ম্মের মূলনীতি সকলের মধ্যে প্রচারিত হয় নাই। হিন্দু বলিতে সাধারণ সূত্র খুব কম পাওয়া যায়। সাধারণকে জ্ঞান ও ধর্ম্ম হইতে বঞ্চিত রাখায় সমাজ-দেহ শীঘ্র পচিতে আরম্ভ করে। নিজস্ব সম্পত্তি বলিয়া দাবী করিবার হিন্দুর সাধারণ কি আছে? বেদ হিন্দুর গৌরবের জিনিস, কিন্তু তাহা হইতে অধিকাংশ লোকে বঞ্চিত ছিল; সমগ্র জাতির বন্ধনের সাধারণসূত্র না থাকায় যখন বাহির হইতে সংঘবদ্ধ আঘাত পড়িল তখন নামে মাত্র একজাতি রেণু রেণু বিচ্ছিন্ন হইল। এ অভাব এখন পূরণ করিতে হইবে। সমাজের সকল সম্প্রদায়ের সম্মুখে মনুষ্যত্বলাভোপযোগী সকল অধিকার উন্মুক্ত রাখিতে হইবে; নচেৎ আজ যখন সকল দেশের জ্ঞান, সভ্যতা, সাম্য, ধর্ম্মের আলোকে ভারত আলোকিত, এখন লুকাচুরি চলিবে না। অন্ধকার গৃহে, যখন ভিন্ন ধর্ম্ম শিক্ষা সভ্যতার প্রতিদ্বন্দ্বিতা বর্ত্তমান ছিল না, তখন সম্প্রদায়-বিশেষ অন্য সম্প্রদায়কে অধিকারচ্যুত রাখিতে পারিত, কিন্তু পাশ্চাত্য শিক্ষায় স্বাধীনতা কি অধিকার অনধিকার সকলে বুঝিয়াছে, তখন ফাঁকি চলিবে না, তাহা যতই ধর্ম্মের নামে উৎকট শ্লোকসহ নরকভীতি প্রদর্শনপূর্ব্বক ঘোষিত হউক না কেন। এখনও যদি কেহ অজ্ঞানতা স্বার্থপরতা হৃদয়-দৌর্ব্বল্যহেতু মানুষকে

ভগবদ্দত্ত অধিকার হইতে বঞ্চিত রাখার চেষ্টা করে, তবে হয় বঞ্চনাকারীর অবস্থা পাষাণে মস্তকাঘাতের ন্যায় হইবে, নচেৎ বঞ্চিত যেখানে ভগবদ্দত্ত মনুষ্যোচিত গুণাবলী অর্জ্জনের সহায়তা পায় সেখানে আশ্রয় লইবে। অধিকারদানে কৃপণ ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করি—যেখানে ভগবান ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি, জ্ঞান প্রভৃতি সকলই দিয়াছেন সেখানে মানুষ যে শ্লোকের জোরে তাহাকে বঞ্চিত রাখিতে চায় একি ভগবৎদ্রোহিতা নহে? যদি সমাজকে রক্ষা করিতে চাও, নিজেকে রক্ষা করিতে চাও, তবে সমাজনীতি এমন করিতে হইবে যাহাতে ব্যষ্টি ও সমষ্টি জীবনের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধিত হয়, মহাজ্ঞানী, মহাপ্রেমিক, মহাকর্ম্মী হইতে মূর্খতমের উপযোগী হয়; যাহাতে সম্প্রদায় বিশেষের সুবিধার জন্য কোন ব্যক্তি বা সম্প্রদায়কে অধিকারচ্যুত করা হইবে না—পরন্তু সকল সম্প্রদায় সমুন্নত যাহাতে হইতে পারে এবং পরস্পর একতাসূত্রে বদ্ধ থাকিয়া ব্যষ্টি ও সমষ্টি জীবনকে মঙ্গলের দিকে চালিত করিতে পারে। কোনও সম্প্রদায় কোন সমাজ-রক্ষণোপযোগী বৃত্তির জন্য কোন সম্প্রদায় অপেক্ষা হীন বিবেচিত হইবে না। কারণ মানুষ ব্যবসায়ের জন্য অধার্ম্মিক হয় না। কর্ম্মের ভাবের উপর তার ভাল মন্দ নির্ভর করে। কোনও ব্যবসায় হেয় বিবেচিত হইলে কেহ তাহা অবলম্বন করিতে রাজি হইবে না, এবং সে ব্যবসায় বন্ধ থাকিলে সমাজ দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে। সমাজনীতি যথাসম্ভব সরল অথচ দৃঢ় হইবে—যেমন বিস্তৃত তেমনি গভীর হইবে। ঋষি-প্রচারিত সত্য-সমূহের মধ্যে এ কল্যাণজনক নীতি বর্ত্তমান। ঐ গুলির সমাজের মধ্যে অবাধ প্রচার হইলেই সমাজ নব বলে বলীয়ান হইবে। সংস্কার-মুক্ত-হৃদয়ে সত্যকে বরণ করিতে পারিলেই মঙ্গল আসিবে।

বহু মতবাদের দ্বারা সমাজ যে দুর্ব্বল হয় নাই—তাহা বলিবার যো নাই। কিন্তু একটী দৃঢ়, উচ্চতম সাধারণসূত্র থাকিলে তবে সমাজকে সংঘবদ্ধ করিবে। এমন তত্ত্ব সকলের সাধারণ সম্পত্তি হওয়া চাই নতুবা মঙ্গল নাই। তাই কাতরকণ্ঠে—করযোড়ে প্রার্থনা—ভাই সব চোখের ঠুসি খুলিয়া ফেল, আর তথাকথিত শাস্ত্রের বচন দ্বারা সম্মোহিত থাকিও না, যদি মানুষ—বুদ্ধিমান জীব বলিয়া ধারণা থাকে সৎশাস্ত্র কি তাহা বুঝিয়া দেখ, যাহাতে জাতির—জগতের মঙ্গল সাধিত হয় সে পথে চল। তোমরা ধ্বংসের মুখে, ধ্বংসের হাত হইতে নিজেকে, নিজের বংশধরকে, নিজ সভ্যতা ধর্ম্ম রক্ষা কর। তাহা যদি না পার বা না কর, তবে বুঝিব তুমি যতই নিজেকে সুসভ্য—পবিত্র মনে

কর না কেন, তুমি ভগবদ্‌দ্রোহী এবং ভগবানের সিংহাসনে সয়তানকে স্থাপনা করিয়া পূজা করিতেছ। পূর্ব্ব পুরুষগণ দায়-স্বরূপ এ সব কর্ত্তব্য রাখিয়াছেন; ইহা সম্পাদন না করিয়া মরিলেও নিস্তার নাই। তোমার বংশধারা রক্ষা করা কর্ত্তব্য, ইহার কোনটীর নাশে তোমার অস্তিত্ব রক্ষা করা কঠিন বা অসম্ভব। এখন হইতে সচেষ্ট না হইলে তোমাদের নাম অতীত ইতিহাসের বিষয় হইবে। বর্ত্তমানে এই যে শিক্ষায় শিক্ষায়, সভ্যতায় সভ্যতায়, ধর্ম্মে ধর্ম্মে সংঘর্ষে উচ্চগুণ-সম্পন্ন বলবানই জয়ী হইবে। বলবানদের মধ্যে আদান-প্রদানে পরস্পর উপকৃত হইবে। যদি তোমার জগতকে কিছু দেওয়ার থাকে, যদি তোমার জীবনের সার্থকতা থাকে তবে নিশ্চেষ্টতা—তামসিকতাকে দূর কর, প্রকৃত সাত্বিকের বল লাভ কর—উঠ, অগ্রসর হও। ব্যষ্টি ও সমষ্টি জীবনে শারীরিক, মানসিক ও আত্মিক বল সঞ্চয় কর। হয়ত অদূর ভবিষ্যতের জগতে জাতিতে জাতিতে এক ভীষণ সংঘর্ষ উপস্থিত হইবে, তার জন্য প্রস্তুত হও। তাহা না হইলেও শুধু বাঁচিয়া থাকিবার জন্যও উন্নত হওয়া প্রয়োজনীয়। শারীরিক স্বাস্থ্য শুধু যে চোরের হাত হইতে আত্মরক্ষার্থ আবশ্যক তাহা নহে—বাঁচিয়া থাকিবার জন্যও আবশ্যক। বলবান যেমন নিজেকে রক্ষা করিতে পারে তেমনি পরকে রক্ষা করিতে পারে—বলবান হইলে যে পরপীড়ন করিতে হইবে তাহার কোন অর্থ নাই, বরঞ্চ তাহা দূষণীয়। হস্ত দৃঢ় হইলে তাহা কি মস্তক চূর্ণ করিবে? দুর্ব্বলের জীবন নিজের ও পরের সকলের নিকটই ভারস্বরূপ। যে বাঁচিবার জন্য পরের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করে তাহার বাঁচা মৃত্যু অপেক্ষা নিন্দনীয়। অতএব উঠ, জাগো, সংঘবদ্ধ হও, সত্যকে বরণ কর, নিজের ও জগতের কল্যাণ-সাধনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হও। এস, ভাই সকল—অন্ধকার হইতে আলোকে যাইবার জন্য, অসত্য হইতে সত্যকে লাভ করিবার জন্য, মৃত্যু হইতে অমৃত পাইবার জন্য প্রার্থনা করি। সত্যদ্রষ্টার জীবন-প্রদীপে আপন জীবন-প্রদীপ জ্বালাইয়া লই। বিধাতা আমাদের মঙ্গল-বিধান করুন।

তর্পণ রহস্য।

লেখক—শ্রীসুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

"ওঁ সনকশ্চ সনন্দশ্চ তৃতীয়শ্চ সনাতনঃ। কপিলশ্চাসুরিশ্চৈব বোঢ়ুঃ পঞ্চশিখস্তথা। সর্ব্বে তে তৃপ্তিমায়ান্তু মদ্দত্তেনাম্বুনা সদা।"

প্রথমে হইল ব্রহ্মের সৃষ্টি ইচ্ছা, তারপর হইল ভাব অর্থাৎ নৈসর্গিক প্রকৃতি সৃষ্টি, তার পরে "মানস-সৃষ্টি"। নৈসর্গিক ভাব-প্রকৃতিসংযুক্ত মন হইতে ঘনীভূত যে সৃষ্টি তাহাই বলিতেছি "মানস-সৃষ্টি।"

মনঃসম্ভূত সৃষ্টি "মনুষ্য"। মানস-ভাবে ব্রহ্মা আপনাকে মনুষ্যরূপে প্রকটিত করিলেন। মনঃসঙ্কল্পিত সৃষ্টিতে এখনও মানস-যোনিতে সৃষ্টি হইতেছে। এখন স্থূলে উপনীত হয় নাই। সনকাদি মানব-পিতৃগণ আদি মানব, কামচর মনুষ্য।

"কামচর" (অর্থাৎ "Ideal)" মানস-সৃষ্টিজাত মনুষ্য। "মানবাত্মা" মনঃপ্রকৃতি-সম্পন্ন। সাধারণতঃ মানব-প্রকৃতি মনশ্চালিত হইয়া "আত্মা" মানবজীবরূপে সংসার-প্রবৃত্ত হন। মনঃপ্রকৃতি মানবের জীবাত্মাকে (Lead) পরিচালন সাধারণতঃ করেন। মনের অধীন (Tendency) তে সাধারণতঃ মানবগণ চালিত হয়। এই জন্য মনঃপ্রকৃতিবিশিষ্ট বলিয়া মনুষ্য বা মানুষ বলে।

সনকাদি আদি মানব কামচর "মানবাত্মা" দেহাধীন দেহাপাশবদ্ধ নহেন। "Ideal" "মানব-কল্প" মানব-পিতৃদেবগণ। ইঁহারা দেহমুক্ত, পিতৃধর্ম্মী নহেন; ইঁহাদের দ্বারা মানববংশ বিস্তৃত হয় নাই। ইঁহারা প্রকৃতি গ্রহণ করেন নাই; ইঁহারা মানব-সৃষ্টি-বিস্তারকল্পে আদর্শ মনুষ্যরূপে বিদ্যমান।

তৎপরে: পূর্ব্বমুখে উপবীতী অবস্থায় দেবতীর্থ দ্বারা ঋষি-তর্পণ করিতে হইবে।

ওঁ মরীচিস্তৃপ্যতাং অত্রিস্তৃপ্যতাং অঙ্গিরাস্তৃপ্যতাং পুলস্ত্যস্তৃপ্যতাং পুলহস্তৃপ্যতাং ক্রতুস্তৃপ্যতাং প্রচেতাস্তৃপ্যতাং বশিষ্ঠস্তৃপ্যতাং ভৃগুস্তৃপ্যতাং নারদস্তৃপ্যতাং মন্ত্রে এই দশজন আদি সৃষ্ট ঋষিদিগকে তর্পণ করিতে হয়। সৃষ্টি-সঞ্চারের হেতুভূত-ভাবে "জ্ঞান-ভূমি" আচার্য্যরূপে প্রথমে ইঁহারা সৃষ্ট হন। ইঁহাদের আদর্শ গ্রহণ করিয়া ঋষিবংশ বিস্তার হইয়া অনেক ঋষি সৃষ্ট হইয়াছিলেন।

এইরূপে সৃষ্টিকল্পনায় "ব্রহ্ম" ব্রহ্মকল্প, দেবকল্প, মনুষ্যকল্প, ঋষিকল্প সৃষ্টি হইবার পর পিতৃকল্প সৃষ্ট হইয়াছিল। পূর্ব্বোক্ত সনক সনন্দাদি আদি মানবগণ অথবা মরীচি প্রভৃতি আদি ভাবকল্প ঋষিগণ পিতৃধর্ম্মী ছিলেন না। দারপরিগ্রহ করেন নাই। উহাঁরা মনুষ্যকল্প ঋষিকল্প অর্থাৎ Ideal সৃষ্টি।

প্রবৃত্তিমার্গে পিতৃযানপথ দক্ষিণাভিমুখে প্রাচীনাবীতি-ভাবে পিতৃতীর্থ (অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীর মূলদেশ দ্বারা) পিতৃকল্পিত অগ্নিষ্বাত্তাঃ, সৌম্যাঃ, হবিষ্মন্তঃ, উষ্মপাঃ, সুকালিনঃ, বর্হিষদঃ, আজ্যপাঃ প্রভৃতি পিতৃকল্প আদি পিতৃগণকে (Ideal) আদর্শকল্পিত পিতৃগণকে স্বধা মন্ত্রে তর্পণ করিতে হয়। শূদ্রগণ সর্ব্বদা "নমঃ" মন্ত্রে তর্পণারম্ভ ও শেষ করিবে।

শূদ্রাদির জন্য প্রণব ও স্বধা মন্ত্র নিবারিত হইয়া "নমঃ" মন্ত্র দ্বারা তর্পণ-ক্রিয়া করিবার ব্যবস্থা হইবার তাৎপর্য্য কি ?

আত্মার দুর্ব্বলতায় আত্ম-বিস্মৃতি-জনিত কারণ বশতঃ নাকি ? অজ্ঞানতা-বশতঃ আত্মবিভ্রম আত্মার "স্ব" অবস্থা হইতে অবনমিত হওয়া বশতঃ দূরস্থ হওয়ায় "নমঃ" বলিয়া আত্মাকে অনুভূতি করিবার চেষ্টা করিবার সুযোগ দান করা হইয়াছে নাকি ? Self Conscious State এ "স্ব-ধা" অজ্ঞান Self Unconscious State এ শূদ্রত্ব বশতঃ মানবাত্মা "আত্মাকে" "নমঃ" বলিয়া চেতিত করিবে নাকি ? অজ্ঞানাচ্ছন্ন আত্মবিস্মৃত (Self Unconscious State এ) জীবাত্মা আত্মচৈতন্যে আত্মবোধ লাভই করিতে পারে নাই— আত্মায় উদ্বুদ্ধ না হইতে পারিয়া আত্মস্খলিত হইয়া দেহাত্মবুদ্ধি মানবাত্মা "প্রণব-স্বরূপ" ব্রহ্মাবধারণা করা দুরূহ বলিয়াই প্রণবাত্মক মন্ত্র উচ্চারণ নিবারিত হইয়াছিল নাকি ? আত্মার শূদ্রত্ব ব্রাহ্মণত্ব নাই। প্রকৃতির অধীনতায় অজ্ঞানাচ্ছন্ন জীব-প্রকৃতি শূদ্রস্বভাব প্রকৃতিকে "শূদ্র" বলিয়াছে শাস্ত্রে।

জাতিটা "আত্মা" নহে, জাতিটা "আত্মার" "প্রকৃতিজ স্বভাব।" প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি হইতে জাতিত্ব প্রাপ্ত, আত্মার নিজভাব স্ব-ভাব হইতে নহে। "আত্মার" জাতি নাই। নাহং মনুষ্যো ন চ দেব-যক্ষৌ ইত্যাদি—শ্লোক দ্রষ্টব্য। মনুষ্য দেব যক্ষ ব্রাহ্মণ শূদ্র গৃহী ব্রহ্মচারী এ সব ভাব-বিপর্য্যয় প্রকৃতি হইতে জাত।

যাউক,—অগ্নিষ্বাত্তা প্রভৃতি পিতৃকল্প আদিপিতৃগণের তর্পণের পর যম-তর্পণ দক্ষিণাভিমুখে প্রাচীনাবীতি-ভাবে পিতৃতীর্থযোগে করিতে হয়।

"যম" হচ্চেন সূর্য্য—আদিত্য হৃদয়স্তোত্রে যম সূর্য্যকে বলা হইয়াছে। "যম" দেহান্তরিত করেন। Vitality Energy ইত্যাদি তেজঃ হইতে আমরা

প্রাপ্ত হই। সুতরাং সূর্য্য "যম" হওয়াই সঙ্গত। Vitality Energy অন্তর্হিত হইলে—তেজঃ বা তাপ অন্তর্হিত হইলে প্রাণ দেহবিমুক্ত হয়। "সূর্য্য" সহিত আমাদের জীবনের এত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। প্রাণবায়ুও যেমন প্রাণ ধারণের জন্য প্রয়োজন, তেজঃ তাপ চেতনা রাখিবার জন্য ততই প্রয়োজন, সলিল অর্থাৎ "রস"ও ততই প্রয়োজন, ক্ষিতিতত্ব অর্থাৎ খাদ্য-গ্রহণও ততই প্রয়োজন, ব্যোমতত্ব ও আকাশ মন ইহারও স্বচ্ছন্দ ও সক্ষম অবস্থা জীবনগ্রন্থিকে আঁকড়াইয়া রাখিবার জন্যও ততই প্রয়োজন। একের বিহনে সকলগুলিই অন্তর্হিত হয়। পাঞ্চভৌতিক উপাদান সূক্ষ্ম পঞ্চভূতাত্মক জীবনীশক্তি দ্বারা দেহ-প্রাণ-মনকে সঞ্জীবিত রাখিয়াছে।

যাউক, যম-তর্পণে যম মৃত্যুরাজ নহেন (Not the King of Death)। যম হচ্চেন ধর্ম্মরাজ, মৃত্যুর অন্তক, (Death of Dealths ?) বৈবস্বত (বিবস্বান সূর্য্য হইতে উদ্ভূত) কাল (ভূতভবিষ্যতাদি, প্রাতঃ মধ্যাহ্নাদি মাস ঋতু বর্ষাদি কাল সময় Space ?) সর্ব্বভূতক্ষয় ইত্যাদি যমের বহু বিশেষণে নামোল্লেখ দেখা যায়। উহাই হ'চ্চে "যমের" স্ব-রূপ। এই স্ব-রূপ মূর্ত্তিতে "যম"কে তর্পণ করিবে।

শব্দ ও বাক্য দ্বারা মনের ভাব প্রকাশ করিতে হইলে বিরাম, বিশ্রাম, যতি দিয়া বলিতে হয়, লিপিযোগে মনের ভাব ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়া প্রকাশ করিতে হইলে , ; : . কমা, সেমিকোলন, কোলন, ফুলষ্টপ্ "যতি, বিরাম, বিশ্রাম প্রদান করিতে হয়, তবেই "লিপি-ছন্দে" অনেকটা মনের ভাব প্রকটিত হয়।

সঙ্গীতেও (সঙ্গীতজ্ঞ নহি) নাকি যম, যতি, ছন্দ, ইত্যাদি ইত্যাদি আছে। তাহা হইলে দেখা যায় যম, যতি, ছন্দ দ্বারা মাধুর্য্য বিস্তার করে। নচেৎ একটানা এক ঘেয়ে হয়ে যায়।

এই যে মানবাত্মার ভ্রমণ-পথ, একটা তুচ্ছ বাসনার বশবর্ত্তী হ'য়ে বা কর্ম্ম-প্রসঙ্গে, কিম্বা কর্ম্মবিপাকে যেরূপে বা যে ভাবেই হউক সংসার প্রবৃত্ত বা নিবৃত্ত হয়েই হউক—সংসার প্রবিষ্ট হ'য়ে অর্থাৎ সংসারে জন্মগ্রহণ করে যদি একটানা জীবনটা চলে যে'ত তা হ'লে জীবনটার কোনও মাধুর্য্য ছিল কি ? সুতরাং "মৃত্যুটা" হ'চ্চে একটা "ছেদ"। এই ছেদের ব্যবধানে, জন্মমৃত্যুর মধ্যবর্ত্তিতায়, মানব একটা "অধ্যায়" একটা "সর্গ" একটা প্রবন্ধ, এমন কি—একটা বিষয়ান্তর পরিগ্রহ করিতে পারে। "যম"টা হ'ল নেপথ্য, মৃত্যুটা হ'ল একটা পর্দ্দা, জন্মমৃত্যুর মাঝখান দিয়ে একটা স্মৃতি বিস্মৃতি চলে

গেল, মাঝখানটায় আমি নেপথ্য সাজঘর হ'তে আবার একটা সজ্জায় বেশ পরিবর্ত্তন ক'রে অপর আর একটা ভূমিকা, কিম্বা অপর একটা নাটক অভিনয় করিতে বেরিয়ে এলুম। 'মৃত্যুটা' এ সুযোগ দান কচ্ছে।

দেহ-ত্যাগ মৃত্যুটা বড় মৃত্যু নয়, এটা মৃত্যুই নয়, এটা একটা দৃশ্য-প্রপঞ্চ হইতে দৃশ্যান্তরে সরে পড়বার একটা ফাঁক, একটা সুযোগ। কিন্তু, আত্মঘাতী হওয়া, অর্থাৎ আত্মায় পতিত হওয়া, স্বভ্রষ্ট, স্বচ্যুত হওয়া আত্মাকে বিস্মৃত হওয়াটাই—সাঙ্ঘাতিক "মৃত্যু"।

ঈশ্বর হইতে, ধর্ম্ম হইতে, ভ্রষ্ট হওয়াই ভীষণ মৃত্যু—আত্মার ঐ খানেই বড় অসহায় অবস্থা—জীবের ঐ খানেই পতন।

সুতরাং যম ধর্ম্মরাজ বলিয়াই—"যমায় ধর্ম্মরাজায় মৃত্যবে চান্তকায় চ" ইত্যাদি——

যম ধর্ম্মরাজ, অধর্ম্মের উপর শাসন-বিধান সম্বন্ধীয় নেতৃত্ব করিতে অপর কোনও রাজা নাই। যম ধর্ম্মাধর্ম্ম উভয়ই শাসন করেন। অধর্ম্ম ধর্ম্মেরই অভাব, এবং ধর্ম্ম অধর্ম্মেরই অভাব। দিবার অভাব রাত্রি, রাত্রির অভাব দিন, দিন ও রাত্রি লইয়া "দিবস"। তদ্রূপ "ধর্ম্ম" অধর্ম্মেরই একটা বিপরীত দিক্, "অধর্ম্মও" তদ্রূপ। যম ধর্ম্মের "পাতা", অধর্ম্মের "শাস্তা"। সুতরাং উভয়েরই মালিক "যম"।

জন্ম ও মৃত্যুর ব্যবধানে মনুষ্য আপনাকে সমঝাইয়া সামলাইয়া লইবার সুযোগ পায়। কাল সকলকে হরণও করেন, কাল সকলকে আরামও করেন। Time heals up every thing ব'লে ইংরাজীতে যেন একটা প্রবাদ আছে। Time and space এর ব্যবধানে "আরাম" হয়। "যাতনা"টা হচ্চে আত্মার অনুতাপ অনুশোচনা—চিকিৎসা।

যে আপনাকে "স্ব"স্থ তথা সুস্থও রাখিতে পারে না, সে অসুস্থ, রোগী হয়। "যম" আপনার ক্রোড়ে লইয়া তাহাকে সুস্থ আরোগ্য করেন। যেমন রোগী রোগাগারে শয্যায় পড়িয়া বিশ্রাম করিতে করিতে সুস্থ হয়। মানুষ আপনার কৃত অত্যাচার অনাচার পাপ অধর্ম্ম অনুষ্ঠানে রুগ্ন বিকল ক্লীব ইত্যাদি হয়, সময় সাপেক্ষভাবে রোগ-ভোগে সুদীর্ঘ রোগ-যন্ত্রণা অনুতাপে দুর্ভোগ-ক্ষয়ে আরোগ্য লাভ করে। ভোগাক্ষয়ে দুর্ভোগ, এবং দুর্ভোগ-ভোগান্তে "ভোগ" আরোগ্য আরাম পুনরাবৃত্ত হয়।

"যম-ভবন," আত্ম-ব্যাধিগ্রস্ত জীবের আরোগ্য-শালা। পাপাসক্ত জীব পাপ, অনাচার আসক্তিবশতঃ পীড়া-প্রাপ্ত হয়, "আত্মা"কে বিস্মৃত হইয়া

প্রকৃতির প্রভাবান্বিত হইয়া রিপু-পরবশ হইয়া পড়ে, সুতরাং "রিপুর" তাড়নায় reaction অর্থাৎ স্বভাব আত্মভাব অর্থাৎ আত্মার ভাব হইতে বিচ্যুত স্খলিত ভ্রষ্ট হইয়া প্রকৃতি পর্য্যায়ে প্রকৃতির প্রভাবাধীনে রিপু-প্রভাবান্বিত বিকৃত প্রকৃতিগ্রস্ত স্বভাবে পরিণত হইলে স্ব-ভাবের উপর প্রকৃতির একটা প্রতিক্রিয়ার তাড়না হয়। "আত্মা" এইখানে বৈকল্য বিহ্বলতা প্রাপ্ত হইয়া ক্লেশ পায়। জীবাত্মার ক্লেশ, তাপ, পীড়া, বিহ্বলতা—মনের অধীনতায় চিত্তবিকৃতিবশতঃ জীবাত্মা ঐরূপ অনুভূতি করে। নচেৎ "আত্মা" স্বয়ং স্বতঃ মুক্ত। অচ্ছেদ্য অভেদ্য অদাহ্য ইত্যাদি ত্রিতাপাতীত।

সংক্ষেপতঃ "যম" সম্বন্ধে—মৃত্যু সম্বন্ধে আত্মার যমালয় যমযাতনা স্বর্গ নরক সম্বন্ধে এইটুকু মাত্র উল্লেখেই ক্ষান্ত হইলাম। স্বর্গ নরক চিত্তের একটা সুস্থ অসুস্থ স্বস্থ অস্বস্থ অবস্থা। চিত্তের বিকৃতি "নরক," চিত্তের সুস্থতা স্বস্থতা স্বাস্থ্য স্বর্গ। চিত্ত, আত্মাকে উর্দ্ধগত "স্ব-গত" অথবা অধঃপতিত করে। "মন চাঙ্গা কটোরে মে গঙ্গা"। মনের স্বচ্ছন্দতা সারল্য অকাপট্য অনুদ্বেগ "স্বর্গ"। সুস্থ বিশুদ্ধ-চিত্ততার ফলে স্বচ্ছন্দতা সারল্য অকাপট্য অনুদ্বেগাদি চিত্ত-বৃত্তির স্থৈর্য্য ও উৎকর্ষ হয়। অশুদ্ধ অজ্ঞানতাবশতঃ অবিশুদ্ধতায় উহার বিপরীত ফল হয়। যম অর্থাৎ সূর্য্য "চিত্ত"কে প্রকাশ করেন; যেমন সূর্য্যোদয়ে তিমির নাশ হইয়া দিবার উদয় হয়।

তার পরে পিতৃপিতামহাদি পিতৃপক্ষ মাতৃপক্ষের পুরুষ-প্রকৃতি-পর্য্যায়ে পিতা মাতা, পিতামহ পিতামহী প্রপিতামহ প্রপিতামহী। মাতৃপক্ষেও মাতামহাদি পুরুষ-প্রকৃতিপর্য্যায়ে তদ্রূপ তর্পণ করিতে হইবে। দক্ষিণাভিমুখে পিতৃযান পথে প্রাচীনাবীতী অবস্থায় পিতৃতীর্থ যোগে (পিতৃতীর্থ পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি) করিতে হয়। বিষ্ণুরোম্ অমুক গোত্রঃ পিতা অমুক দেবশর্ম্মা তৃপ্যতামেতৎ সতিলোদকং তস্মৈ স্বধা ইত্যাদি ক্রমে পুরুষপক্ষে এবং বিষ্ণুরোম্ অমুক গোত্রা মাতা অমুকী দেবী তৃপ্যতামেতৎ সতিলোদকং তস্যৈ স্বধা" ইত্যাদি ক্রমে প্রকৃতিপক্ষে রমণীদিগকে তর্পণ করিতে হইবে।

পিতৃতর্পণের পূর্ব্বে "পিতৃগণকে আহ্বান (Invoke) করিতে হয়, ওঁ আগচ্ছন্তু মে পিতর ইমং গৃহ্ণন্ত্বপোঞ্জলিম্"। তৎপরে অর্থাৎ পিতৃদেবগণকে আবাহনান্তে পূর্ব্বোক্ত বিধানে তর্পণ করিতে হইবে।

এক্ষণে বলা আবশ্যক হইতেছে, পিতা পুত্রে সম্বন্ধ কি? এবং "আত্মা" কেনই বা পুত্রত্ব স্বীকার করে? প্রথমে দেখা যাউক, এ পর্য্যন্ত "আত্মা"

স্থূল দেহলাভের জন্য কোনও "ভূমি" প্রাপ্ত হয় নাই। এতক্ষণ পর্য্যন্ত "আত্মা"টা সংসারলীলা করিবার বাসনাসত্বেও "ভূমি" প্রাপ্ত হ'চ্চে না; এতক্ষণ পর্য্যন্ত কল্প-সৃষ্টির অন্তর্গত হইয়া আছে। "ব্রহ্ম" দেব, মনুষ্য, ঋষি এবং পিতৃদেব-কল্প আদি পিতৃদেবগণ অগ্নিষ্বাত্তা প্রভৃতি আদর্শ পিতৃলোক পর্য্যন্ত সৃষ্টি হইয়াছে। স্থূল শরীরে উহাঁদের মধ্যবর্ত্তী দিয়া সংসার-প্রপঞ্চে আসিবার সুযোগ নাই। কল্প কল্পনা অথবা Ideal ভূমিতে, আদর্শ সৃষ্টিতে ভ্রমণ করিতেছে।

এখন স্থূল ও সূক্ষ্ম-সঞ্চার গোত্রের মধ্যে "যবনিকা" "যম" পর্য্যন্ত আসা গেল। যম-তর্পণ করিয়া তার পর "পিতৃ-ভূমিতে" অবতরণ করা হইল। এই খানে আসিয়া বাসনাবদ্ধ ভাসমান "আত্মা" ভূমি-লাভের জন্য একটা "কূল" পাইল। এইজন্য আমরা পিতৃভূমিকে "কুল" বলি; যথা 'পিতৃকুল' 'মাতৃকুল' 'শ্বশুরকুল'।

ব্যবহারতঃ বাহ্যতঃ ত্রিকুল ভিন্ন ভিন্ন হইলেও তিনে মিশিয়া একই; যেমন নদী-সঙ্গমে দুই তিনটি নদী একত্র পতিত হইয়া একই হইয়া দাঁড়ায়।

পিতৃকুল মাতৃকুল উভয়কুল মিলিত হইয়া "আত্মা"র সঙ্গমভূমি—মহাতীর্থ। মহালয়া, আলয় অর্থাৎ আশ্রয় গৃহ association; মহালয়া আমাদের নিকট কত বড় একটা আত্মার সঙ্গমতীর্থ।

"আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ", "আত্মা" পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করে। পিতা "আত্মা" (পুরুষ), মাতা প্রকৃতি। পুত্রের "আত্মা" পিতৃগত হইয়া জন্মগ্রহণ করে। "আত্মা" আপনার ইচ্ছানুসারে আপনার অনুরূপ অথবা অনুকূল আশ্রয়-ভূমি, "পিতৃগত" হইয়া পিতৃ-মাতৃ-ভূমি হইতে প্রাপ্ত হয়। এ বিষয়টা বিস্তারিত বলিবার প্রয়োজন নাই। আত্মা আপনার "জন্মভূমি" পিতৃ-মাতৃগত ভূমি নির্ব্বাচন করিয়া গ্রহণ করে।

"পুত্র" পিতার সংসার-বাসনার ক্রম এবং পর্য্যায়। বংশের ধারা, রীতি, ইচ্ছা, বাসনা, বিষয় ইত্যাদির ক্রম এবং ধারা রক্ষা এবং বিস্তার করে।

এখন বুঝা যাইতেছে "আত্মা" আপনার অনুরূপ association "সঙ্গ"সহ সঙ্গত হইতে চায়।

সুতরাং পিতৃতর্পণ, অর্থাৎ পিতৃ-দেবতাদিগের তর্পণে "ত্রিপাদপীঠ" "পিতা-পিতামহ-প্রপিতামহ" "তর্পণ" করে। তিনটী "দাঁড়া" Steps এ তর্পণ করে। এইরূপে "মাতামহ-প্রমাতামহ বৃদ্ধ-প্রমাতামহ" এই তিন দাঁড়া Steps

বা পীঠে তর্পণ করে, পরস্পর বাসনানুগত-ভাবে "পুত্ররূপে আত্মা" পিতৃ-মাতৃ-পীঠে এই ত্রিপাদপীঠ ভূমিতে আশ্রয় করিয়া আছে বলিয়া। এই তিন পীঠের সহিত আকর্ষণ যোগ চিন্তা বাসনার ধারার সংযোগ রাখিলে সমগ্র বিশ্বটার সঙ্গে শৃঙ্খলিত হইয়া থাকা যায়।

এ বিষয় পিতৃ-প্রণাম মন্ত্রে পরিস্ফুট হইবে, এক্ষণে পরবর্ত্তী তর্পণাধ্যায় আরম্ভ করা যাউক।

ভীষ্মতর্পণ—পিতৃতর্পণের পর "ভীষ্ম-তর্পণ" ব্রাহ্মণেরা করেন; শূদ্রজাতির পক্ষে যম-তর্পণের পর "ভীষ্মতর্পণ" করিবার ব্যবস্থা আছে।

ভীষ্ম "অপুত্রক", তিনি চিরকুমার ছিলেন। "পুত্র-কর্ত্তব্যে" "ভীষ্ম" আদর্শ পুত্র অবতার, "সত্যবাদী," দৃঢ়নিষ্ঠ, তেজস্বী, পিতার নিকট প্রতিশ্রুতি দৃঢ়-নিষ্ঠভাবে পালন করিয়া চিরকৌমার্য্য ব্রত রক্ষা করিয়াছিলেন। মহাভারত প্রভৃতিতে "ভীষ্ম-চরিত্র" পাঠ করিলে ভীষ্ম-মহিমা কথঞ্চিৎ হৃদয়ঙ্গম হইবে। কর্ত্তব্য ও সত্যনিষ্ঠা-পালনের জন্য অধর্ম্ম পক্ষ দুর্য্যোধনের সেবা করিয়াও "ধর্ম্মপক্ষে" মতি রাখিয়া কর্ত্তব্যে অধর্ম্মকে সেবা করিয়াছিলেন। "ভীষ্ম" মহাত্যাগী জিতেন্দ্রিয় সন্ন্যাসী অথচ বিষয়ে রত। বিষয় সাম্রাজ্য রক্ষা করিতেছেন, অথচ স্বয়ং "ত্যাগী"।

"ভীষ্ম" সুতরাং স্বীয় আদর্শ-চরিত্রে ত্যাগ, সংযম, জিতেন্দ্রিয়তা, তেজ, দৃঢ়-নিষ্ঠা এবং সত্যাদর্শে, পুত্র-কর্ত্তব্যপালনে মহাপুরুষ-অবতার, এই জন্য ভীষ্ম-তর্পণ। সমগ্র জাতিটা আব্রাহ্মণ চণ্ডাল চিরকুমার পুত্রহীন ভীষ্মের পুত্র, সমস্ত জাতিটা মানবকুল। "ভীষ্ম" শুধু পুত্রাদর্শ নহেন, মানবকুলের আদর্শ। সত্য-নিষ্ঠতার জন্য অধর্ম্মের সেবা করিয়াও "সত্যনিষ্ঠতাই" তাঁকে ধর্ম্মের উচ্চাসন দান করিয়াছিল।

তিনি কর্ত্তব্যানুরোধে সত্যনিষ্ঠাবশতঃ কর্ম্মে অধর্ম্মের সেবা করিলেও, মর্ম্মে ধর্ম্মের সেবা করিয়াছিলেন। "ধর্ম্মাধর্ম্ম" মহাসমরে কুরুক্ষেত্র ধর্ম্মক্ষেত্রের মহাশ্মশানে "ভীষ্ম"কে কঠোর পরীক্ষা দিতে হইয়াছিল। অধর্ম্ম-পক্ষাশ্রয় করিয়াছিলেন বাধ্য হইয়া "ধর্ম্ম"রক্ষার জন্যই, সেই জন্য অধর্ম্মের কণ্টক-শয্যায় শুইয়া ধর্ম্মক্ষেত্র মহাশ্মশানে গাঙ্গেয় পুণ্যতোয়া গঙ্গার বারি পান করিয়া সংসার-তৃষ্ণা শান্ত করিয়া "শান্তনু"পুত্র তনুত্যাগ করিয়াছিলেন। শর-কণ্টক-বিদ্ধ শরশয়নে গাঙ্গেয় ভীষ্ম, সলিল-রূপিণী পুণ্যা জননীর পুণ্যসলিল-পীযূষ পান করিয়াছিলেন, ভীষ্মজননী গঙ্গা আবির্ভূতা হইয়া সন্তানের সন্তাপ-জ্বালা তৃষ্ণা শান্ত করিয়াছিলেন।

ভীষ্ম পরকালের সাক্ষাৎ ইহকালে অন্তিমে পাইয়া অন্তিমশয্যায় পরকাল হস্তামলকবৎ সাক্ষাৎ পাইয়া পরলোকে মহাপ্রস্থান করিয়াছিলেন। কুরুবীর যদুবীর পাণ্ডববীর কাহারও ভাগ্যে ভীষ্মের ন্যায় পরকালের ছায়া ইহকালে পুণ্যপূতভাবে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ হয় নাই। সদাপুণ্য ভীষ্ম মানবের আদর্শ—তাই মানব ব্রাহ্মণ শূদ্র নির্ব্বিশেষে ভীষ্মের, উত্তরাধিকারিত্বের দাবী থাক না থাক, "তর্পণ" করিবার অধিকার পাইয়াছে। জাতির আদর্শ ভীষ্ম।

ওঁ বৈয়াঘ্রপদ্য-গোত্রায় সাংকৃতি-প্রবরায় চ।
অপুত্রায় দদাম্যেতৎ সলিলং ভীষ্মবর্ম্মণে॥

এই মন্ত্রে তর্পণাঞ্জলি তিনবার সমর্পণ করিয়া ভীষ্ম-প্রণাম করিবেন। ভীষ্ম-প্রণাম-মন্ত্রে আমার পূর্ব্বোক্ত ভাবের বিবৃতি সমর্থন করিতেছে।

ভীষ্মঃ শান্তনবো বীরঃ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ।
আভিরদ্ভিরবাপ্নোতু পুত্রপৌত্রোচিতাং ক্রিয়াম্॥

এই কলি-কলুষপ্রাপ্ত তমসাক্রান্ত ভারতীয় হিন্দুজাতি, ভীষ্মাদর্শে ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার করিয়া আত্মরক্ষা অর্থাৎ আত্মাকে রক্ষা করিবার আদর্শ পাইতেছেন।

ধর্ম্মাধর্ম্ম অর্থাৎ "ধর্ম্মের" বেষ্টনী মধ্যে নিজকে "স্ব"কে রাখিয়া অধর্ম্মকে দূরে পরিহার করা ও আত্মরক্ষা, আবার অধর্ম্মের বেষ্টনী (association) মধ্যে থাকিয়া (কর্ত্তব্যতঃ বাধ্য হইয়া ধর্ম্ম রক্ষার জন্যই) "ধর্ম্ম"কে দৃঢ়ভাবে তেজস্বিতার সহিত নিষ্ঠার সহিত রক্ষা করিয়া "অধর্ম্ম" হইতে দূরে থাকা, উভয়ই "আত্মরক্ষা" অর্থাৎ আত্মাকে রক্ষা করা। কিন্তু কোন্‌টা শ্রেষ্ঠ আদর্শ? ভীষ্মাদর্শ শ্রেষ্ঠ নহে কি?

তৎপরে রামতর্পণ। রামও "আদর্শ-পুত্র" কিন্তু "রাম" এবং "ভীষ্ম" মধ্যে পুত্রাদর্শে "ভীষ্মের" শ্রেষ্ঠতা অস্বীকার করা যায় না।

রামতর্পণ—ওঁ আব্রহ্মভুবনলোকা দেবর্ষি-পিতৃমানবাঃ। তৃপ্যন্তু পিতরঃ সর্ব্বে মাতৃমাতামহাদয়ঃ॥ অতীত-কুলকোটীনাং সপ্তদ্বীপ-নিবাসিনাম্। ময়া দত্তেন তোয়েন তৃপ্যন্তু ভুবনত্রয়ম্॥"

আব্রহ্মভুবনের লোক সকল। (চতুর্দ্দশ ভুবন বলে); যাউক, দেবর্ষি পিতৃমানবগণ। হে পিতৃসকল (অর্থাৎ আব্রহ্মভুবনলোকের সকলেই দেব ঋষি পিতৃ-মানব সকলেই পিতৃ।) তোমরা সকলে মাতৃমাতামহাদি সপ্তদ্বীপ নিবাসিনাং অতীত-কুলকোটী অর্থাৎ আমার অতীত জন্মের কোটি কোটি জন্মের কোটি কোটি কুলের সপ্তদ্বীপ নিবাসী পিতৃসকল মাতৃমাতামহাদি আমার দত্ত সলিলাঞ্জলি দ্বারা তৃপ্ত হও।

শ্রীভগবান রামচন্দ্র এক সাঁটে (সংক্ষেপে) এতটা বিস্তৃত তর্পণ পর্ব্ব ঐ চারিপংক্তি শ্লোক মন্ত্র দ্বারা বারি-পূত করিয়া তর্পণ করিলেন।

ভীষ্মের ন্যায় তেজস্বী সত্যপ্রতিজ্ঞ কর্ত্তব্যনিষ্ঠ লক্ষ্মণ (অনন্তদেব) এক সাঁটে সম্পূর্ণ বৈদান্তিক বিজ্ঞানে তর্পণ করিলেন। "আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্তং জগৎ তৃপ্যতু"। আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত জগতের বাসনাবিদ্ধ অশান্ত আত্মা তৃপ্ত হউন! "আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত জগৎ" এই সাঁট বা সংক্ষিপ্ত বাক্যের মধ্যেই ভাবগত মহান বিস্তার রহিয়াছে। বরং পূর্ব্ব পূর্ব্ব মন্ত্রে কোনও কোনও জীব বাদ যাইলেও, লক্ষ্মণ-তর্পণ-মন্ত্রে একটি কীটাণুও বাদ যায় নাই। লক্ষ্মণ-তর্পণের ইহাই বিশিষ্টতা। অণু পরমাণু (প্রটোপ্লাসম্) পর্য্যন্ত আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত জগতের মধ্যে, সকলেই "জীবাত্মা", সকলেরই অশান্ত "আত্মার" উপশান্তির জন্য তৃপ্তি-সাধন করা প্রয়োজন, সকলেই মানবপিতা। তর্পণকারীর সহিত সকলেরই জন্মগত যোগ রহিয়াছে। জীব ও জীবাংশক লইয়া পূর্ব্বে যে আভাষ দিয়াছি এখানেও সেই আভাষ পাইতেছি।

তৎপরে জীবভাবে মানবের এইখানে যত কিছু সঙ্কোচ কুণ্ঠা কার্পণ্য (ওঁ) যেঽবান্ধবা বান্ধবা বা যেঽন্য জন্মনি বান্ধবাঃ। তে তৃপ্তিমখিলাং যান্তু যে চাস্মত্তোয়কাঙ্ক্ষিণঃ॥"

মানবজীবের অজ্ঞান, অভিমান, অহঙ্কার, সঙ্কোচ, কুণ্ঠা, কার্পণ্য মানবকে এত ছোট সঙ্কীর্ণ করিয়া দিতেছে, যে "মহালয়ায়" মানব এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডা-লয়ের ব্রহ্ম হইতে স্তম্ব পর্য্যন্ত জগৎকে নিঃসঙ্কোচে 'তর্পণ' করিতে সমর্থ হইলেও—স্বয়ং ব্রহ্মা, দেবগণ, ঋষিগণ, আদি মানবগণ, মানব-পিতৃগণ, যম, পিতৃদেবগণ (পিতৃপীঠ) ইত্যাদি পূর্ব্ববর্ণিত ক্রমে সকলকেই নিঃসঙ্কোচে তর্পণাঞ্জলি প্রদান করিতে কুণ্ঠিত বা ইতস্ততঃ করিতে হয় নাই; কিন্তু অবান্ধব বান্ধব জন্মান্তরের বান্ধবদিগকে তৃপ্ত করিবার বেলায় তেমন সাহস হইল না। কি জানি যদি তাঁরা উপেক্ষা করেন, অগ্রাহ্য করেন, অপমান বোধ করেন, কি জানি কি, কি জানি কেন, লইবেন কিনা এই সব ভাবিতে সঙ্কোচ, কুণ্ঠায় ভয়ে ভয়ে অগ্রসর হইয়া বলিলেন—"তে তৃপ্তিমখিলাং যান্তু যে চাস্মত্তোয়কাঙ্ক্ষিণঃ" তাঁরা সকলেই তৃপ্তি লাভ করুন যাঁরা আমার প্রদত্ত "তোয়" আকাঙ্ক্ষা করেন। এখানে কতটা সঙ্কোচ, কতটা ভয় ভয়, কতটা কুণ্ঠা, কাকুতিভাবে তৃপ্তিদান করিতে অগ্রসর হইতে হইতেছে। পাছে মানবের অহঙ্কারে অভিমানে গর্ব্বে আভিজাত্যে আঘাত করে এবং তদ্ধেতু

আমাকেও সশঙ্ক সঙ্কুচিত হতাদর অপমানিত অথবা অপ্রতিভ, অপদস্থ হইতে হয়। হায়! মানবের সঙ্কীর্ণতা! তথাপি তাঁরা অবান্ধক বান্ধব জন্মান্তরের বান্ধব। তর্পণকর্ত্তার অবান্ধব বান্ধব নির্ব্বিশেষে এমন কি জন্মান্তরের বান্ধবদিগকেও তর্পণ করিতে উদ্যত হইয়া, অবান্ধব বা বান্ধব বলিয়া কোনও ক্ষোভ সঙ্কোচ অভিমান না রাখিয়াও তৃপ্ত করিতে উদ্যত হইয়াও এত সঙ্কোচ কুণ্ঠাভাব, তাইত তাইত ভাব অবলম্বন করিয়া অগ্রসর হইতে হইয়াছে।

তৎপরে অগ্নিদগ্ধাদি তর্পণ। "অগ্নিদগ্ধাশ্চ যে জীবা যেঽপ্যদগ্ধা কুলে মম। ভূমৌ দত্তেন তৃপ্যন্তু তৃপ্তা যান্তু পরাং গতিম্॥" মন্ত্রপূত সলিলাঞ্জলি ভূমে নিক্ষেপ করিয়া তর্পণ করিবার বিধি।

বাসনানলদগ্ধ সংসারতাপ-প্রপীড়িত জীব, যিনি অগ্নিদাহে অপমৃত্যু লাভ করিয়াছেন; অথবা আমাদের কুলে যাঁহার মৃত্যু অন্তে অগ্নি-ক্রিয়া (অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া) হয় নাই, তাঁহাদিগের তৃপ্তির জন্য ভূমে দত্ত তর্পণাঞ্জলি গ্রহণ করিয়া তৃপ্ত হইয়া উৎকৃষ্ট গতি লাভ করুন, উক্ত মন্ত্র দ্বারা ইচ্ছাশক্তি প্রেরণা দেওয়া হইয়াছে।

স্থূলভোগে আসক্ত জীব প্রেতাসক্তিতে ক্ষিতিকে ভোগের জন্য আঁকড়াইয়া বাসনানলে জ্বলিয়া পুড়িয়া খাক্ হইয়া অপহত আত্মাকে ভূমে তর্পণাঞ্জলি দ্বারা তৃপ্ত করিয়া উদ্ধার করিবার ব্যবস্থা।

অগ্নিসৎকার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় করিবার তাৎপর্য্য এই ভোগদেহ স্থূলভোগে বাসনাসক্ত জীব স্থূলদেহ ভোগে অত্যাসক্ত হয়, শেষে স্থূলদেহটার ভোগের তোয়াজ করিতে করিতে দেহটার প্রতি এত আকৃষ্ট হয় যে শেষে স্থূলদেহটা ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াও, ত্যক্ত দেহের প্রতি আকৃষ্ট থাকে। দেহটা ভস্ম করিয়া "দেহটার গতি" করা হয়। অগ্নিপূত হইয়া শবদেহ সহজে ও শীঘ্র পাঞ্চভৌতিক স্থূলদেহটা সূক্ষ্ম পঞ্চভূতে মিশাইয়া যায় অতি শীঘ্র। অদগ্ধ হইলে স্থূলপঞ্চভূতে স্থূলপাঞ্চভৌতিক দেহটা স্থূলগতি প্রাপ্ত হয়—প্রেতের আকর্ষণটা ঐ ভূমির দিকেই থাকে, আবার জীবিত মনুষ্য অগ্নিদাহ-যন্ত্রণায় মৃত হইলে, অগ্নিপূত হইয়া মরে না, বাসনাগ্নির জ্বালার সঙ্গে আবার অগ্নিদাহ জ্বালা অতি তীব্রতরভাবে "আত্মা"কে পীড়িত করে।

তৎপরে বস্ত্রনিষ্পীড়ন জল দ্বারা "যে চাস্মাকং কুলে জাতা অপুত্রা গোত্রিণো মৃতাঃ। তে তৃপ্যন্তু ময়া দত্তং বস্ত্রনিষ্পীড়নোদকম্।

বস্ত্র-নিষ্পীড়নোদক দ্বারা অপুত্রক বা গোত্র-চ্যুত যে মানব, আমাদের কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া দেহত্যাগ করিয়াছেন তাঁহাকে তর্পণ করিতেছি।

সংসারের বাসনাসক্ত জীব, পুত্রাদিতে বাসনার ক্রম, পর্য্যায় (Continuity) রাখিয়া সংসার ত্যাগ (স্থূলদেহ ত্যাগ) করে, কিন্তু বাসনাসক্তি আছে, অথচ অপুত্রক, (Barrenness) বীজ নষ্টতা, একটা ভীষণ অশান্তি, বাসনা হইতে অর্থাৎ আমি আমাকে রাখিয়া যাইব এই ইচ্ছা প্রচেষ্টা হইতে বীজ সঞ্চার হয়, জীবের বীর্য্য বীজ-শূন্য অর্থাৎ প্রণষ্ট-বীজ হওয়া অত্যন্ত বিকৃত অবস্থা, ভ্রষ্টতা হইতে জাত হয় (Ideas ভাব ভ্রষ্টতা।)

আর গোত্রচ্যুত হওয়াও ঐরূপ একটা অবস্থা ; প্রাণিজগতে জন্তুদিগের মধ্যে species, tribes, ইত্যাদি বিশিষ্টতা আছে, গোত্রও মানবের একটা বিশিষ্টতা, মানব একটা গোত্র (clan, race, tribe ইত্যাদি সন্নিবিষ্ট।) আর্য্য হিন্দুগণ জ্ঞানমার্গে এক একটা ভাবের বিশিষ্টতা, জ্ঞানের বিশিষ্টতা, এক একজন বিশিষ্ট ঋষির পুত্র শিষ্য, অনুগত বা আদর্শরূপে গ্রহণ করিয়া চিন্তার ধারা, ভাবের ধারা, জ্ঞানের ধারা, সাধনার ধারা অবলম্বন করিয়া আসিতেছেন, অজ্ঞানতায় ভ্রষ্ট হইয়া গোত্র-ত্যাগ বা গোত্রচ্যুতি মানবাত্মার পক্ষে ভীষণ দুর্দ্দৈব।

কুলচ্যুত, গোত্রচ্যুত, কুলচ্যুতা গোত্রচ্যুতা অনেক সময়েই ভ্রষ্টতা হইতে হয়, এরূপ ভ্রষ্ট জীব বাসনার দাস হইয়া, বাসনাসক্তভাবে সংসার প্রবিষ্ট হইয়া প্রণষ্টবীজ নির্ব্বীর্য্য হইয়া অপুত্রক সংসারচ্যুত (মৃত) হইলে, অথবা ভ্রষ্টতাবশতঃ আত্মায় ভ্রষ্ট হইয়া দেহ মন বা প্রাণের আকর্ষণে, ভোগের মোহে পড়িয়া গোত্রচ্যুত কুলচ্যুত "আত্মার" তৃপ্তির জন্য বসন-নিষ্পিষ্ট সলিল দ্বারা তর্পণাঞ্জলি প্রদান।

ভ্রষ্ট আত্মার তর্পণান্তে পিতৃ-স্তুতি মন্ত্র দ্বারা স্তুতি করিতে হইবে।

"পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্ম, পিতা হি পরমন্তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ।"

পিতা কে ? পিতা কি ? আগে বুঝা যাউক, 'পিতা' অর্থাৎ পালনকর্ত্তা, জন্মদাতৃরূপে স্থূলদেহ মুর্ত্তিতে যিনি, তিনি ত নশ্বরদেহী ? দেহটা কি পিতা ? অথবা আত্মা ?

'আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ' সুতরাং আত্মাই পিতা, পাবকরূপী 'আত্মা' পিতা ? উত্তম পুত্র কে ? আত্মজ ? আত্ম হইতে জাত ? তাহা হইলে 'আত্মাই' পুত্র, 'আত্মাই' পিতা ?

আত্মাকে পালন করে কে ? 'ধর্ম্ম' ; সুতরাং 'ধর্ম্মই' হচ্চেন পিতা, 'পিতা স্বর্গঃ' স্ব অর্থাৎ 'Self' 'I' ; জীবকে যে স্ব-গত হইবার সাহায্য করে elevate

করে উন্নত করে। সুতরাং পিতা হচ্চেন "স্বর্গ"। "পিতাহি পরমস্তপঃ" পিতাই পরম তপস্যা, অর্থাৎ আত্মা প্রেরণা তাপ আত্ম-চৈতন্য যাঁহা হইতে পাই তিনিই পিতা। সেই পিতার প্রীতির জন্যই সর্ব্বদেবতাদিগকে (anything good, divine "সৎ" "সত্য") প্রীত করা হয়। সুতরাং পিতা কে? পরমেশ্বর পরমপিতা পরমাত্মা।

তবে এ দেহী পিতা কে? পার্ব্বতী-পরমেশ্বরাধিষ্ঠিত মানবমূর্ত্তিতে তিনিই। জগৎপিতা মানব-শরীরে মানবীয় ভাবে মানবমূর্ত্তিতে "জগতঃ পিতরৌ" পার্ব্বতী-পরমেশ্বরের "প্রতীক"। এই "প্রতীকরূপী "স্ব-স্বরূপ" শরীরী পিতার মধ্যবর্ত্তিতায় পরমপিতা পরমেশ্বরের পরমাত্মাকে ধারণায় প্রাপ্ত হই।

এই ত তর্পণ-ক্রিয়ার স্বরূপাভাষ বলিয়া মনে হয়। আমি সামান্য-বুদ্ধি, এ বিষয় উপদেশ-তত্ত্বলাভের প্রার্থনা করিয়া আমার আত্ম-ধারণায় তর্পণ-রহস্য বিবৃত করিলাম।

"ভূমে গরীয়সী মাতা স্বর্গাদুচ্চতরঃ পিতা"।

মাতা পরমেশ্বরীর প্রতীক জননীত্বের প্রত্যক্ষ মূর্ত্তি। সাক্ষাৎ ভগবতী প্রকৃতি-স্বরূপিণী। এই জন্মভূমি ধরিত্রীর মানবীয় প্রতীকমূর্ত্তি। পিতা স্বর্গ হইতেও উচ্চতর। পিতৃস্তুতিতে "পিতা স্বর্গঃ" অর্থাৎ জীবাত্মাকে ঊর্দ্ধগত স্বর্গত হইবার (elevate, develope) করিবার সাহায্য করেন, পালন করেন বলিয়া "পিতা স্বর্গঃ" বলা হইয়াছে। কিন্তু, পিতা স্বর্গ হইতেও উচ্চতর, তিনি স্বর্গ হইতে উচ্চতর না হইলে তিনি "স্ব-র্গত" হইবার সাহায্য করিবেন কিরূপে?

সুতরাং পরমপিতা পরমেশ্বর হ'চ্চেন স্বর্গাদুচ্চতর। পরমাত্মায় বিলীন হওয়াই "আত্মার" উদ্দেশ্য। জীব সংসার-লীলা সাঙ্গ করিয়া চরমে পরমেশ্বরে লয়-প্রাপ্ত অর্থাৎ লীন হইবে। সুতরাং জীবের পিতা পরমপিতা। সাক্ষাৎ দেহমূর্ত্তি পিতা তাঁরই সাক্ষাৎ প্রতীক।

পিতৃ নমস্কার-মন্ত্র "পিতৃন্নমস্তে দিবি যে চ মূর্ত্তাঃ। স্বধাভুজঃ কাম্যফলাভি-সন্ধৌ। প্রদানশক্তাঃ সকলেপ্সিতানাং বিমুক্তিদা যেঽনভিসংহিতেষু॥"

দিবি অর্থাৎ দিব্যলোকবাসী স্ব-ধাভুক্ কাম্যফল-অভিসন্ধি (ইচ্ছা, বাসনা) পরিপুরণ করিতে যিনি সমর্থ, সকল অভীপ্সা-প্রদান-শক্ত অর্থাৎ যিনি সকল কামনা, বাসনা, অভিসন্ধি, অভীপ্সা পরিপুরণে সমর্থ, এবং অনভিসংহিত হইলে মুক্তি প্রদান করিতে পারেন। বাসনার বিনিবৃত্তি হইলে মুক্তি-প্রদানের ক্ষমতাও পিতারই আছে।

বাসনাবদ্ধ জীব, বাসনানুগত হইয়া পিতৃ-বাসনার মধ্যগত হইয়া বাসনার ক্রম-পর্য্যায় (Continuity) রক্ষা করিবার জন্য বাসনাপিণ্ড পুত্রকে সংসারে রাখিয়া যান, পুত্র বাসনাপিণ্ড দান করিয়া পিতৃলোককে পরিতৃপ্ত করিয়া, পিতৃলোকের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া বাসনা-মুক্তির জন্যও তাঁহাদেরই সাহায্য পাইতে সমর্থ।

মহালয়ায় পিতৃলোকগণের শ্রাদ্ধ তর্পণ করিয়া চিন্ময়ী ভগবতী ও ভগবানকে চিত্তে ধারণা করিবার জন্য ভগবৎ সাধনায় প্রবৃত্তি হয়—সেইজন্য মহালয়ার পরে দেবীপক্ষ।

তর্পণ-শাস্ত্রাদির দ্বারা আমরা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সহিত (Universe) যোগ রক্ষা করিয়া ভগবদুপাসনাই করিয়া থাকি। এখন "মরা গোরুতে ঘাস খাচ্চে কিনা" অথবা "কর্ত্তারপুরের বেগুন খেতে জল-সিঞ্চন হচ্চে কিনা" অবধারণ করুন।

রোমান ক্যাথলিক খৃষ্টানদেরও মহালয়া ইত্যাদি পার্ব্বণ শ্রাদ্ধের ন্যায় একটি প্রথা আছে, উহার নাম; "All Souls' Day"। আত্মপর নির্ব্বিশেষে শত্রু-মিত্র-নির্ব্বিশেষে সকল পরলোকগত আত্মার উদ্দেশ্যে সেই সকল "আত্মার" উদ্ধারের জন্য প্রার্থনা করা হয়, এবং তদ্দারা "আত্মোদ্ধার" জন্যও পরলোকগত পবিত্রলোকস্থিত "আত্মাদের" নিকট "স্বাত্মা" অর্থাৎ উপাসনাকারীর নিজ আত্মার কল্যাণের জন্য আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করা হয়।

মুসলমানদিগেরও "সবেবরাত"নামক একটি বিশেষ পার্ব্বণ আছে। উক্ত পর্ব্বদিবসে তাঁহারা মসজিদ প্রভৃতি পবিত্র স্থান দীপান্বিত করেন এবং পরলোকগত "আত্মা" সমূহের কল্যাণের জন্য উপাসনাদি এবং দরিদ্রনারায়ণদিগকে দান খয়রাত করেন। হিন্দুদিগের দীপান্বিতা অমাবস্যা ভূতচতুর্দ্দশী পর্ব্বাহ তিথিতে "চতুর্দ্দশ যম-তর্পণ" চতুর্দ্দশীতে, এবং দীপান্বিতা মহা অমাবস্যায় "পার্ব্বণ-শ্রাদ্ধ" করিবার বিধি আছে। সুতরাং দেখা যায় শাস্ত্রানুশাসন, ব্যবহার-প্রক্রিয়াভেদ থাকিলেও, মানব মানবীয় ধর্ম্মের উদ্দেশ্যে একই পথে একই নির্দ্দিষ্ট গন্তব্যে চলিয়াছে। পথ ও উপায় বিভিন্ন হইলেও উদ্দেশ্য এবং গন্তব্য একই—এক ও অদ্বিতীয়ের উদ্দেশ্যে পরমাত্মার কাছে আত্মার কল্যাণ ও মুক্তির কামনা।

গীতা-নাটক।

প্রথম দৃশ্য।

ধৃতরাষ্ট্র-গৃহ—হস্তিনাপুর।

সঞ্জয় ও ধৃতরাষ্ট্রের কথোপকথন।

ধৃতরাষ্ট্র। (স্বগত) যদমু কুরুক্ষেত্রং দেবানাং দেব-যজনম্। সর্ব্বেষাং ভূতানাং ব্রহ্মসদনম্। আশা ক'রে ছিলাম যে কুরুক্ষেত্ররূপ মহাপুণ্য ভূমিতে বিশেষতঃ মহারাজ যুধিষ্ঠির যুদ্ধ করিতে দিবেন না। কিন্তু শুন্তে পাচ্ছি যুদ্ধের সম্পূর্ণ আয়োজন। কালের এমনি মাহাত্ম্য! আমার পাপের সীমা নাই। তাই এ বৃদ্ধ বয়সে চক্ষু-অভাবে যদিও দেখ্‌বার ক্ষমতা নাই এ পাপ কর্ণ-কুহরে কতই শুন্‌তে হবে। কুরুকুল ধ্বংস পাবে এ যদিও চর্ম্ম-চক্ষে দেখ্‌তে পাব না জ্ঞানচক্ষে যে এখনি দেখ্‌ছি। আমি আর কি কর্ত্তে পারি? সকলি ত সেই মহাযোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের লীলা।

সঞ্জয়। মহারাজ কি চিন্তা কচ্ছেন?

ধৃতরাষ্ট্র। কি আর চিন্তা করব। আমার চিন্তারও অভাব নাই; এবং আমার চিন্তায়ও কোন ফল নাই। ঘোর সাংসারিক চিন্তায় আমি এ বয়সেও চিন্তামণিকে চিন্তা কর্ত্তে অবসর পে'লাম না। বলি, পাণ্ডব-কৌরবে কি করে? কিছু কি অবগত হ'তে পেরেছ?

সঞ্জয়। মহারাজ! কি আর বল্‌ব! কুরুপাণ্ডব উভয়পক্ষই যুদ্ধেই কৃত-নিশ্চয় হ'য়ে অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্য ও শ্রীকৃষ্ণ সমভিব্যাহারে কুরুক্ষেত্রে সমবেত হ'য়েছেন। আর বিলম্ব নাই। আর রক্ষারও উপায় নাই। স্বয়ং রক্ষাকারী যখন উদ্যোগী হ'য়েছেন তখন কার সাধ্য যে এ ঘোরতর সমরে পক্ষগণকে নিবৃত্ত করে? মহারাজ! জগৎ-সৃষ্টি লীলামাত্র। প্রয়োজন না থাক্‌লেও স্বভাব-অনুসারে ভগবানের লীলারূপা প্রবৃত্তি হ'য়ে থাকে। এস্থলে ত প্রয়োজনই আছে——তা—তা—

গান্ধারীর প্রবেশ।

গান্ধারী। মহারাজ! ওঃ! মহাত্মা সঞ্জয়ও এখানে বিদ্যমান দেখ্‌ছি! তাইত প্রাণটা আমার সদাই বলে সঞ্জয় অপেক্ষা মহারাজের হিতাকাঙ্ক্ষী

ও প্রিয় আর কেউ নাই। কাজেও তাই দেখ্‌ছি। এ দুঃসময়ে মিত্র ভিন্ন শত্রুতে কি আর কাছে থেকে বৃদ্ধ ও অচলকে প্রবোধ দিতে আসে? মহারাজ! আমি ত আর স্থির থাকৃতে পাচ্ছি না। আহা! পুত্রবধূগণের চোখের জলেই বুঝি আমাকে আরও অধীর হ'তে হবে।

ধৃতরাষ্ট্র। মহারাণি! কি বল্‌ছো! তুমি আমাকে যেরূপ ভক্তি শ্রদ্ধা কর, সঞ্জয় তদপেক্ষা কিছুই কম করেন না। সঞ্জয় যেভাবে আমায় শুশ্রূষা করেন আমি তাতেই বড়ই তৃপ্তিলাভ করি। গান্ধারি! এ সময়ে কি মনে কোরে আমার কাছে এসেছ? তোমার কি কোন কথা আছে? যা থাকে, বল্‌তে বাধা নাই—বল।

গান্ধারী। কি আর বল্‌ব মহারাজ! আর বল্‌বার ত বিশেষ কিছু নেই; তবে সমরক্ষেত্রের বিষয়টা কিছু জান্‌তে ইচ্ছা কোরে এসেছিলাম। (কাঁদিতে কাঁদিতে) আমি এমন কি পুণ্য কার্য্য করেছি যাতে আমার পুত্রগণ যুদ্ধে জয়ী হ'য়ে আমার ও তোমার আনন্দ বর্দ্ধন ক'রবে।

নেপথ্যে গীত।

ভগাধ্যাসে ভগী ক্ষেপী, ক্ষেপায় ঐ ক্ষেপাগণে।
কি রঙ্গ হরি! দেখ্‌বে এস, এ ভব-শ্মশানে॥
শ্মশানের পথ দেখে, বেগে খিল ধরে বুকে;
প্রাণ উড়ু উড়ু করে, হেরে রণক্ষেত্র পানে॥
চিতায় তুলে মিলে সবে, আত্মীয়-বান্ধব ভবে;
মুখে অগ্নি জ্বেলে দিবে, হরি মন্ত্র উচ্চারণে॥
ক্ষণ তথা স্থায়ী হ'লে, প্রাণ যে উঠে উথলে;
ইচ্ছা হয় পড়ি ভূতলে, মাখ্‌ব ভস্ম সজ্ঞানে॥
ধক্ ধক্ চিতা জ্বলে, হয় প্রাণ ভয়াকুলে;
আধ্যাত্মিক ভাবে বলে, সব জ্ঞান অনিত্য মনে।
চিতানলে জল ঢেলে, নাভি গঙ্গা জলে ফেলে,
পূর্ণ কুম্ভ দিয়ে ভেঙ্গে, যাবে সবে গঙ্গা পানে।
গঙ্গামাটী গায়ে মেখে, হরি হরি ধ্বনি মুখে,
গঙ্গা-জলে স্নান করে, শুদ্ধ হবে তিল-তর্পণে।
হরি ব'লে সকলেতে, দেহান্তর হবে যেতে,
আত্মার স্বধর্ম্ম পেতে, ত্রিভুবনায়ত্ত জ্ঞানে॥

ধৃতরাষ্ট্র। মহারাণি! অন্তরীক্ষে যে গীতধ্বনি হ'ল,—এ কে গায়? তা কি জান? তুমি যা জান্‌বার জন্যে আমার কাছে এসেছ তা কি ঐ গীত হ'তে বুঝ্‌তে পাচ্ছ কিছু? আমার জ্ঞানে আর কিছু বল্‌বার নাই। যদি কিছু জান্‌তে শুন্‌তে হয়, মহাত্মা সঞ্জয় বল্‌বেন—

সঞ্জয়। (স্বগত) তাকি আর বুঝ্‌তে বাকি আছে? সবই বুঝ্‌ছেন! বুঝ্‌লে কি হবে? মহামায়ার সংযোগে জ্ঞানহারা! লীলাময়ের সংযোগ যখন হবে তখনি জ্ঞান-প্রদীপ জ্বলিয়া অন্ধকার নাশ কর্‌বে। (প্রকাশ্যে) মহারাজ! ভগবানের কৃপায় মহারাণী যথেষ্ট জ্ঞান প্রাপ্ত হ'য়েছেন। সকল কামনা তাঁর মনে লয় পেয়েছে, তাঁকে আর আপ্‌নার কিছু বোঝাতে হবে না। এখন বিদায় দিন, গৃহে গিয়ে অবস্থান করুন।

গান্ধারী। মহারাজ! বুঝ্‌তে পার্‌ছি এ যুদ্ধ কেবল লোকক্ষয় জন্যই অবশ্যম্ভাবী। অতএব এ সময় আর শোক-প্রকাশের প্রয়োজন নাই।

(গান্ধারীর প্রস্থান)

পটক্ষেপণ।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

সমরক্ষেত্র। কৌরবপক্ষ।

দ্রোণ, ভীষ্ম ও দুর্য্যোধন।

দুর্য্যোধন। দেখ গুরো! তব শিষ্য দ্রুপদ-তনয়।
পাণ্ডু-চমূ-ব্যূহ বহু সুন্দর রচয়।
ব্যূহ মধ্যে ভীমার্জ্জুন বীর যুযুধান
বিরাট দ্রুপদসম সবে বিদ্যমান।
ধৃষ্টকেতু, চেকিতান, আদি পুরোজিত,
কাশীরাজ, কুন্তীভোজ, শৈব সুবিদিত।
যুধামন্যু, অভিমন্যু, উত্তমৌজা বীর
সৌভদ্র, দ্রৌপদী-পুত্র পঞ্চরথি-শির।
মম পক্ষে বীরোত্তম বিখ্যাত নায়ক
অবগতি হেতু গুরো! শুনহ তারক।

মম পক্ষে যুদ্ধ-জেতা গুরু, ভীষ্ম, কর্ণ,
অশ্বত্থামা, সৌমদত্তি, কৃপ ও বিকর্ণ।
যুদ্ধ-বিদ্যা-বিশারদ অস্ত্র বহু মত—
অপর অসংখ্য যোদ্ধা প্রাণ দিতে রত।
অপর্য্যাপ্ত মম সৈন্য ভীষ্ম-সুরক্ষিত,
পর্য্যাপ্ত পাণ্ডব-সৈন্য বৃকোদরাশ্রিত।
থাকি সবে ব্যূহ-পথে সশস্ত্রে স্বস্থানে—
কর রক্ষা ভীষ্ম বীরে অতি সাবধানে।
দেখিব, দেখাব সবে পাণ্ডব-সেনায়,
কৌরব গৌরব কত ধরে মহীতলে;
নাশিব পাণ্ডবগণে; শাসিব যতনে,
উন্মূলিব পাণ্ডু-নাম ধরার ভিতরে।

দ্রোণ। জানি সব, বিবরণ নাহি প্রয়োজন,
ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন॥
শিষ্য তুমি গুরুবাক্য ক'রো না লঙ্ঘন,
জয়-পরাজয় কেন করিছ চিন্তন?
ক্ষত্রিয়-বীরের কিবা পরাজয়ে ভয়;
কে মরিবে, কে বাঁচিবে, নাহিক নিশ্চয়॥
বীর তুমি ধরাতলে, ভীষ্ম রাজগণ—
আর আর বহু বীর আছে বিদ্যমান॥
কেহ নহে ন্যূন; সবে তোমারি কারণে
প্রস্তুত জীবন দিতে; নির্ভয় নিধনে॥
সর্ব্ব-মূল অন্তর্য্যামী করিও ভাবনা,
কর্ম্মফলে বাধ্য সবে; কিসের ভাবনা?
ভীষ্মবীরে রক্ষাহেতু চিন্তার কারণ
ঘটে নাই কিছু; ভাব ভবের চরণ;
ভব-ভাব মনে যবে হইবে উদয়
পারিবে বুঝিতে তবে কর্ত্তব্য কি হয়!

ভীষ্ম। (স্বগত) দুর্য্যোধনকে এখন উৎসাহিত করাই কর্ত্তব্য; বিনা যুদ্ধে সূচ্যগ্র ভূমি তাদের প্রদান করবেন না, এখন যুদ্ধকালে ভীতিগর্ভ উৎসাহ

প্রকাশ কর্চ্ছেন; কুরুক্ষেত্রে এ মহাসমর ক্ষত্রিয়গণের পক্ষে ধর্ম্মযুদ্ধ বলিয়া গণ্য; কারণ অতি গর্ব্বী দম্ভোৎসাহী কৌরবগণকে বধ করিয়া ধর্ম্মরাজ্য-সংস্থাপনই ঈশ্বরের অভিপ্রেত; তাতে আর সন্দেহ নাই। কুরুপাণ্ডব নিমিত্তভাগী মাত্র। অতএব এখন উচ্চৈঃস্বরে শঙ্খধ্বনি করা যাক্, তাতেই দুর্য্যোধন ও অন্যান্য বীরগণ উৎসাহিত হবেন। (শঙ্খধ্বনি——— ভেরী প্রভৃতি সমস্ত বাদ্যযন্ত্রে প্রতিধ্বনিত ও তুমুল শব্দে রণবাদ্য উত্থিত)

পটক্ষেপণ।

তৃতীয় দৃশ্য।

শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুন রথে সমাসীন

(নেপথ্যে গীত।)

নিশ্চয় ভোগ প্রাক্তন, যাঁর ভাগ্যেতে যেমন,
যাঁরে সদয় ভগবান, তাঁর হয় কি অপমান ?
দুর্যোধন-কুমন্ত্রণা, দুর্ব্বাসা করে পারণা;
দুঃশাসন তেজ করি, বস্ত্র হরে দ্রৌপদীরি,
একান্তে সাধিলে হরি, দেন বস্ত্র অগণন।
দেখ রাজা রামচন্দ্র, স্বয়ং নারায়ণচন্দ্র
পিতৃআজ্ঞায় লণ্ডভণ্ড, বনে করি আগমন।
স্বয়ং দেব নারায়ণ, শৈল শিলায় লুকান,
কাল-ব্রহ্মে তাঁর হ'লে শালগ্রামে অধিষ্ঠান।
দেখ ভাই প্রাক্তনে, সে কৃত্তিকা-শর-বনে
কৃত্তিকারা পেলে পুত্র, করে কার্ত্তিক আবাহন
অতএব শুন মন, (কর) নিষ্কাম ধর্ম্মাবলম্বন,
নহিলে নিশ্চয় জান, হবে ভবে আগমন॥

অর্জ্জুন। কৌরব-পাণ্ডব আজি যুদ্ধ-বিদ্যাবল,
দেখাতে এ রণস্থলে সবে উপনীত;
বাজিতেছে শঙ্খ ভেরী কৌরবের ব্যূহে,
উৎসাহিত রাজগণ; নাশিতে সবায়।
রাখ হে অচ্যুত সখে! আমার বচন
উভ সেনা মাঝে রথ করহ স্থাপন;
যুদ্ধারম্ভে আগে আমি নিরখি নয়নে—
কোন্ বীর উপস্থিত মোর সনে রণে ?

হেরিতে একান্ত ইচ্ছা উপজিছে মনে
আমার কর্ত্তব্য যুদ্ধ করা কার সনে ?
দুষ্ট দুর্য্যোধন-প্রিয় কোন্ বীর ভবে
যুদ্ধক্ষেত্রে মম সনে অভয়ে যুঝিবে ?

শ্রীকৃষ্ণ। দিব্যচক্ষু খুলি বীর ! দেখ তাকাইয়া ;
ঐ দেখ কুরুসৈন্য সজ্জিত হইয়া
অপেক্ষা করিছে শুধু আমাদের তরে ;
বাজিতেছে শঙ্খ ভেরী ; ডাকিছে সমরে।
দেখ রাজা দুর্য্যোধন সভয়-অন্তরে
উৎসাহ প্রদান করে উপস্থিত বীরে।
গুরু দ্রোণ, ভীষ্ম বীর, নির্ভীক-হৃদয়ে
তুষিতেছে দুর্য্যোধনে নানা পরিচয়ে।
যুদ্ধবিদ্যা-বিশারদ, তোমার সমান—
দেখি না কৌরব ব্যূহে, আমি এখন।
তুমি ধনঞ্জয় জান সমর-কৌশলে
ভীমসম বীর আর কে আছে ভূতলে ?
অজেয় নকুল আর সহদেব বীর,
কাশীরাজ ধনুর্দ্ধর ধৃষ্টদ্যুম্ন ধীর,
শিখণ্ডী বিরাট জয়ী, সৌভদ্র সাত্যকি,
দ্রুপদ, দ্রৌপদীপুত্র, কেহ নহে বাকি।
আরো কত বীর আছে কি বলিব সখে,
সকলি ত উপস্থিত পাণ্ডবের পক্ষে।
দেখ পার্থ, দেখ তুমি আরও একবার
সমবেত কুরু সবে সম্মুখে তোমার।
বুঝহ বিচার করি, কুন্তীর কুমার
কি ভাবে কাহার সঙ্গে পার যুঝিবার ?
যুদ্ধবিদ্যা-বিশারদ বহু মহাবীর
সমাগত কুরুক্ষেত্রে কৌরব-শিবির।
ন্যূন নহে কেহ ; তবে তোমার সমান
অথবা ভীমের তুল্য ভীম-পরাক্রম
আছে কি কৌরব-দলে ? দেখ বিদ্যমান
তোমার সম্মুখে ; তারা করিছে বিক্রম।
বিলম্ব কর্ত্তব্য নহে ; শুন বীরবর,
রথের সারথি আমি হয়েছি তোমার।

(ক্রমশঃ)

শ্রীহরিঃ।

(১৮৪৫ সালের ২০ আইন্ মতে রেজেষ্টীকৃত)

হিন্দু-পত্রিকা।

৩১শ বর্ষ, ৩১শ খণ্ড
৯ম সংখ্যা।

পৌষ।

১৩৩১ সাল।
১৮৪৬ শকাব্দাঃ

আর্ত্তের প্রার্থনা।

লেথক—সম্পাদক।

(১)

নহি জ্ঞানী,
নহি জিজ্ঞাসু,
নহি অর্থার্থী ;
আর্ত্ত আমি
তাই তোমার
চরণ-প্রার্থী ॥

(২)

যায় দিন,
যায় রজনী—
না হয় শেষ
মম দুঃখ,
দৈন্য-দারিদ্র,
অশেষ ক্লেশ ॥

(৩)

দেহে ক্লান্তি,
মনে অশান্তি,
উন্মাদ-প্রায়
ভাঙ্গি গড়ি ;
কাল কাটাই,
ভাঙ্গা-গড়ায় ॥

(৪)

সব বুঝি,
কিছু বুঝি না,
নাই নিরিক।
অন্ধ প্রায়,—
ঘুরে বেড়াই,
দিক্ বিদিক্ ॥

(৫)

বর্ষা যায়,
শরৎ আসে,
হাসে চন্দ্রমা ;
এ হৃদয়ে—
সমান ভাবে,
বিরাজে অমা ॥

(৬)

হিম যায়,
বসন্ত আসে,
বহে মলয়,
দাস-গৃহ,
সব ঋতুতে,
হিম-আলয় ॥

(৭)

সুখ-দুখ,
শ্যাম দেশের
যমজ ভাই।
কোন দিন,
কারও সাত,
ছাড়াছাড়ি নাই ॥

(৮)

অতএব,
আর্ত্তি-হর,
বল সে দিন,
কবে আসিবে ?
জ্ঞান পেয়ে
যে দিন তোমা
দাসে ডাকিবে ॥

কামাখ্যা-দর্শন।

(লেখক—ডাক্তার শ্রীখগেন্দ্রনাথ বসু কাব্যবিনোদ, সাহিত্যভূষণ।)

সন ১৩২২ সালের শ্রাবণ মাসে কাকিনার কলেরা 'ডেপুটেশন' হইতে ফিরিবার কালে কামাখ্যাদর্শনে অভিলাষী হইয়া লালমণিরহাটে এক আত্মীয়ের বাসায় উপস্থিত হই। এখানে আসিয়া শুনিলাম আমার পিতৃস্বস্রীয় শ্রীমান্ সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ গৌহাটীর এসিষ্ট্যাণ্ট ষ্টেসন মাষ্টার। আমি আর কাল-বিলম্ব না করিয়া রাত্রের গাড়ীতে গৌহাটীর উদ্দেশে রওনা হইলাম ; পরদিন বেলা ১২টার সময় সুরেন্দ্রের বাসায় পৌছিলাম, পূর্ব্বেই তাহাকে তার করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। আহারাদির পর সুরেন্দ্রের কনিষ্ঠ খগেন্দ্রকে সঙ্গে লইয়া

গৌহাটী সহর দেখিতে বাহির হইলাম। গৌহাটীর প্রাচীন নাম প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর।

কালিকাপুরাণে উক্ত আছে—

অস্য মধ্যে স্থিতো ব্রহ্মা প্রাঙ্‌ নক্ষত্রং সসর্জ্জহ।
ততঃ প্রাগ্‌জ্যোতিষাখ্যেয়ং পুরী শক্রপুরী সমা॥

পূর্ব্বে ব্রহ্মা এইস্থানে থাকিয়া নক্ষত্রের সৃষ্টি করিয়াছিলেন; এই হেতু ইন্দ্রপুরী-সদৃশ এই পুরী প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর নামে আখ্যাত হইল।

গৌহাটী নাতিবৃহৎ সহর। নিতান্ত অল্পসময়ের মধ্যে সমস্ত সহর প্রদক্ষিণ করা অসম্ভব। কটন কলেজ, কার্জ্জন হল, লাইব্রেরী, গবর্ণমেণ্ট টেলিগ্রাফ আফিস, বালিকা-বিদ্যালয়, জাহাজঘাটা, দাতব্যচিকিৎসালয় ও শুক্রেশ্বর মহাদেবের মন্দির দেখিলাম। গৌহাটীতে চারিটী বাজার, ইহার মধ্যে মাত্র পানবাজার দেখা হইল। একমাস অতীত হইতে চলিল, এখানে ল কলেজ স্থাপিত হইয়াছে। সন্ধ্যার সময় ক্লান্ত হইয়া বাসায় ফিরিলাম।

সন্ধ্যার পর সুরেন্দ্রের নিকট শুনিলাম, তাহার পাণ্ডা গোবিন্দ চক্রবর্ত্তীর লোক, আমি আসিয়াছি কি ভাবে সংবাদ পাইয়া, আমাকে লইতে আসিয়াছিলেন। পরদিন সকালের ট্রেণে কামাখ্যায় যাইব ইহাই তাহাকে বলিয়া দেওয়া হইয়াছে।

এদেশের সর্ব্বত্রই শুনিতেছি, এখানকার প্রত্যেক পাণ্ডাই অতিশয় ভদ্র, বিনয়ী এবং যাত্রীদের প্রতি অত্যন্ত যত্নশীল; অন্যান্য তীর্থের পাণ্ডার ন্যায় অসভ্য, স্বেচ্ছাচারী এবং অত্যাচারী নহে। যাহা হউক. পরদিন সকালের ট্রেণে কামাখ্যায় পৌঁছিলাম। গৌহাটী হইতে কামাখ্যা ষ্টেসন মাত্র দুই মাইল, গাড়ী হইতে নামিয়াই পাণ্ডার লোকের সাক্ষাৎ পাইলাম।

এখন এক মাইল পর্ব্বতের উপর উঠিতে হইবে, ঠাকুরের সঙ্গে সঙ্গে চলিলাম। উপরে উঠিতে পাথরের সিড়ি, পথটী ঘুরিতে ঘুরিতে গিয়াছে। পথের দুইধারে অসংখ্য চাঁপাফুলের গাছ, রাস্তার উপরে রাশিকৃত ফুল পড়িয়া সুগন্ধ বিস্তার করিতেছে; চারিদিকেই নিবিড় জঙ্গল—মনে ভীতির সঞ্চার করে।

এই এক মাইল উপরে উঠিতেই আমার যে কি কষ্ট হইল তাহা বলিবার নহে। দুই স্থানে পূর্ণ বিশ্রাম লইয়াছিলাম, তাহা সত্ত্বেও সমস্ত শরীর ঘর্ম্মাপ্লুত হইয়া পরিচ্ছদাদি একেবারেই ভিজিয়া গিয়াছিল, হাঁপানীর সহিত চরণযুগল একেবারেই বিদ্রোহী হইয়া উঠিল।

সোপানপথ সম্বন্ধে একটী প্রবাদ আছে। এক সময়ে নরকাসুর নামে এক অসুর কামাখ্যাদেবীর রূপে মোহিত হইয়া তাহাকে পত্নীরূপে লইতে ইচ্ছা

করে। ভগবতী তাহাকে বলিলেন, যদি একরাত্রির মধ্যে তুমি আমার পর্ব্বতের চারিদিকে চারিটী রাস্তা এবং একটী প্রস্তরের বিশ্রাম-গৃহ প্রস্তুত করিয়া দিতে পার, তবেই আমাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিতে পারিবে। অসুর মহামায়ার মায়ায় মুগ্ধ হইয়া কার্য্য আরম্ভ করিল। মদগর্ব্বিত অসুর রাত্রি-প্রভাতের বহু পূর্ব্বেই তাহার কার্য্য সম্পন্ন করিবার উপক্রম করিল দেখিয়া ভগবতী মায়া দ্বারা একটী কুক্কুট কর্ত্তৃক নিশাবসান-জ্ঞাপক ধ্বনি করাইয়া অসুরকে বলিলেন—তোমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইয়াছে, রাত্রি প্রভাত হইয়াছে; ঐ শোন কুক্কুটের ধ্বনি। অসুর ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সেই কুক্কুটের প্রাণ-সংহার করে। এইরূপ কিম্বদন্তী আসামস্থ রাজবাটীর বুরঞ্জীতে দেখিতে পাওয়া যায়।

বেলা ৭॥টা বাজিতেই পাণ্ডা-ঠাকুরের বাটীতে উপস্থিত হইলাম। একখানি দোতালা টিনের ঘর, আমি সেই ঘরের উপর তালায় নীত হইলাম।

কামাখ্যা কামরূপ রাজ্যের অন্তর্গত। এই কামরূপ একটী প্রসিদ্ধ পৌরাণিক রাজ্য। কালিকাপুরাণে আছে—

শম্ভু-নেত্রাগ্নি-নির্দ্দগ্ধঃ কামঃ শম্ভোরনুগ্রহাৎ।
তত্র রূপং যতঃ প্রাপ কামরূপং ততোঽভবৎ ॥

মহাদেবের নেত্রকোপানলে কামদেব ভস্মীভূত হইবার পরে তাঁহারই অনুগ্রহে এইস্থানেই পূর্ব্বরূপ প্রাপ্ত হন। তখন হইতেই এই দেশ কামরূপ নামে প্রসিদ্ধ। পুরাণাদিতে এই কামরূপে অনেক তীর্থের নাম দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু ইহার অধিকাংশ অনির্দ্দিষ্ট এবং অনেক তীর্থকে ব্রহ্মপুত্র গ্রাস করিয়াছে। কামরূপ নামের অন্যবিধ ব্যাখ্যা অন্যত্র দেখিতে পাওয়া যায়। যোগিনীতন্ত্রে আছে—

কৃতে কর্ম্মণি সিধ্যেত কামনাশু সুরেশ্বরি।
ততো মর্ত্ত্যঃ কামরূপমিতি রূপমকল্পয়ৎ ॥

হে সুরেশ্বরি! মানব এই পীঠে যে কোন কামনা করিয়া জপ ও পূজা করিলে তাহার কামনা অতি শীঘ্র সিদ্ধিলাভ করে বলিয়া মর্ত্ত্যবাসিগণ এই দেশকে কামরূপ নামে অভিহিত করিয়াছেন।

কামাখ্যা শব্দের উৎপত্তি সম্বন্ধেও কালিকাপুরাণে আছে—

কামার্থমাগতা যস্মান্ময়া সার্দ্ধং মহাগিরৌ।
কামাখ্যা প্রোচ্যতে দেবী নীলশৈলে রহোগতা ॥
কামদা কামিনী কাম্যা কান্তা কামাঙ্গদায়িনী।
কামাঙ্গনাশিনী যস্মাৎ কামাখ্যা তেন চোচ্যতে ॥

কামাদি চতুর্ব্বর্গ ফল প্রদানের জন্য ভগবতী আমার সহিত এই মহাগিরিতে আসিয়াছিলেন। এই হেতু এই নীলশৈলে অবস্থিতা নির্জ্জনস্থা দেবী মহামায়া কামাখ্যা নামে অভিহিত হইয়াছেন। ইনি কামদা, কামিনী, কামা, কান্তা, কামাঙ্গদায়িনী এবং কামাঙ্গনাশিনী।

কামাখ্যা দেবী যে পর্ব্বতে অবস্থিত আছেন, তাহাকে নীলাচল অথবা নীল পর্ব্বত বলে। কালিকাপুরাণে আছে, একস্থানে মহাদেব বলিতেছেন—বিষ্ণুচক্রে যখন সতীর যোনিমণ্ডল পর্ব্বতরূপী আমাতে লীন হয়, তখনই পর্ব্বত নীলবর্ণ ধারণ করে এবং সেই জন্যই ইহার নাম নীলাচল।

আমি তৈল মাখিয়া গিরিশ ঠাকুরের সহিত স্নান করিতে গেলাম। কামাখ্যা দেবীর মন্দিরের সম্মুখে পাথর বাঁধান একটী ক্ষুদ্র পুষ্করিণী (ডোবা বলিলেও চলে), সেইখানেই আমাকে লইয়া আসিলেন, ইহারই নাম সৌভাগ্য-কুণ্ড; দর্শনের পূর্ব্বে এই কুণ্ডে স্নান করিতে হয়। যোগিনীতন্ত্রে আছে এই কুণ্ড স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্র প্রস্তুত করিয়াছিলেন, ইহাই কামাখ্যার ক্রীড়া-পুষ্করিণী।

সৌভাগ্যং নাম বৈ সরঃ ॥
ক্রীড়া-পুষ্করিণী সা হি কামাখ্যায়াঃ সুরেশ্বরি !
শক্রেণোৎপাদিতং কুণ্ডং সহ দেবৈর্মহেশ্বরি ॥

ঠাকুর আমাকে বিধিমত নিম্নলিখিত মন্ত্র পড়াইলে আমি কুণ্ড হইতে একটু জল লইয়া মস্তকে ধারণ করিলাম—

পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি ত্বয়ি তিষ্ঠন্তি সর্ব্বদা।
তস্মাৎ পুনীহি মাং কুণ্ড দেবদানব-পূজিত ॥
সর্ব্বতীর্থময়স্ত্বং হি সর্ব্বক্ষেত্রময়ো হ্যসি।
দশপূর্ব্বান্ দশপরান্ বংশানুদ্ধর পাপতঃ ॥

এখানকার কার্য্য সারিয়া ঠাকুরের সঙ্গে প্রথমেই কামাখ্যা দেবীর মন্দিরে প্রবেশ করিলাম।

অনেকেই জানেন দক্ষযজ্ঞে সতী দেহত্যাগ করিলে মহাদেব তাঁহার শোকে অধীর হইয়া সতীর মৃতদেহ স্কন্ধে করিয়া চতুর্দ্দিক ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে থাকেন। মহাদেবের এইরূপ উদাসীনতায় সৃষ্টির অনিষ্টাশঙ্কা করিয়া ভগবান বিষ্ণু তাঁহার চক্রদ্বারা মৃত সতীদেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া ভারতের বিভিন্ন স্থানে নিক্ষেপ করেন। যে যে স্থানে সেই দেহ পতিত হয়, সেই সেই স্থান মহাপীঠ নামে আখ্যাত হইয়া হিন্দুদিগের মহাতীর্থস্থান-রূপে পরিণত হয়।

এই নীলাচল-শিখরে সতীর যোনিমণ্ডল (মহামুদ্রা) পতিত হওয়াতে ইহা কামাখ্যা নামেই অভিহিত হইয়াছে ; এই নামের উৎপত্তির বিষয় পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

কামাখ্যা দেবীর মন্দিরের আবিষ্কার এবং নির্ম্মাণ সম্বন্ধে এইরূপ প্রবাদ শুনিতে পাওয়া যায়—

সে বহু পূর্ব্বকালের কথা। এক সময়ে কুচবিহারের রাজা বিশ্বসিংহ কতিপয় কোচ্ জাতীয় রাজাকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া কমতাপুর নগর অধিকার করেন, কিন্তু পরাভূত ক্ষুদ্র রাজগণ বিপক্ষাচরণে তাঁহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলে। রাজা বিশ্বসিংহ এবং তাঁহার ভ্রাতা শিবসিংহ শত্রুদমনার্থ ক্রমাগত পূর্ব্বাভিমুখে চলিতে চলিতে এইস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন এইস্থান নিবিড় জঙ্গলে পূর্ণ—মাত্র দুই একঘর মেষ এবং কোচ জাতীয় লোকের বসতি ছিল। ভ্রমণ করিতে করিতে একদিন অত্যন্ত ক্লান্ত এবং তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া রাজভ্রাতৃদ্বয় এক মেষভবনে উপস্থিত হইলেন, কিন্তু তথায় কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া নিতান্ত ক্ষুণ্ণচিত্তে ফিরিয়া আসেন, কিন্তু পথিমধ্যে এক বটবৃক্ষতলে একজন বৃদ্ধাকে বিশ্রাম করিতে দেখেন। তাহার সন্নিকটেই একটা প্রকাণ্ড মাটির ঢিপি তাঁহারা সর্ব্বপ্রথমে লক্ষ্য করেন, ঐ ঢিপির মধ্য হইতে প্রস্রবণের ন্যায় নির্ম্মল জল বহির্গত হইতেছিল। রাজভ্রাতৃদ্বয়কে পথশ্রমে ক্লান্ত ও তৃষ্ণার্ত্ত দেখিয়া বৃদ্ধা অতিযত্নের সহিত তাঁহাদের সেবাশুশ্রূষা করিলেন।

বৃদ্ধার যত্নে তৃপ্তিলাভান্তর মাটির ঢিপি সম্বন্ধে বিবিধ বিষয় জানিতে ইচ্ছুক হইয়া রাজা বিশ্বসিংহ এ বিষয় তাঁহাকে বিবৃত করিবার জন্য বৃদ্ধাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। বৃদ্ধা বলিলেন—ইহাই তাহাদের আরাধ্য দেবতা, তাঁহাকে পূজা করিতে হইলে ছাগাদি বলি দিতে হয়, তাঁহার পূজায় সিন্দূর এবং স্ত্রীলোকের পরিধেয় রক্তবস্ত্রাদিও লাগে। বৃদ্ধার কথা শুনিয়া রাজা অনুমান করিলেন, ইহা নিশ্চয়ই কোন শক্তিপীঠ। যাহা হৌক, রাজভ্রাতৃদ্বয় মহামায়ার নিকট প্রার্থনা করিলেন, তাঁহার কৃপায় যদি তাঁহারা সহচরগণকে পুনঃপ্রাপ্ত হন এবং রাজ্য নিষ্কণ্টক হয় তাহা হইলে তাহারা এইস্থানে সোণার মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিবেন।

যথাসময়ে রাজ্যে শান্তি স্থাপিত হইল, দেবীর মাহাত্ম্যে রাজা বিস্মিত হইলেন। নানাদেশ হইতে মহাপণ্ডিতগণকে রাজসভায় আনাইয়া এই বৃত্তান্ত সকলের গোচরীভূত করিয়া তাঁহাদিগকে সিদ্ধান্ত করিতে বলিলেন সেখানে কোন্ পীঠ গুপ্তভাবে আছে? পণ্ডিতমণ্ডলী নানা শাস্ত্রালোচনা করিয়া উহা

কামাখ্যা দেবীর পীঠস্থান বলিয়া স্থির করিলেন। তখন রাজা লোকজন লইয়া সেইস্থানে গমন করিলেন এবং বটগাছ কাটিয়া মৃত্তিকা খনন করিতে লাগিলেন। খনন করিতে করিতে যোনিমুদ্রাসহ একখানি পীঠ পাওয়া গেল, আরও খনন করিতে মন্দিরের নিম্নের অর্দ্ধভাগও বাহির হইল। কথিত আছে এই মন্দির কামদেব নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। যাহা হৌক, রাজা মৃত্তিকাপ্রোথিত অর্দ্ধমন্দিরের উপর অবশিষ্টাংশ নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন, প্রত্যেক ইষ্টকখণ্ডে একরতি করিয়া সোণা দেওয়া হইয়াছিল।

ইতিহাস-প্রসিদ্ধ কালাপাহাড় মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিলে হিন্দু দেবদেবীর অনেক মন্দির বিধ্বস্ত করিয়া ফেলেন, এইরূপ জনশ্রুতি আছে, কামাখ্যা দেবীর মন্দিরও তাঁহার হস্ত হইতে নিস্তার পায় নাই। ১৫৫৩ খৃষ্টাব্দে তিনি এই মন্দিরে উপরিভাগ ভূতলশায়ী করিয়া ফেলেন। বিশ্বসিংহের পুত্র রাজা নরনারায়ণ এই ভগ্ন মন্দিরের পুনঃসংস্কার করিয়াছিলেন। মন্দিরে প্রবেশ করিতেই দক্ষিণদিকে নরনারায়ণ ও তাঁহার ভ্রাতা শুক্লধ্বজের মূর্ত্তি তাঁহাদের কীর্ত্তির সাক্ষিরূপে বিরাজ করিতেছে!

কুচবিহারের রাজগণ দেবীর মন্দিরাদির সংস্কার সম্বন্ধে এতদূর করিলেও তাঁহাদের বংশধরগণ কামাখ্যা দেবী কর্ত্তৃকই অভিশপ্ত হইয়া আছেন। তাঁহারা কখনও এই মহাপীঠ দর্শন করা দূরে থাকুক, কামাখ্যা পর্ব্বতের দিকে দৃষ্টিপাতও করিতে পারেন না। এ বিষয়ে যে প্রবাদ প্রচলিত আছে, তাহা এইরূপ—রাজা নরনারায়ণের রাজত্বকালে কেন্দুকলাই নামে একজন সিদ্ধ ব্রাহ্মণ মায়ের পূজকরূপে নিযুক্ত ছিলেন। কথিত আছে প্রতিদিন সন্ধ্যারতির পর ভগবতী তাঁহাকে দেখা দিতেন; একথা রাজা শুনিতে পাইলেন। তিনি মায়ের স্বরূপ-মূর্ত্তি দেখিতে নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া ব্রাহ্মণকে অনেক ধনরত্নের লোভ দেখাইয়া বলিলেন—ঠাকুর! মায়ের চেতনমূর্ত্তি আমাকে দেখাইতেই হইবে, আমি তোমার শরণাগত।

ব্রাহ্মণ বলিলেন—"মা ভক্তাধীন। আমার কি সাধ্য আপনাকে দেখাইব? আপনি তাঁহাকে একমনে ডাকুন, তিনি অবশ্য আপনাকে দেখা দিবেন।" কিন্তু রাজা কিছুতেই শুনিলেন না, ব্রাহ্মণকে ধরিয়া বসিলেন। ব্রাহ্মণও রাজার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার উপায়ান্তর না দেখিয়া বলিলেন—সন্ধ্যায় পূজার পর স্তোত্র পাঠ করিয়া ঘণ্টাধ্বনি করিলে মহামায়া দেখা দিয়া থাকেন, আপনি সেই সময়ে যদি বলপূর্ব্বক দেখিতে পারেন আমার কোন আপত্তি নাই।

ব্রাহ্মণের কথায় মহাসন্তুষ্ট হইয়া রাজা সন্ধ্যার সময়ে মন্দির সন্নিকটে উপস্থিত হইলেন। ব্রাহ্মণের ঘণ্টাধ্বনি শুনিয়া গবাক্ষের ছিদ্র দিয়া উদ্বিগ্নচিত্তে মহামায়ার আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। তিনি দেখিলেন মন্দিরাভ্যন্তর সহসা উজ্জ্বল জ্যোতিতে আলোকিত হইয়া উঠিল, অব্যক্ত নূপুরশিঞ্জন তাঁহার কর্ণকুহরে যেন সুধাবর্ষণ করিতে লাগিল। মহামায়ার দর্শনাশায় তিনি অধিকতর উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিলেন, কিন্তু তিনি সহসা এক মর্ম্মঘাতী বাণী শুনিতে পাইলেন। দেবী রাজার উদ্দেশে নিদারুণ অভিশাপ দিয়া বলিলেন—"আজ হইতে তুমি বা তোমার কোন বংশধর আমার পীঠ দর্শন করা দূরের কথা, যদি এই পর্ব্বতে আরোহণ করে, তাহা হইলে তোমাদের বংশলোপ হইবে।" এই সময়ে ব্রাহ্মণের মস্তক বিচ্ছিন্ন হইয়া ভূতলে খসিয়া পড়িল। রাজা এইরূপে অভিশপ্ত হইয়া খিন্নমনে নিজরাজ্যে প্রস্থান করিলেন। সেই হইতে তাঁহার কোন বংশধর কামাখ্যাতীর্থে আসেন না।

(ক্রমশঃ)

ডাক্তার স্যর সুব্রহ্মণ্য আয়ার।

লেখক—সম্পাদক।

একে একে ভারত-গগনের উজ্জ্বল নক্ষত্রগুলি লোকদৃষ্টির বাহিরে চলিয়া যাইতেছে। "মৃত্যু" শব্দ ব্যবহার করিলাম না, কারণ আত্মা অজর, অমর এবং মৃত্যু কেবল আত্মার দেহত্যাগ ভিন্ন আর কিছুই নয়। আত্মীয় স্বজনের দেহত্যাগে আমরা দুঃখিত হই কেন? কারণ, আমরা মনে করি তাহাদের অস্তিত্ব-লোপ হইল। আত্মার নিত্যত্বে স্থিরবিশ্বাসী ব্যক্তির পক্ষে মৃত্যু-ব্যাপারে দুঃখিত হইবার কোন কারণ নাই। জরাজীর্ণ দেহত্যাগে নূতন সবল দেহধারীর বা দিব্যধামবাসীর বন্ধু-বান্ধবদিগের শোকের ত কোন কারণই নাই, পরন্তু আনন্দেরই হেতু রহিয়াছে। তথাপি জ্ঞানীরাও আত্মীয় স্বজনের মৃত্যুতে অন্ততঃ সাময়িক শোক পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হন না। যাঁহারা এ সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়া পরোপকারব্রতে আপনাদিগকে নিয়োজিত করেন, তাঁহাদের অভাব কেবল ব্যক্তিবিশেষের শোকের কারণ হয় না, সমস্ত দেশবাসী মনে করেন যে, যে

স্থান তাঁহারা শূন্য করিয়া গেলেন, সে স্থান আর কাহারও দ্বারা পূর্ণ হইবে না। অতি অল্প সময়ের মধ্যে বঙ্গদেশ হইতে কয়েকটী সমুজ্জ্বল রত্ন অন্তর্হিত হইয়াছে। এই সে দিন স্যর আশুতোষ চৌধুরী, স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, বাবু ভূপেন্দ্রনাথ বসু ইহ সংসার পরিত্যাগ করিয়া অমরধামে চলিয়া গিয়াছেন, দেশবাসী মাত্রেই তাঁহাদের জন্য শোকপ্রকাশ করিয়াছে; তাঁহারা স্বীয় স্বীয় কর্ম্মক্ষেত্রে জাতিধর্ম্মবর্ণনির্ব্বিশেষে জগতের উপকার করিয়া দেশবাসীর কৃতজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। আজ আমরা মান্দ্রাজদেশীয় স্বনামধন্য প্রবীণ ঋষিতুল্য সুব্রহ্মণ্য আয়ারের তিরোধান অবগত হইয়া তাঁহার কর্ম্মজীবনের কথা স্মরণ করিয়া একদিকে আনন্দ উপভোগ করিলাম, অন্যদিকে তিনি যে স্থান অধিকার করিতেন সে স্থান অধিকার করিবার অন্য কোন যোগ্য ব্যক্তি না দেখিতে পাইয়া অত্যন্ত বেদনানুভব করিলাম। সুব্রহ্মণ্য আয়ার বঙ্গদেশে সাধারণের নিকট সুপরিচিত ছিলেন না, কিন্তু তাঁহার জীবনী আলোচনা করিলে সকলেই ইহা উপলব্ধি করিতে পারিবেন যে সদাচারসম্পন্ন একজন ব্রাহ্মণও জাতি-ধর্ম্ম-বর্ণনির্ব্বিশেষে মানবসমাজের সেবা করিতে পারেন। মান্দ্রাজদেশীয় ব্রাহ্মণেরা মৎস্য-মাংস ব্যবহার করেন না, শাস্ত্র-অনুসারে শিষ্ট ও শুদ্ধাচারে বাস করেন, বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম মানিয়া চলেন। তাঁহাদের মতবিরোধীরাও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন যে মান্দ্রাজের ব্রাহ্মণের ন্যায় শৌচাচারসম্পন্ন লোক পৃথিবীর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। দরিদ্র হইলেও গৃহগুলি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, জঞ্জাল মাত্র নাই, দুর্গন্ধ মাত্র নাই, দেহে স্বর্ণকান্তি না থাকিলেও অতীব পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্ন, নির্ম্মল শুভ্রবেশ, মুখে সাত্ত্বিকতা দেদীপ্যমান। সুব্রহ্মণ্য এই মান্দ্রাজ ব্রাহ্মণ-সমাজেরই একজন। দরিদ্র-গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াও তিনি স্বীয় চরিত্র, বুদ্ধি এবং বিদ্যাবলে মান্দ্রাজ হাইকোর্টের অন্যতম বিচারপতির পদ লাভ করিয়াছিলেন এবং কয়েকবার অস্থায়িভাবে প্রধান বিচারপতির পদেও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। তিনি মদুরা জেলায় সামান্য কেরাণীগিরি কার্য্য করিতে আরম্ভ করেন, সেখান হইতে ওকালতি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ঐ স্থানেই ওকালতি করেন, এবং অল্পদিনের মধ্যেই স্থানীয় ব্যবহারাজীবদিগের মধ্যে স্বীয় প্রাধান্য স্থাপন করেন। কিছুদিন পরে মান্দ্রাজ হাইকোর্টে আসিয়া তথায় ওকালতি আরম্ভ করেন এবং তথাকার গবর্ণমেণ্ট উকিল নিযুক্ত হন। পূর্ব্বে ঐ পদে একজন ইংরাজ নিযুক্ত ছিলেন; সুব্রহ্মণ্যই তথাকার হাইকোর্টের প্রথম দেশীয় গবর্ণমেণ্ট উকিল। যখন তিনি মান্দ্রাজ হাইকোর্টে ওকালতি আরম্ভ করেন, তখন তথায় সুপ্রসিদ্ধ স্যর ভাষ্যম্

আয়াঙ্গারের সমকক্ষ উকিল কেহই ছিলেন না। ভাষ্যম্ আয়াঙ্গার যে শুধু মান্দ্রাজ হাইকোর্টেরই সর্ব্বপ্রধান উকিল ছিলেন তাহা নহে, সমগ্র ভারতে একমাত্র স্যর রাসবিহারী ঘোষ ব্যতীত আর কাহারও প্রতিভা তাঁহার প্রতিভার ন্যায় সমুজ্জ্বল ছিল না। যখন সুব্রহ্মণ্য আয়ার মান্দ্রাজ হাইকোর্টে কার্য্য আরম্ভ করেন, তখন তথাকার তৎকালীন চিফ্ জষ্টিশ স্যার চার্লস্ টার্ণার সুব্রহ্মণ্য আয়ারকে লক্ষ্য করিয়া ভাষ্যম্ আয়াঙ্গারকে সম্বোধন করিয়া একদিন বলিয়াছিলেন "এতদিন পরে আপনার একজন উপযুক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন।" সুব্রহ্মণ্য আয়ার হাইকোর্টের বিচারকের পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া যেমন তেমন ভাবে দৈনিক কার্য্য সম্পন্ন করিয়া যাইব এরূপভাবে কাজ করিতেন না। তিনি বিচারাদালত প্রাচীন হিন্দু-আদর্শে ধর্ম্মাধিকরণে পরিণত করিতে প্রয়াসী ছিলেন এবং সেই প্রাচীন আদর্শ নয়নপথে জাজ্বল্যমান রাখিয়া বিচারকার্য্য সম্পন্ন করিতেন। উভয়পক্ষের বাদানুবাদ শান্ত ও ধীরভাবে শুনিতেন। অন্যায় তর্ক উপস্থিত হইলে সুযুক্তি দ্বারা তাহার খণ্ডন করিয়া তর্ককারীকে নিরস্ত করিতেন; কাহারও মুখাপেক্ষা করিয়া কখন বিচারকার্য্য সম্পন্ন করিতেন না। বিচারকের আদর্শ সম্বন্ধে প্রাচীন ভারতে এবং আধুনিক ইউরোপীয় দেশসমূহে অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য আছে। উভয় আদর্শই নিরপেক্ষতার দিকে দৃষ্টি রাখে। কিন্তু ভারতের আদর্শ আর একটু বিস্তারিত ছিল; ব্যক্তিগত চরিত্রের প্রতি ইউরোপীয় আদর্শের তত লক্ষ্য নাই। একজন গৃহে বসিয়া চরিত্রগত কোন দুষ্কর্ম্ম করিলেও ইউরোপীয় আদর্শানুসারে তাহাকে বিচারকার্য্যে নিযুক্ত করিবার কোন বাধা নাই; কারণ উহা ব্যক্তিগত চরিত্র এবং সাধারণের কার্য্যের উপযোগিতার মধ্যে সম্বন্ধ রাখিতে চাহে না। কিন্তু ভারতবর্ষে ধার্ম্মিক ব্যক্তি ব্যতীত কেহ বিচারপদে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিতেন না। মদ্যপান, পরদারাভিমর্ষণ, প্রভৃতি দোষে দুষ্ট ব্যক্তিরা কখনও বিচারকের পদে নিযুক্ত হইতেন না। সদ্বংশজাত, ধার্ম্মিক, পণ্ডিত ব্যক্তিরাই ধর্ম্মাধিকরণে স্থান পাইতেন। সুব্রহ্মণ্য প্রাচীন ও আধুনিক—এতদুভয় আদর্শানুসারেই উপযুক্ত বিচারক ছিলেন। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, ব্রাহ্মণ, শূদ্র সকলের বিচারেই তিনি সমদর্শী ছিলেন। তিনি আইনের শব্দের উপর তত জোর দিতেন না, যত তার নিগূঢ় অর্থ—উদ্দেশ্যের প্রতি দিতেন। হিন্দুমহিলাদিগের দায়াধিকার এবং অন্যবিধ অধিকার সম্বন্ধে তাঁহার মত উদার ছিল, তিনি ধর্ম্মশাস্ত্রের যথার্থ মর্ম্ম অনুসারে স্ত্রী অধিকারের বিচার করিতেন। ওকালতি কার্য্যে অর্থার্জ্জন করিয়া

আত্মসুখসাধনই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল না, দীন দুঃখী দরিদ্রেরাও তাঁহার ধনের অংশী ছিল। তিনি যেখানেই গুণ দেখিতে পাইতেন তৎক্ষণাৎ তাহা গ্রহণ করিয়া গুণীর উপযুক্ত সম্বর্দ্ধনা করিতেন। অজ্ঞাতনামা যুবক সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের মধ্যে যে তেজঃপুঞ্জ লুক্কায়িতভাবে ছিল, তাহা তিনিই প্রথমে জ্ঞানচক্ষুর দ্বারা অবলোকন করিতে সমর্থ হয়েন, এবং তাঁহারই যত্ন ও চেষ্টায় বিবেকানন্দ সুদূর আমেরিকা প্রদেশে সমস্ত ধর্ম্মসম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদিগের সম্মুখে—"সিকাগো ধর্ম্ম-সংসদে"—সার্ব্বজনিক হিন্দুধর্ম্মের বিজয়ভেরী ঘোষণা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। নিষ্ঠাবান্ ও সদাচারসম্পন্ন হইলেও বর্ত্তমান প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মের সঙ্কীর্ণতা সুব্রহ্মণ্যের বিবেককে কলঙ্কিত করিতে পারে নাই। বহুকালের অজ্ঞান বিজৃম্ভিত কলঙ্ক দূরীভূত করিয়া হিন্দুধর্ম্মের উজ্জ্বল ভাতি দ্বারা জগৎকে প্রতিভাত করা সুব্রহ্মণ্যের জীবনের এক মহৎ উদ্দেশ্য ছিল, এবং এই জন্যেই তিনি থিয়ছফিক্যাল সোসাইটী (Theosophical Society) তে যোগদান করিয়া শ্রীমতী আনি বেশান্তের দক্ষিণ হস্তস্বরূপ হইয়াছিলেন। আনি বেশান্তের রাজনৈতিক আন্দোলনহেতু গবর্ণমেণ্ট যখন তাঁহাকে স্বাধীনতা-বিচ্যুত করেন, তখন মার্কিণদেশের যুক্তরাজ্যের তৎকালীন প্রেসিডেণ্ট্ মিঃ উইলসনের নিকট ইংরাজশাসনে ভারতের অভাব অভিযোগ জ্ঞাপন করিয়া তিনি যে লিপি প্রেরণ করিয়াছিলেন তাহার তেজস্বিনী ভাষা পাঠ করিলেই সুব্রহ্মণ্যের অন্তর্নিহিত শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। মণ্টাগু সাহেবের তিরস্কারে তাঁহার "নাইট" উপাধি-পরিত্যাগ, তাঁহার স্বাধীন-চিত্ততার আর একটী প্রোজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। রাজনীতিক্ষেত্রেও তাঁহার কৃতিত্বের যথেষ্ট পরিচয় আছে—তিনি জাতীয়-মহাসভা-স্থাপনের একজন প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। যেবার স্বর্গীয় ভূপেন্দ্রনাথ বসু মান্দ্রাজ কংগ্রেসের সভাপতি হয়েন, সেবার সুব্রহ্মণ্য অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি ছিলেন। তিনি ভারতের রাজনৈতিক অভ্যুদয়কামী ছিলেন, কিন্তু উচ্ছৃঙ্খলতার পক্ষপাতী ছিলেন না, এবং তজ্জন্যই তিনি শ্রীমতী আনি বেশান্তের ন্যায় নূতন স্বরাজ্যদলের সহিত সংশ্লিষ্ট হয়েন নাই। কি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে, কি সামাজিক ক্ষেত্রে, তিনি চরমপন্থার পক্ষপাতী ছিলেন না; ক্রমবিকাশই তাঁহার লক্ষ্য ছিল——বিপ্লব নহে।

সাধারণের নেতাদিগের সহিত সুব্রহ্মণ্যের পার্থক্য এই ছিল যে সুব্রহ্মণ্য ভগবানে প্রাচীন ঋষিদিগের ন্যায় আস্থাবান্ ছিলেন। তাঁহার শেষ জীবনে তিনি বানপ্রস্থ ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া ব্রহ্ম-চিন্তায় নিমগ্ন থাকিতেন; এবং

তাঁহাকে দেখিলেই বোধ হইত যেন কোন প্রাচীন ঋষি পুনর্ব্বার ভারতবর্ষকে পবিত্র করিতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। "নাল্পে সুখমস্তি, যদ্ভূমা তৎসুখম্," এই সত্য উপলব্ধি করিয়া তিনি ব্রহ্মে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। "ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি।" ওঁ শান্তিঃ, ওঁ শান্তিঃ, ওঁ শান্তিঃ।

আত্ম-কথা।

(গান।)

লেখক—শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ বসু।

(মন!) তোরে কি বলিয়ে গালি দিব।
তোরে গালি দিব কি গুলি মারিব অথবা
জেলে পাঠাব ?
হৃদয়-মন্দিরে থাকি, দিতেছ আমায় ফাঁকি
(ওরে) আমি ভাবিয়া না পাই কিছু কেমনে তোরে বুঝাব!
খেতেছ সুমিষ্ট কত, খাজা গজা মনোমত
(আরও) দই সন্দেশ রসগোল্লা, আমি আর যোগাব কত ?
খেয়ে শুয়ে ঘুরে ঘুরে, নেচে কুন্দে বারেবারে
(ওরে) সাধ কি মেটেনা তোমার বল্‌তে চাওনা দুর্গাশিব ?
ভেবে শেষে বুঝে শেষে, কূল পাবি না অবশেষে
তুই নিজে মজ্‌বি আমায় মজাবি যখন রে পঞ্চত্ব পাব।
সংসারের কোলাহল, রোধে স্মৃতি অবিরল,
(ওরে) দিন গেল দীন-দয়াময়ী কেমনে আমি ভাবিব ?
সেরেছ আমার দফা, চুরি দোষে নাই রফা,
মন্‌রে চুরির দায়ে ধরা পড়লে উচিত মত সাজাই পাব।
(তাই) ছাড়রে বিষয়-বাসনা, হরিনাম জপ করনা,
ভবে আসা যাওয়া যে যন্ত্রণা কখন কি তাহা ভাব ?
হরিনাম সর্ব্বসার, ভাব তাঁরে অনিবার,
মন, তুই যদি কথা রাখিস্ তবে আর কারে ডরাব ?

দুই জনে মিলে মিশে, ভগবানে পাবার আশে
(ওরে) চিন্তা কল্লে চিন্তামণির অবশ্যই দেখা পাব।
ধর্ম্মাধর্ম্ম তত্ত্বকথা, মর্ম্ম তার জান্‌বে কি তা
(ওরে) ব্যথা জানায়ে ব্যথা দিব, তবে ত সুফল পাব।
দয়াময়ী দয়াময়, সকলেই বলে তাঁয়
তবে আমি কেন সে দয়ার সুভাগ না পাইব ?
আমার বদনে যদি, হরি বলি নিরবধি,
কাতর কিঙ্করে তবে কি ব'লে দিবেন জবাব ?
আমি যদি হরি বল্‌তে, কাতর হই সে নাম শুন্তে,
তবে হবে আমার যে বিবন্ধ তাহা আর কায় জানাব ?
বিশ্বময় সে আমার, বিশ্ব তিনি, বিশ্ব তাঁর,
তবে শ্রীকৃষ্ণের মনোবেদনা কেন বা আর না মিটাব !

নাম-রহস্য।

(১)

জল।

লেখক -- সম্পাদক।

বালকের ভাষা কতিপয় শব্দ লইয়া। জ্ঞানের বিকাশের সহিত তাহার শব্দ-সংখ্যার বৃদ্ধি হয়। বয়ঃপ্রাপ্ত অজ্ঞ ব্যক্তির ভাষা ঐরূপ কতিপয় শব্দ লইয়া ; জ্ঞানের বৃদ্ধির সহিত তাহার শব্দ-সংখ্যার বৃদ্ধি হয়। অনুন্নত জাতিসমূহের ভাষাও ঐরূপ কতিপয় শব্দ লইয়া। যে জাতি যত সভ্য, তাহার ভাষাও তদ্রূপ' বিস্তৃত। আধুনিক ইউরোপীয় সভ্য জাতিসমূহের ভাষা পর্য্যালোচনা করিলেই তাহাদের জ্ঞানের পরিধি যে কতদূর বিস্তৃতিলাভ করিয়াছে, তাহা সহজেই হৃদয়ঙ্গম করা যায়। জ্ঞানের বৃদ্ধির সহিত জ্ঞাত বিষয়ের সংখ্যার বৃদ্ধি হওয়াতে ভাষার পুষ্টি হয়, আমাদের মানসিক চিন্তাই ভাষার আকার ধারণ করে। যে বিষয়ে আমাদের চিন্তা নাই তৎসম্বন্ধে আমাদের কোন

ভাষাও নাই। পশ্বাদির চিন্তাশক্তি অতি পরিমিত; এই জন্যই তাহাদের ভাষাও অতি পরিমিত, এমন কি, নাই বলিলেও চলে। অন্তঃকরণে কোন ভাবের উদয় হইলে শব্দের দ্বারা তাহার বহির্ব্বিকাশ হয়। যেখানে চিন্তা নাই, যেখানে ভাব নাই, সেখানে বহির্ব্বিকাশও নাই, ভাষাও নাই, শব্দও নাই। যেখানে জ্ঞান নাই, সেখানে চিন্তা নাই; সুতরাং ভাষাই জ্ঞানের বহির্ব্বিকাশ। এই শব্দ ও ভাষা সম্বন্ধে আমাদের শাস্ত্রে সুগভীর চিন্তা দৃষ্ট হয়—শব্দই বেদ, শব্দই ব্রহ্ম, ইহাই শাস্ত্রের মর্ম্ম। বাইবেলেও ওয়ার্ড এবং গড্ (Word and God) এক। "In the beginning was the Word, and Word was with God, and Word was God". Saint John. আদিতে শব্দ ছিল, ঐ শব্দ ঈশ্বরে ছিল, শব্দই ঈশ্বর।

সুপ্রসিদ্ধ গ্রীক দার্শনিক প্লেটো ও তৎশিষ্যগণের মতেও শব্দই ব্রহ্ম। জ্ঞানই ব্রহ্ম, ঐ ব্রহ্মের বহির্ব্বিকাশই শব্দ এবং ঐ শব্দই জগতের স্রষ্টা। প্রজাপতি জগৎ সৃষ্টির ইচ্ছা করিয়া, জগতের উপাদানভূত পদার্থের সংজ্ঞাস্বরূপ স্মরণ করিয়াছিলেন। "স ভূমিরিতি ব্যাহরন্ স ভূমিমসৃজত" ভূমি-সৃষ্টি-বিষয় স্মরণ করিতেই সৃষ্টিকর্ত্তার হৃদয়ে "ভূ" শব্দের উদয় হইল। অমনি তিনি ভূমি সৃষ্টি করিলেন। প্রজাপতি 'ভূ' বলিয়া ভূ সৃষ্টি করিলেন। বাইবেলে ঐরূপ আছে—God Said "There be light" and there was light." ঈশ্বর বলিলেন—জ্যোতিঃ হউক, অমনি জ্যোতিঃ হইল। এস্থলে শব্দতত্ত্ব আমাদের আলোচনার বিষয় নহে। অদ্য আমরা একটীমাত্র শব্দ আলোচনা করিয়া দেখাইব যে ঋষিগণের চিন্তা কিরূপ বিস্তৃতিলাভ করিয়াছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে ভাষা কিরূপ বিস্তারলাভ করিয়াছিল। "জল" শব্দ এবং তাহার বিভিন্ন সংজ্ঞাই বর্ত্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়। সাধারণতঃ জলের এই কয়টী নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়—আপ্, বারি, বা, সলিল, কমল, জল, পয়ঃ, কিলাল, অমৃত, জীবন, ভুবন, বন, কবন্ধ, উদক, পাথ, পুষ্কর, সর্ব্বতোমুখ, অম্ভ, অর্ণ, তোয়, পানীয়, ক্ষীর, অম্বু, সম্বাদ; কিন্তু ঋগ্বেদসংহিতায় জলের ১০১টী নাম দৃষ্ট হয়। এই যে ১০১টী শব্দ হইল, ইহার প্রত্যেক শব্দই চিন্তাসম্ভূত, অর্থাৎ জল সম্বন্ধে চিন্তাতেই এই সমস্ত শব্দের উৎপত্তি হইয়াছিল। জলের পূর্ব্বোক্ত যে কয়টী নাম দেওয়া গেল, তাহাও ঐ ১০১টী নামের মধ্যে পাওয়া যায়। প্রত্যেক শব্দ আলোচনা করিলেই আমাদিগের পূর্ব্ব-পুরুষদিগের চিন্তাশক্তির প্রশংসা না করিয়া পারা যায় না। ইংরাজীতে জলকে ওয়াটার (Water) বলে; ঐ ভাষায়

জলের একমাত্র শব্দ। এই Water শব্দটি যে ঐ ১০১ নামের অন্তর্ভুক্ত তাহা যথাস্থানে দেখাইব। এক্ষণে জলের ১০১টী নামের আলোচনা করিব।

১। "অর্ণঃ"—শব্দ গত্যর্থক 'ঋ' ধাতু হইতে উৎপন্ন। ঋচ্ছতি নিম্ন-প্রদেশং গচ্ছতি অর্থাৎ যে নিম্নপ্রদেশে গমন করে সে অর্ণ।

২। ক্ষোদঃ ক্ষুদতে ক্ষোদঃ, উচ্চঃদেশ হইতে যে নিম্নপ্রদেশে পতিত হয় সে ক্ষোদ।

৩। ক্ষদ্মঃ - ক্ষদ স্থৈর্য্যে ; পিপাসার্ত্ত ব্যক্তি জল প্রাপ্ত হইলেই স্থির হয়, এই জন্যই জলের নাম হইল ক্ষদ্ম।

৪। নভঃ—নহ বন্ধনে ; যেখানে জল পায় মানুষ সেইখানেই বাঁধা পড়িয়া যায় অর্থাৎ জল এতই প্রয়োজনীয় যে জল ত্যাগ করিয়া কেহ দূরে যাইতে চাহে না। যত্রোদকং বিন্দতে তত্র প্রাণিনঃ স্থাতুম মনস্কুর্বিন্তে ; যেখানে জল থাকে প্রাণিগণ সেইখানেই থাকিবার জন্য সংকল্প করে।

৫। অম্ভঃ—অম্লি ব্যাপ্তৌ ; যে জিনিস সকল জিনিস ব্যাপিয়া আছে তাহাই অম্ভ।

৬। কবন্ধম্—কং সুখং বধ্নাতি স্নান পানাদিনা অর্থাৎ স্নান পান দ্বারা যে সুখ বর্দ্ধন করে, সেই কবন্ধম্।

৭। সলিলম্—সলতি গচ্ছতি নিম্নদেশং, যে নিম্নস্থানে গমন করে সে সলিল।

৮। বাঃ—বৃঞ্‌ বরণে, যাহাকে বরণ করা যায় সেই বা।

৯। বনম্—বন্যতে সেব্যতে অর্থাৎ যে সেবা করে সে বন।

১০। ঘৃতম্—ঘৃ সেচনে, যাহা দ্বারা ভূমি সেচন করা যায় সেই ঘৃত।

১১। মধু—মধুর ন্যায় জল স্বাদু, এইজন্য জলের এক নাম মধু। মধুবং স্বাদুত্বাৎ। এই হইল স্বামীর মত। মদ তৃপ্তৌ। লোকে যাহাকে অতিশয় তৃপ্তিকর মনে করে—এটি হচ্ছে ভট্ট ভাস্কর মিশ্রের মত। মননীয়ং মধু। মেঘের মধ্যে যে জল থাকে তাহাকেও মধু বলে। মধু শব্দ বহু ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইতে পারে। যথা, ধম্, মন্, মদ্। এস্থলে ব্যাকরণের কথা উঠান উদ্দেশ্য নহে। প্রবন্ধের উদ্দেশ্য আমাদের প্রাচীন ঋষিদিগের কিরূপ অসাধারণ শব্দ-চিন্তা ছিল তাহাই প্রদর্শন।

১২। পুরীষম্—পালন ও পূরণার্থে পৃ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। প্রলয়-কালে যাহা জগৎ পূর্ণ করে, নদী তড়াগাদি যাহা দ্বারা পূর্ণ হয়, এবং শস্যোৎপত্তি দ্বারা যাহা জগৎ পালন করে।

১৩। পিপ্পলম্ এই শব্দটিও পৃ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন এবং ইহার ধাত্বর্থ পুরীষের ন্যায়। পৃ ধাতু হইতে কল প্রত্যয় ক'রে, অনেক সূত্র দ্বারা পিপ্পল শব্দ নিষ্পন্ন করা হইয়াছে। ক্ষীর স্বামী এই শব্দ গত্যর্থক প্লুঙ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন করিয়াছেন। উহার অর্থ—যাহা প্লাবন করে।

১৪। ক্ষীর—যাহা খাওয়া যায় তাহাই ক্ষীর। অদন্ত তদিতি ক্ষীরম্। অদনার্থক ঘস্ ধাতু হইতে ইরণ প্রত্যয় করিয়া অনেক সূত্র দ্বারা শব্দ নিষ্পন্ন করা হইয়াছে। সঞ্চালনার্থক ক্ষর ধাতু হইতেও উহা নিষ্পন্ন হয়। মেঘাৎ ক্ষরতি। যাহা মেঘ হইতে ক্ষরিত হয়।

১৫। বিষম্—যাহা সকল স্থান ব্যাপিয়া থাকে—বেবেষ্টি ব্যাপ্নোতি সর্ব্বং বিষম্। যাহা দ্বারা বিশেষরূপে শৌচ কার্য্য সাধিত হয় সেও বিষ। যাহা স্নান পানাবগাহনাদি দ্বারা সেবা করে সেও বিষ।

১৬। রেতঃ—রীয়তে স্রবতি রেতঃ। বৃষ্টি দেবতাদিগের রেত। রেত শব্দের জলার্থ গ্রহণ না করিয়া সাধারণ প্রচলিত অর্থ লইয়া বেদের কোন স্থানের অর্থে বড়ই বিভ্রাট ঘটনা হইয়াছে, তাহা এস্থানে বলিব না।

১৭। কশঃ—যাহা নিম্নপ্রদেশে গমন করে; কিম্বা মেঘ হইতে পতিত হইয়া শব্দ করে তাহাই কশ। কশ গতৌ, কশ শব্দে।

১৮। জন্ম—জনী প্রাদুর্ভাবে। সৃষ্টিকালে যে স্বকারণ অগ্নি হইতে জন্মিয়াছে, কিম্বা যাহাতে মৎস্যাদি জন্মগ্রহণ করে সেই জন্ম।

১৯। বৃবূকম্ —ব্রবীতেঃ শব্দার্থাৎ। যে শব্দ করে।

২০। বুসম্—যাহা দ্বারা বিশেষরূপে স্নান করা যায়—(বি পূর্ব্বাৎ স্নাতেঃ।)

২১। তুগ্র্যা—তুগ্র শব্দে আদিত্য বুঝায়। তাহা হইতে যাহার জন্ম হয়। সূর্য্যের রশ্মি দ্বারা সমুদ্র হইতে বাষ্প উত্থিত হয়, ঐ বাষ্প বৃষ্টিতে পরিণত হয়।

২২। বুর্বরম্—পৃ পালন-পূরণয়োঃ। বপুষঃ শরীরস্য পূরকং পালকং বা বপুঃ পুরং সৎ। যাহা শরীরের পূরক ও পালক।

২৩। সুক্ষেম ও ক্ষেম—ক্ষি নিবাস-গত্যোঃ, ক্ষি ক্ষয়ে। ক্ষিয়ন্তি নিবসন্তি প্রাণিনঃ। গচ্ছন্তি অনেন পন্থানমিতি বা, উপরিভাগেন ক্ষীয়তে বা। যাহা দ্বারা জীবগণ বাস করে, গমন করে, এবং যাহার উপরিভাগ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।

(ক্রমশঃ)

ভক্তই সুখী।

(গৌড়ীয় হইতে উদ্ধৃত)

সৎ, চিৎ ও আনন্দবৃত্তিকে যিনি বিশেষরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাকে সচ্চিদানন্দবিগ্রহ কহে। একমাত্র শ্রীভগবানই ঐ সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ-শব্দ বাচ্য, অন্যে নহে।

২। বৃহৎ অগ্নিস্তূপ হইতে যেমন অণুপরিমিত স্ফুলিঙ্গসমূহ অংশরূপে নির্গত হয়, বৃহৎ বা পূর্ণতত্ত্ব ভগবান্ হইতে সেইরূপ পৃথক্ পৃথক্ সত্তাবান অনন্ত কোটী স্বতন্ত্র চিদণুতত্ত্ব জীব উৎপন্ন হইয়াছে। একটী কেশের অগ্রভাগকে সহস্র অংশে বিভক্ত করিলে প্রত্যেক অংশটী যেরূপ ধারণাতীত সূক্ষ্মাকারে পরিণত হয়, জীবের স্বরূপ তদ্বৎ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ও অপরিমেয়। ক্ষুদ্রত্ব বিধায় জীবের স্বরূপ যেমন সসীম মানববুদ্ধির দ্বারা পরিমেয় নহে, বৃহত্ত্বহেতু ভগবানের স্বরূপও তদ্বৎ সসীম বুদ্ধির দ্বারা গ্রহীতব্য নহে। যদিও সসীম-বুদ্ধির দ্বারা অণুতত্ত্ব জীব ও বৃহত্তত্ত্ব ভগবানের স্বরূপ নির্দ্ধারণ করা সম্ভবপর হয় না (অর্থাৎ উভয়েই অপরিমেয় ও জাতীয়ত্বে এক), তথাপি তাহাদিগের মধ্যে অণুত্ব ও বৃহত্ত্বরূপ ভেদ বর্ত্তমান আছে। যাঁহারা ভগবৎকৃপায় দিব্য-জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা এই জীবেশ্বরগত ভেদদর্শনে সমর্থ। ভগবৎকৃপা-বঞ্চিত সসীম-বুদ্ধিবিশিষ্ট অজ্ঞ-মায়াবাদিগণ জীবেশ্বরগত ভেদ উপলব্ধি করিতে অসমর্থ ও ভ্রান্তিবশতঃ "আমি ব্রহ্ম" ইত্যাকার অপরাধ-জনক সিদ্ধান্তস্থাপনে প্রয়াসী।

৩। অগ্নিস্তূপে সংলগ্ন অংশে সমগ্র অগ্নির প্রভাব বর্ত্তমান; কিন্তু অগ্নিস্তূপ হইতে বিচ্ছিন্ন স্ফুলিঙ্গরূপ অংশে অগ্নির গুণ আংশিকরূপে অবস্থিত অর্থাৎ তাহা বৃহৎ অগ্নিস্তূপ-গত সমগ্র প্রকাশ ও দাহকধর্ম্মযুক্ত নহে। জাতীয়ত্বে এক হইলেও ভেদ-প্রদর্শনের জন্য যে নিয়মে বৃহৎ অগ্নিস্তূপে অভিন্নভাবে অবস্থিত অংশকে স্বাংশ ও সেই অগ্নিস্তূপ হইতে বিচ্ছিন্নভাবে স্থিত অংশকে বিভিন্নাংশ কহে, ঠিক সেই নিয়মে ভগবানের সহ অভিন্ন তদীয় অবতারাদিরূপ প্রকাশকে স্বাংশ ও তাঁহা হইতে বিচ্ছিন্নবৎ অবস্থিত অণুচিৎ জীবকে বিভিন্নাংশ বলা হয়। সুতরাং স্পষ্টীকৃত হইতেছে যে, স্বয়ং ভগবানে কিম্বা তাঁহার স্বাংশ বিভূতিতে সৎ, চিৎ ও আনন্দ গুণ যেরূপ পূর্ণমাত্রায় বর্ত্তমান থাকে বিভিন্নাংশগত জীবে তাঁহার গুণ সেই মাত্রায় অবস্থান করিতে পারে না অর্থাৎ, তাহারা অণুপরিমাণে অবস্থান করে।

৪। সৎ,* চিৎ ও আনন্দবৃত্তিকে কেহ জ্ঞান, বল ও ইচ্ছাশক্তিও কহেন। ইংরেজি ভাষায় এই শক্তিত্রয়কে Willing, Knowing ও Feeling faculty বলা হয়। যখন প্রত্যেক ব্যক্তিকে কোন না কোন বিষয় জ্ঞাত হইতে, কোন না কোন বিষয় প্রাপ্ত হইবার জন্য ইচ্ছা করিতে ও কোন না কোন লব্ধ বিষয়োৎপন্ন সুখ বা দুঃখকে উপভোগ করিতে দেখা যায়, তখন মানবগণে যে জানিবার ইচ্ছা ও উপভোগ করিবার শক্তি বর্ত্তমান আছে, ইহা কে না স্বীকার করিবে? জানিবার এবং ইচ্ছা ও অনুভব করিবার শক্তি সত্ত্বেও দেখা যায় যে, অনেক সময় মানবগণ যাহা যাহা জানিবার ও উপভোগ করিবার ইচ্ছা করেন, তাহা জানিতে বা উপভোগ করিতে পারেন না। জানিতে বা উপভোগ করিতে পারিলেও নিত্যকাল সেই সেই বৃত্তিকে পোষণ করিতে সমর্থ হন না এবং অনেক সময় জ্ঞাত বা লব্ধ বিষয়কে পূর্ণমাত্রায় জানিতে বা উপভোগ করিতে সমর্থ হন না। অপারক হইবার তথ্য অনুসন্ধান করিলে জানা যায় যে, জীবতত্ত্বগত শক্তির অণুত্বই তাহার মূলীভূত নিদান।

৫। মৃন্ময় ঘটকে যেমন মৃত্তিকার পরিণাম কহে, তদ্বৎ ভগবানের ইচ্ছাক্রমে তদীয় শক্তিপ্রভাবজাত জীবসমূহকেও শক্তির পরিণতি বলিয়া বুঝিতে হইবে। জলের ভিতর চন্দ্রের যে প্রতিবিম্ব দৃষ্ট হয়, সেই জলান্তর্গত চন্দ্রের সত্তায় যেমন জলাতিরিক্ত কোন পদার্থের সদ্ভাব নাই এবং মনঃকল্পিত বস্তু যেমন মনোময় ধাতু ব্যতীত পদার্থান্তরের দ্বারা গঠিত হয় না, তদ্রূপ ভগবচ্ছক্তিজাত জীব-নামক তত্ত্বের সত্তায় শক্তি ব্যতীত অন্য পদার্থের সদ্ভাব অসম্ভব। সুতরাং জীব-তত্ত্বকে শক্তিজাতীয় পদার্থ ভিন্ন শক্তিমৎ তত্ত্ব বা তজ্জাতীয় অন্য কোন পদার্থ মনে করা অনুচিত।

৬। সূর্য্যকে প্রকাশ করা যেমন কিরণসমূহের মুখ্য উদ্দেশ্য এবং সূর্য্যাতীত পদার্থনিচয়কে ব্যক্ত করা যেমন উহাদিগের অবান্তর বা গৌণ উদ্দেশ্য মধ্যে গণ্য, তদ্রূপ শক্তি-জাতীয় জীবসমূহ কর্ত্তৃক শক্তিমান ভগবত্তত্ত্বের উপলব্ধি ও তাঁহার সেবারূপ কার্য্যই তাহাদিগের মুখ্য কৃত্য এবং ভগবদিতর পদার্থের অনুভূতি ও সেই সমুদয় বস্তু দ্বারা নিজ তৃপ্তিসাধনাত্মক ক্রিয়াকে তাহাদিগের গৌণ বা অবান্তর উদ্দেশ্য বলিয়া বিবেচিত হয়। ভগবদনুভূতিমূলক সেবাকার্য্য যে কালে সাধিত হয়, সেই সময় জীবগণ আপনাদিগকে শক্তিজাতীয় সেবক অভিমান করেন ও শ্রীভগবানকে আপনাদিগের একমাত্র নিত্য প্রভু বা সেব্য তত্ত্ব বলিয়া অবগত হন অর্থাৎ সেব্য-সেবক বা আশ্রয়াশ্রিতভাব সম্পুটিত এক

অখণ্ড, দ্বিতীয়-সেব্য-বস্তু রহিত, অদ্বয়জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকেন। যেহেতু অদ্বয়জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হন, তন্নিমিত্ত তাহারা ভগবত্তত্ত্বগত পূর্ণ চিদ্‌বলে বলীয়ান্ ও অবাধে বিমল-সেবানন্দ-সুখ চিরকাল আস্বাদন করিতে সমর্থ হন।

৭। যে সময় জীবগণ আপনাদিগকে অখণ্ড অদ্বয়জ্ঞান হইতে বিচ্ছিন্নবৎ অনুভব করে সেইকালে তাহারা আপনাদিগকে ও অন্যান্য পদার্থসমূহকে পৃথক্ পৃথক্ খণ্ডাকারে অবস্থিত মনে করে ও শক্তিজাতীয় তত্ত্বের পরিবর্ত্তে আপনাদিগকে শক্তিমৎ তত্ত্ব বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকে। এই খণ্ডজ্ঞান হইতে দ্বৈতবুদ্ধি সংস্থাপিত হয়। দ্বৈতবুদ্ধি সংস্থাপিত অবস্থায় মানবগণ হেয় ও উপাদেয় ভাবকে লক্ষ্য করে, যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে,—

"দ্বৈতে ভদ্রাভদ্র জ্ঞান সব মনোধর্ম্ম।"
"এই ভাল এই মন্দ এই সব ভ্রম॥"

অখণ্ড ও অদ্বয়জ্ঞানে সমুদয় পদার্থে ভগবৎসেবোপকরণ-বুদ্ধি প্রস্ফুটিত থাকায় প্রত্যেক বস্তুই সদা পরমোপাদেয় ভাবকে আস্বাদন করাইয়া থাকে, অর্থাৎ কোন প্রকার হেয় ভাবকে প্রকাশ করে না। অতএব স্বীকৃত হইতেছে যে খণ্ড দর্শন হইতে হেয়ভাব আবির্ভূত হয় ও তাহার মূল চিদ্‌বলের সাহায্য ব্যতিরেকে জীব-তত্ত্বগত অনুশক্তির দ্বারা দূরীভূত হইবার নহে।

৮। জীবের স্বরূপে সুখাস্বাদনের যোগ্যতা আছে ও তদ্ধেতু জীবগণ সুখান্বেষী হয়। অজ্ঞতা-নিবন্ধন মূঢ় ব্যক্তিসকল জানিতে পারে না যে তাহাদিগের অনুসন্ধিৎসা-টী কোন্ জাতীয় সুখকে লক্ষ্য করিতেছে। সুখ দ্বিবিধ উপায়ে লভ্য, যথা বাহ্যবিষয়ের উপভোগমুখে ও ভগবৎসেবাভিমুখে। বাহ্যবিষয়োপভোগ হইতে নিজ তৃপ্তি সিদ্ধ হয় ও সেবামুখে ভগবানের প্রীতিই লক্ষ্যের অন্তর্গত। যাহারা সুশিক্ষার অভাবে আত্মপ্রীতি সাধনোদ্দেশে বাহ্যবিষয় সংগ্রহে তৎপর,—তাহারা অনেক সময় অণুশক্তিমত্তাহেতু, বিফলমনোরথ হয় ও সুখের পরিবর্ত্তে দুঃখকে আবাহন করিয়া থাকে। সুকৃতিবলে যে সমুদয় ব্যক্তি তত্ত্বজ্ঞানলাভ করিতে সমর্থ হয়, কেবল সেই সমুদয় ভাগ্যবান জীব ভগবৎকৃপায় অর্থাৎ পূর্ণচিদ্‌বলের সাহায্যে ভগবৎসেবা-নিষ্ঠ হন ও পরমাদ্ভুত বিমলানন্দপ্রদ সেবামাধুরী নিত্যকাল সম্ভোগ করিয়া থাকেন।

৯। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, একমাত্র ভগবত্তত্ত্বেই সৎ, চিৎ, ও আনন্দবৃত্তি পূর্ণমাত্রায় গৃহীত হইয়াছে। যেহেতু শ্রীভগবানে উক্ত বৃত্তিত্রয় পূর্ণমাত্রায় ক্রিয়াশীল থাকে, তন্নিমিত্ত নিত্য—তিনি সদা পূর্ণানন্দে মগ্ন থাকেন। জ্ঞান-শক্তির

উৎকর্ষহেতু অজ্ঞানজ দুঃখপ্রদ কার্য্যে তাঁহাকে নিযুক্ত হইতে হয় না। তাঁহার ইচ্ছাশক্তি পূর্ণমাত্রায় ক্রিয়া করিতে সমর্থ ও তন্নিমিত্ত তিনি যাহা সঙ্কল্প করেন তৎক্ষণাৎ তাহা পরিতৃপ্ত হয়। তাঁহাতে সঞ্চারিণী বা সত্তাবিস্তারিণী শক্তির প্রাচুর্য্যহেতু চরাচর যাবতীয় পদার্থ তাঁহা হইতে সৃষ্ট হইয়াছে। অন্যান্য পদার্থসমূহ তাঁহা হইতে সত্তা বা অস্তিত্বলাভ করায়, তাহাদিগের দ্বারা তাঁহার সত্তার অনস্তিত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না। যেহেতু তিনি সর্ব্বকারণের কারণ, তন্নিমিত্ত তিনি ইচ্ছা করিলেই অন্যান্য পদার্থের সত্তাকে অনস্তিত্বে পরিণত করিতে পারেন। সুতরাং যাহারা তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে উদ্যত, তাঁহারা অজ্ঞাতসারে নিজ নিজ অস্তিত্ব-ধ্বংস করিবার প্রয়াসী। সেবার দ্বারা তাঁহার প্রীতি উৎপাদন করিতে যাহারা উৎসুক, কেবলমাত্র সেই সেবকবৃন্দই নিত্যকাল নিজ সত্তাকে অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ।

১০। যাহারা পরতত্ত্বের আলোচনাহীন, তাহারা সংসারে বারংবার যাতায়াত করিতে করিতে কোনও কালে ভগবৎকৃপায় সাধুসঙ্গলাভ করিতে ও সেই সঙ্গ-প্রভাবে সেবা-বুদ্ধিসম্পন্ন হইতে পারেন; কিন্তু যাহারা "আমি ব্রহ্ম" ইত্যাকার অসৎসিদ্ধান্তে আস্থাবান্, তাহারা দিবালোকে খদ্যোতের ন্যায়, প্রভাহীন হইয়া যান ও নিজ সত্তা অনুভব করিতে সমর্থ হন না। শত্রুভাববশতঃ দেহান্তে যেমন কংসাদির সত্তা ভগবজ্জ্যোতিতে বিলীন হওয়ার কথা পুরাণাদি শাস্ত্রে বর্ণিত আছে, বহু কঠোর সাধনাদির সাহায্যে "আমি ব্রহ্ম" ইত্যাকার সিদ্ধান্তশীল মানবগণ সেইরূপ গতি লাভ করেন।

১১। নিজ কল্যাণ ও যথার্থ সুখলাভেচ্ছুগণের উচিত পরকল্যাণের আকর ও নিত্যানন্দময় শ্রীভগবানের সেবাবুদ্ধি লাভ করা। শুদ্ধভক্তের চরণাশ্রয় ব্যতীত সেবাবুদ্ধি লাভ করিবার গত্যন্তর নাই। জগতে অনেক প্রকার কপট ভক্ত বিচরণ করেন। কলির চর জ্ঞানে তাহাদিগের সঙ্গ পরিত্যাগ করা বিধেয়। নরদেহ ক্ষণভঙ্গুর। সুতরাং দেহের পতন হইতে না হইতেই সদ্গুরুর চরণে বিক্রীত হওয়া প্রয়োজন। বৃথা কালহরণ করিলে দেহান্তে ভীষণ নরক-যন্ত্রণা অনিবার্য্যরূপে ভোগ করিতে হইবে। অতএব হে নশ্বর-সুখান্বেষী ভ্রাতৃবৃন্দ! আপনারা অজ্ঞানান্ধকার পরিহারের জন্য উদ্‌গ্রীব হউন। দুঃখের বীজরূপ—ভোগসুখের আশাকে বিসর্জ্জন দিয়া বিমল কৃষ্ণসেবানন্দ সুখের জন্য লালায়িত হউন। তাহা হইলে ত্রিতাপ জ্বালা আর আপনাদিগকে ভ্রূকুটী প্রদর্শন করিতে সমর্থ হইবে না। ইহাই মানব-জীবনের চরম লক্ষ্য ও প্রাপ্য বিষয়।

গীতা-নাটক।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

অর্জ্জুন। কৃষ্ণ! কি অদ্ভুত ভাব মনে হতেছে উদয়
বুঝিতে না পারি ; সখে, হতেছি বিস্ময়।
যুদ্ধেচ্ছু স্বজনগণে করি নিরীক্ষণ,
অবসন্ন দেহ মম হতেছে স্পন্দন।
রোমাঞ্চিত কলেবর, বিশুষ্ক বদন।
দহিছে শরীর মম সম হুতাশন।
বাক্য নাহি সরে মুখে করি কি এখন,—
হস্ত হ'তে হইতেছে গাণ্ডীব-পতন!
কেশব! বসিতে রথের 'পর অক্ষম এখন।
বিঘূর্ণিত চতুর্দ্দিক হেরি কুলক্ষণ॥
কৃষ্ণ! নহে কিছু শ্রেয়ঃ ; হায় বধিতে স্বজন,
রাজ্যসুখ বিজয়েতে নাহি আর মন।
কি হবে রাজ্যে গোবিন্দ! বৃথা এ জীবন
যার তরে রণ, তারা হইবে নিধন!
আচার্য্য, আত্মীয়, মিত্র, পুত্র, পৌত্রগণ,
পিতামহ পিতৃব্য শ্বশুর শ্যালাগণ—
মাতুলাদি সমাগত প্রাণ-বিসর্জ্জনে।
হেন যুদ্ধে সমুৎসাহ নাহি মোর মনে।
যদিও ইহারা করে আমার নিধন,
আমি না বধিব তবু, হে মধুসূদন!
ত্রৈলোক্য-রাজ্যেতে ধিক্, ধিক্ মহীতলে,
কি সুখ হইবে নাশি, আত্মীয় স্ববলে ;
আততায়ী বধ সত্য শাস্ত্রের বিধান,
হবে পাপ কিন্তু বধি স্বজনের প্রাণ।
স্বজন বধিয়ে, বৃথা লয়ে পাপ-ভার
ফলে কি সুখ মাধব! হইবে আমার?

ঘরে সব কুলবধূ কি ভাবিছে তারা ?
কি বলিবে প্রতিবেশী জ্ঞানহারা মোরা !
বৃদ্ধ জ্যেষ্ঠতাত একে চক্ষুরত্ন-হীন
কি দুঃখে কাটেন কাল, ভাবি অনুদিন।
বৃদ্ধা রাণী মা গান্ধারী সতী-শিরোমণি,
আমার অকার্য্যে ক্লেশ পাইবেন তিনি।
রাজ্যলোভে দুর্য্যোধন বধিবে স্বজন
পাপ স্পর্শে তাহে নাহি করে নিরীক্ষণ !
স্বজন-বিনাশে পাপ হইবে নিশ্চয়।
অতএব যুঝিবারে মন নাহি লয়।
বহু নর হয় নষ্ট যুদ্ধে, জনার্দ্দন !
বিধবা রমণী লবে কাহার শরণ ?
নর-ক্ষয়ে তাই হয় কুলধর্ম্ম-নাশ
তাই ধরাতলে হয় অধর্ম্ম-প্রকাশ।
অধর্ম্মে হইবে কৃষ্ণ ! ভ্রষ্টা নারীগণ—
দুষ্টা নারী হ'লে বর্ণ-সঙ্কর-সৃজন।
কুলঘ্ন বর্ণসঙ্কর, নরক-কারণ,
জলপিণ্ডলোপে পিতা অধোগতি হন।
সঙ্কর বিবর্ণ দোষে কুলধর্ম্ম নাশে—
চিরন্তন জাতিকুল ধর্ম্ম নাশে শেষে ;
কুলধর্ম্ম-ক্ষয়ে কষ্ট পায় নরগণ—
শাস্ত্রে শুনি নরকে নিবসে অনুক্ষণ।
হায় ! একি মহাপাপ করেছি মনন
তুচ্ছরাজ্য লোভে করি স্বজন-হনন !
লোভী শস্ত্রী দুর্য্যোধন মোহিত অজ্ঞানে
অস্ত্রহীন মোরে বধে ; বধুক না কেনে ?

(শরাসন ফেলিয়া রথের উপর উপবেশন)

গীত।

গুরুজ্ঞাতি-বধে ওহে জনার্দ্দন ! পাপ-তাপ-শোকে ব্যাকুল জীবন,
দৈন্য দশা হবে এ সব ভুবন, জাতি-কুল-মান হারাবে স্বগণ।
কর্ম্মাকর্ম্ম সব বুঝিতে না পারি, সংবুদ্ধি দেও অনুষ্ঠান করি,
শুন বংশীধারি প্রাণের শ্রীহরি, যুদ্ধ ভিক্ষা মধ্যে প্রশস্ত বা কোন্।
ব্যথিত অন্তর হয়েছে আমার, ভয়ে ভ্রম-বুদ্ধি মৃত্যু শ্রেয়স্কর,
রাজ্যধনৈশ্বর্য্যে নাহি লিপ্সা আর, ভুলিব না কৃষ্ণ পরে আজীবন।
তবু যদি বল করিতে হে রণ, বুঝিনু উদয় ধ্বংসেরি কারণ,
শিষ্য হ'য়ে আজ চরণ-শরণ, পাপী হই বধি আত্মীয়-স্বজন।
শোকাকুল আমি হয়েছি এখনে, লুপ্ত-পিণ্ড হবে পিতৃকুলগণে,
ভাবিতেছি আমি তাই মনে মনে, অহিংসা পরমধর্ম্ম "শাস্ত্রের প্রমাণ ॥"

হে অসুর-দমন ! তুচ্ছ পৃথিবীর আধিপত্য ত দূরের কথা ; স্বর্গ-মর্ত্ত্য-পাতালের এককালীন অধিকার নিমিত্তও এই পরমাত্মীয় ব্যক্তিগণকে আমি কিছুতেই বিনাশ কর্ত্তে ইচ্ছা করিনে। অতএব বান্ধব ধার্ত্তরাষ্ট্রগণকে বধ করিয়া কি আনন্দ হইবে ? সুহৃদ ধার্ত্তরাষ্ট্রগণকে বধ কো'রে আমরা কি সুখী হব ? জনার্দ্দন ! যদিও রাজ্যলালসায় হতবুদ্ধি হ'য়ে দুর্য্যোধনাদি কুলক্ষয় ও পরমাত্মীয়-বধ-নিমিত্ত মহাপাপ ও সাধারণের ধ্বংস দেখ্‌তে পার্চ্ছে না, কিন্তু আমরা কুলক্ষয়-জনিত মহাপাপ স্বরূপতঃ উপলব্ধি ক'রেও কি জন্যে আমাদের এ মহাপাপ হ'তে বিরত হবার সুবুদ্ধি যোগাচ্ছে না ? হায় ! কি কষ্ট ! কৃষ্ণ ! সম্পত্তি, ধন, ঐশ্বর্য্য মানবের সাধ্য, কিন্তু জীবনদান ত মানুষের সাধ্য নহে ; তবে কেন এ মহাপাপে লিপ্ত হ'তে প্রয়াসী হচ্ছি ? তুমি যুদ্ধস্থলে আমার সারথি হয়েছ বটে, সে তোমার মহত্ব। এখন আমার মনোরথের সারথি হ'য়ে আমার প্রাণ-রথ চালনা কোরে আমাকে এ ভীষণ সমর-রূপ মরুপ্রান্তর হ'তে পার কর।

পটক্ষেপণ।

চতুর্থ দৃশ্য।

কৌরব-ব্যূহ—দুর্য্যোধন ও দ্রোণাদির সমাবেশ।

দূতের প্রবেশ।

দুর্য্যোধন। ঐ যে দূত প্রত্যাগমন কোরেছে! কি হে দূত! সংবাদ কি? পাণ্ডবেরা ত সুসজ্জিত হ'য়েছেন? রাজা যুধিষ্ঠির কি ভাবে অবস্থান কর্চ্ছেন; ভীমার্জ্জুনই বা কি কর্চ্ছেন? বল, বল, শীঘ্র বল। আমি তোমার বিলম্ব দেখে নানারূপ চিন্তা কচ্ছিলেম। এখন তুমি সমস্ত ব'লে আমার চিন্তার লাঘব করবে কি বৃদ্ধি করবে আমি এই চিন্তাতেই আকুল হচ্ছি।

দূত। (স্বগত) প্রকৃত অবস্থা ও ব্যাপার যা দেখে এলাম তা মহারাজকে সহজে বলা হবে না। দেখা যাক্ ভয়টা কতদূর গড়িয়েছে। (প্রকাশ্যে) মহারাজ! যেতে আস্‌তে বহু বিলম্ব হয়েছে বটে; তা কি করি, রণক্ষেত্রে চতুর্দ্দিকে যেরূপ ভিড় তা সেরে গতায়াত করা বড়ই দুষ্কর। আমি এ হেন মহারাজার দূত হ'য়ে আজ যেরূপ লাঞ্ছনা পেয়েছি তা বল্‌বার নয়। কোন প্রকারে প্রাণটা ল'য়ে ফিরে এসেছি।

দুর্য্যোধন। কিহে দূত! কি বল্‌ছ! কি জন্যে তোমার এত লাঞ্ছনা ভোগ কর্ত্তে হ'লো? সে যা হোক! তুমি অবিলম্বে পাণ্ডব-ব্যূহের অবস্থা যা দেখে এসেছ তাই বর্ণন কর! আমার হৃদয় স্পন্দিত হচ্ছে।

দূত। মহারাজ! লাঞ্ছনা যে কিসে হ'লো তা কি আপ্‌নি বুঝ্‌তে পার্চ্ছেন না! মহারাজ! পাণ্ডবব্যূহ মধ্যে মহাধনুর্দ্ধারী ও সুবিদিত যোদ্ধা ভীমার্জ্জুনসদৃশ বহুতর শূরবীর বিদ্যমান রহিয়াছেন। মহারথ সাত্যকি, বিরাট, দ্রুপদরাজ, মহাপরাক্রমশালী ধৃষ্টকেতু, চেকিতান ও কাশীরাজ, নরশ্রেষ্ঠ পুরুজিৎ, কুন্তিভোজ ও শৈব্য, বিক্রমশালী যুধামন্যু, মহাবল রাজা উত্তমৌজা, সুভদ্রাপুত্র অভিমন্যু ও দ্রৌপদীর পঞ্চতনয় ইঁহারা প্রত্যেকেই রণবেশে সমুপস্থিত। হয়, হস্তী, উষ্ট্র, গাভী, বলদ ইত্যাদি নানাবিধ পশু হইতে এবং শঙ্খ, ভেরী, পণব, আনক ও গোমুখ প্রভৃতি আহত বাদ্যযন্ত্র হইতে তুমুল শব্দ উত্থিত ও প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। অপরদিকে শ্বেতাশ্বযুক্ত রথে সমাসীন শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুন দিব্যশঙ্খ বাজাইতেছেন! স্বয়ং হৃষীকেশ পাঞ্চজন্য শঙ্খ, অর্জ্জুন দেবদত্ত শঙ্খ, ভীমসেন পৌণ্ড্রনামে মহাশঙ্খ, কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠির অনন্তবিজয় শঙ্খ, নকুল,

সুঘোষ ও সহদেব মণিপুষ্পক নামক শঙ্খধ্বনি কর্চ্ছেন। অন্যান্য বীরগণ, রাজা দ্রুপদ, দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র, মহাযোদ্ধা অভিমন্যু ইঁহারা সকলেই পৃথক্ পৃথক্ নানারূপ শঙ্খ বাজাচ্ছেন। এবম্বিধ তুমুলশব্দ ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডলাদি প্রতিধ্বনিত কোরে সৈন্যগণকে মহা উৎসাহিত করছে। কি আর বল্‌ব মহারাজ ;—

দুর্য্যোধন। দূত! আমি ত তোমাকে সে সংবাদ জান্‌তে পাঠাইনি! আমি তোমার কাছে ঐ সব শুন্‌তে চাচ্ছি না। তুমি আমার প্রশ্নের উত্তর শীঘ্র দাও।

দূত। মহারাজ! যদি অনুমতি করেন, তবে পার্থরথে উপবিষ্ট সারথির রূপ বর্ণনা করে, অন্যান্য বিষয় পশ্চাৎ নিবেদন করি। আমি একবার সেই সারথির রূপটা বর্ণনা করে নেই।

গীত।

আশ্চর্য্য সে বিশ্বরূপ হেরেছি রাজন্,
হেরিতে যাহারে সদা বাঞ্ছে দেবগণ।
শ্রেষ্ঠ ভক্ত বলি পার্থ হেরে ভাগ্যবান,
দান-তপ-যজ্ঞে যারে না পায় সন্ধান।
সারথি সেজেছেন হরি অর্জ্জুনের রথে,
অপরূপ হেরিলাম না পারি ভুলিতে।
একনিষ্ঠা ভক্তি যার সতত তাঁহায়,
আত্মার স্বরূপ হেরি, মুক্তিপদ পায়।

শ্যামরূপ কি সুন্দর, প্রাণ-মন-মোহকর,
পীতবাস রসিকবর হাস বিকাশ চন্দ্রাননে।
সুন্দর শিখি-পাখা, ঈষৎ বামেতে বাঁকা,
সুন্দর তিলক আঁকা বিশাল ললাট-স্থানে।
অধরে মোহন বাঁশী, ক্ষরিছে সুধা রাশি রাশি
দাসে যেন বৈকুণ্ঠবাসী সুশীতল ঐ চরণে॥

দুর্য্যোধন। কিহে দূত! তোমার আজ এ ভাব ঘটেছে কেন? দূতের কর্ত্তব্য কর। তিলার্দ্ধ বিলম্ব না কোরে, আর বাগাড়ম্বর না ক'রে, যথাযথ সংবাদ বল।

(ক্রমশঃ)

ভক্তি-কথা।

লেখক—শ্রীআদ্যনাথ কাব্যতীর্থ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

সাঙ্কেত্যং পরিহাস্যং বা স্তোভং হেলনমেব বা
বৈকুণ্ঠনাম-গ্রহণম্ অশেষাঘহরং বিদুঃ। ভাঃ ৬।২।১০

পুত্রাদির সঙ্কেতেই হউক, পরিহাসেই হউক, গীতালাপ-পূরণার্থেই হউক, অবজ্ঞাক্রমেই হউক, ভগবানের নাম যে কোনরূপে উচ্চারণ করিলেই তাহাতে অশেষ পাপের ক্ষয় হয়। ইহা নামের অর্থবাদ নহে, সত্য কথা। এই জন্য ভক্ত-রসনা কখনও নাম গ্রহণে বিরত হয় না। অতএব একমাত্র হরিনামই সর্ব্ব-মঙ্গল-কারণ, ইহাই নিশ্চিত। আমরা পাপক্ষয়ার্থে প্রায়শ্চিত্ত করি, কিন্তু দেখা যায় প্রায়শ্চিত্তান্তে পুনরায় পাপে প্রবৃত্তি হইতেছে। সুতরাং বুঝা যায় যে, প্রায়শ্চিত্ত-বলে ব্যবহার্য্যতা দোষ নষ্ট হয়, কিন্তু পাপ-বীজ নষ্ট হয় না। ভ্রষ্ট বীজের কখনও অঙ্কুরোৎপত্তি হয় না, সুপথ্য-ভোজীর ব্যাধি হয় না, কারণ গেলে আর কার্য্য হয় না, ইহা স্বতঃসিদ্ধ। তবে, পাপ-বীজনাশের উপায়? জ্ঞান। জ্ঞানাগ্নি সর্ব্বকর্ম্ম ভস্ম করিয়া ফেলে। ইহা ভিন্ন অন্য প্রায়শ্চিত্তও আছে,—ভগবানে ঐকান্তিকী ভক্তি।

কেচিৎ কেবলয়া ভক্ত্যা বাসুদেব-পরায়ণাঃ।
অঘং ধুন্বন্তি কাৎস্ন্যেন নীহারমিব ভাস্করঃ। ভাঃ ৬।১।১৩

সূর্য্য উদিত হইলে যেমন সমুদয় নীহারজাল বিনষ্ট হয়, সেইরূপ ভগবানে ঐকান্তিকী ভক্তি প্রযুক্ত হইলে সমুদয় পাপরাশি বিনষ্ট হয়।

ন তথা হ্যঘবান্ রাজন্! পূয়েত তপ-আদিভিঃ।
যথা কৃষ্ণার্পিতপ্রাণস্তৎপুরুষ-নিষেবয়া। ভাঃ ৬।১।১৪

যে শ্রীকৃষ্ণে প্রাণ সমর্পণ করিয়াছে, সে ভগবদ্ভক্ত জনগণের সেবায় যেরূপ পাপ হইতে পবিত্র হয়, তপস্যা, জ্ঞান প্রভৃতি দ্বারা সেরূপ পবিত্র হইতে পারে না। অতএব ইহলোকে ভক্তিমার্গই সমীচীন পথ এবং পরম মঙ্গলদায়ক। এই পথে কোনও বিঘ্নাদির সম্ভাবনা নাই; সুশীল, সজ্জন, সাধুগণ সতত এই পথে বিচরণ করেন। সহায়তার অভাব-নিবন্ধন জ্ঞানমার্গের ন্যায় এই পথে কোনও ভয় নাই। কর্ম্মমার্গে সংসারী লোকের ভয় আছে, এ পথে

সে ভয় নাই। নদী সকল যেমন মদ্যভাণ্ড পবিত্র করিতে পারে না, সেইরূপ সুমহৎ প্রায়শ্চিত্ত অনুষ্ঠিত হইলেও নারায়ণ-পরাঙ্মুখ ব্যক্তিকে পবিত্র করিতে পারে না। ভগবন্নামের এতই শক্তি যে, নামের শক্তি না জানিয়াও যদি কেহ ব্যাকুল হইয়া তাঁহার নাম করিয়া পুত্রাদিকেও আহ্বান করে, তাহা হইলে সে যমকিঙ্কর-কবল হইতে নিস্তার পায়। পাপী অজামিল এ বিষয়ে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। যমদূতগণ যখন অজামিলের দেহ হইতে লিঙ্গ-শরীর আকর্ষণ করিতেছিল, তখন বিষ্ণুদূতগণ নিষেধ করিয়া কহিলেন, তোমরা কিজন্য ইহাকে আকর্ষণ করিতেছ? যমদূতেরা কহিল, এই অজামিল সারাজীবন অধর্ম্মাচরণ করিয়াছে, সুতরাং ইহার প্রতি আমাদিগের অধিকার আছে। বিষ্ণুদূতেরা কহিলেন—সত্য, কিন্তু হরিনাম কেবল স্বস্ত্যয়ন নহে, বস্তুতঃ মোক্ষপ্রদ। এই ব্যক্তি অবশ হইয়া সেই নাম উচ্চারণ করিয়াছে, সুতরাং ইহার কোটি কোটি পাপ বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। তোমরা এমত মনে করিও না যে, অজ্ঞানকৃত পাপই নামবলে বিনষ্ট হয়, কিন্তু জ্ঞানকৃত পাপ কিছুতেই বিনষ্ট হয় না। তাহা নহে, সুরাপায়ী, মিত্রদ্রোহী, স্বর্ণস্তেয়ী, গুরুপত্নীগামী, গোহত্যাকারী ব্যক্তিও শ্রীহরির নাম-বলে বিগত-পাপ হইবে। ভগবন্নামই শ্রেষ্ঠ প্রায়শ্চিত্ত, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। ভগবানের নাম উচ্চারণ করিবামাত্র ভগবানের এমত মতি হয় যে, এই ব্যক্তি আমারই পুরুষ, ইহাকে রক্ষা করা আমার সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। হে যমদূতগণ! মন্বাদি ব্রহ্মবাদি-মুনিগণ, পাপক্ষয়ার্থ যে সমস্ত প্রায়শ্চিত্ত-ব্রতাদি উপদেশ করিয়াছেন, তাহাতে পাপী ব্যক্তি তাদৃশ শুদ্ধ হয় না, হরির নামবলে যাদৃশ পবিত্র হয়। নামোচ্চারণে পাপ-নাশ-ব্যতীত অন্য ফলও জন্মিয়া থাকে; ভগবানের গুণ সকলও প্রকাশ করিয়া দেয়। উহা চান্দ্রায়ণাদি প্রায়শ্চিত্তের ন্যায় পাপক্ষয় মাত্রে বিনষ্ট হয় না। সমূলে পাপ-বীজ উন্মূলন পক্ষে হরির গুণকীর্ত্তনই উত্তম প্রায়শ্চিত্ত। যেহেতু, এক ভগবানই চিত্ত-সংশোধক। যদিও শাস্ত্রে গুরু পাপের গুরু প্রায়শ্চিত্ত, লঘু পাপের লঘু প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা আছে সত্য, কিন্তু হরিনামে তাদৃশ ব্যবস্থা নাই। এই নাম উচ্চারণ মাত্রে সমুদয় পাপ বিনষ্ট হয়। অধিকন্তু ভগবানের চরণ-সেবা-বলে পাপ-বাসনা পর্য্যন্তও বিনষ্ট হয়। অতএব অন্যান্য প্রায়শ্চিত্তাপেক্ষা হরিনাম-কীর্ত্তনই প্রধান প্রায়শ্চিত্ত। কোনও ব্যক্তি না জানিয়া বীর্য্যবান ঔষধ যদি ভক্ষণ করে, বস্তুশক্তি-বলে সে যেমন ব্যাধি-মুক্ত হয়, সেইরূপ হরিনাম-মন্ত্র অজ্ঞানতঃ উচ্চারণ করিলেও পাপমুক্ত হয়। বস্তুশক্তি কখনও শ্রদ্ধাদির অপেক্ষা করে না।

তদনন্তর যমদূতগণ ধর্ম্মরাজ-সমীপে আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করিল। শুনিয়া যম বলিলেন, হে দূতগণ! আমি এবং অন্যান্য দেবগণ যাঁহার কৃপায় স্ব স্ব পদ প্রাপ্ত হইয়াছি, যিনি সর্ব্বকারণ-কারণ, তাঁহার ভক্তদিগের উপর বা তাঁহার নাম-কীর্ত্তনকারীদিগের উপর আমার কোন অধিকার নাই। সুতরাং যেখানে ভগবদ্ভক্ত সাধুগণ অবস্থান করেন, যেখানে শ্রীহরির নাম কীর্ত্তিত হইতে থাকে, সেখানে তোমরা গমন করিও না। ভগবদ্বিমুখ অধর্ম্ম-পরায়ণ ব্যক্তিদিগকে এখানে আনয়ন করিবে। সুতরাং ভগবদ্বিমুখ ব্যক্তিরাই যে যম-যাতনা ভোগ করে ইহা বেশ বুঝা যাইতেছে। এই মনুষ্য-জন্মে ধর্ম্মোপার্জ্জন করা অবশ্য-কর্ত্তব্য, কারণ এতাদৃশ জন্ম সুদুর্লভ। এই মনুষ্য-জন্ম সুদুর্লভ, অথচ ক্ষণভঙ্গুর, সুতরাং শৈশবকাল হইতেই ভাগবত ধর্ম্ম আচরণ করা বিধেয়। এই জন্মে মহাপুরুষ ভগবান বিষ্ণুর পাদসেবাই শ্রেয়ঃ। যেহেতু তিনি সর্ব্বভূতের প্রিয় আত্মা, ঈশ্বর এবং সুহৃদ্। যদি বল, সুখাদির স্পৃহা কিরূপে ত্যাগ করা যায়? দেহধারণ-নিবন্ধন উহা দুঃখাদির ন্যায় পশ্বাদি-দেহেও লাভ হইয়া থাকে। তদর্থ আয়াস করিবার আবশ্যকতা নাই; তজ্জন্য আয়াসে কেবল আয়ুঃ-ক্ষয় হইয়া থাকে। মুকুন্দ-চরণ-সেবায়, যেমন পরম কল্যাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়, ঐ প্রকারে তাহা কখনও ঘটে না। পুরুষের আয়ু শতবর্ষমাত্র; যে অজিতাত্মা, তাহার তদর্দ্ধ অর্থাৎ ৫০ বৎসর। তন্মধ্যে বাল্য ও কৈশোরে ক্রীড়ায় বিশ বৎসর গত হয়। বৃদ্ধাবস্থায় জরাগ্রস্ত অবস্থায় অক্ষমতানিবন্ধন বিশ বৎসর গত হয়। যদি বল যৌবনে বিষয়ে আসক্ত হইলেও পরে বিরক্তি আসিতে পারে, তখন কল্যাণ-চেষ্টা দেখা যাইতে পারে? তাহা সম্ভবপর নহে। এ পর্য্যন্ত কোনও অজিতাত্মা ব্যক্তি দেহ-গেহাদিতে স্নেহপাশে বদ্ধ আত্মাকে মুক্ত করিতে ক্ষম হইতে পারে নাই। দ্বিতীয়তঃ ধনতৃষ্ণা; ধন কি সামান্য বস্তু? প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তর। দেখা যায়, ধনের জন্য তস্কর, বণিক্ ও সেবক ইহারা জীবন-বিসর্জ্জন করে। প্রণয়ী প্রণয়িনীর সঙ্গ, সুহৃদ্ বন্ধু-সঙ্গ, জনক-জননী কলভাষী শিশুর সঙ্গ কখনও পরিত্যাগ করিতে পারে না। কোষকার কীট যেমন নিজ গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে নিজের নির্গমনের পথ পর্য্যন্ত রাখে না, সেইরূপ বিষয়াসক্ত-চিত্ত জীব আর বিষয়-কূপ হইতে বহির্গত হইতে পারে না। তখন সে জিহ্বা-ও-উপস্থ-জনিত সুখই স্বর্গতুল্য মনে করে। ত্রিতাপ-তাপে-দগ্ধ হইয়াও বিষয় হইতে বিরত হয় না। অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির চিত্ত বিত্তের প্রতি এতদূর আকৃষ্ট যে, ইহ জীবনে রাজদণ্ড ও পর-

জ্ঞানে নরকপাত জানিয়াও পরস্ব অপহরণ করে। এই অধঃপতন নিবারণ করিতে হইলে শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয় লইতে হইবে। তাহা হইলেই সংসার-নাশ হইবে। ভগবান্ হরি, হৃদয় মধ্যে আকাশের ন্যায় বিদ্যমান আছেন, তিনি আত্মার সখা, তাঁহার উপাসনা বড় পরিশ্রমের কর্ম্ম নহে, সুতরাং বিষয়ের জন্য ব্যাকুল হইবার প্রয়োজন কি? বিষয়ের জন্য আসক্ত হইলে শূকরাদি হইতে কোনই ভেদ থাকে না। সুতরাং সমস্ত বিসর্জ্জন দিয়া ভক্তি-যোগে হরির আরাধনা করাই কর্ত্তব্য। মুকুন্দ-প্রীতির জন্য, দ্বিজত্ব, ঋষিত্ব, দেবত্ব, সচ্চরিত্রতা, বহুজ্ঞতা কিছুই আবশ্যক হয় না, কেবল নিষ্কাম ভক্তি দ্বারাই ভগবান্ প্রীত হন। ভক্তি-ভিন্ন আর সব অভিনয়-মাত্র। পশু-পক্ষী, এমন কি নীচজাতিও ভক্তিযোগে অমৃতত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। ভগবান্ গোবিন্দে একান্ত ভক্তি করিয়া সর্ব্বত্র তাঁহাকে নিরীক্ষণ করাই পুরুষের পরম স্বার্থ।

আমরা চাই সুখ, করি দুঃখের কার্য্য! চাই শান্তি, আনি অশান্তি! যাইতে পথে, যাই কু-পথে! চাই সার, সংগ্রহ করি অসার! চাই মিস্ট, খাই তিক্ত! সমস্তই প্রতিকূল! আমার মন বশে নাই, ইন্দ্রিয় বশে নাই, বুদ্ধি বশে নাই। পরকে ভাবি আপন, আপনকে ভাবি পর। নিজেকে চিনি না, উদ্দেশ্য জানি না, জানিবার জন্য চেষ্টাও করি নাই। মীন যেমন জল-ভিন্ন আর কিছুই জানে না; সেইরূপ, আমি এই জগৎ ছাড়া কিছুই জানিনা। তাহা ছাড়া, এই দেহ ও তাহার সুখ-শান্তির এবং পরিজনের ইষ্টানিস্টের চিন্তা ভিন্ন আর কিছুই আমার বুদ্ধিতে আইসে না। আমার অনুভূয়মান জগতের বাহিরে আর কিছু আছে বা থাকিতে পারে, তাহা আমার আদৌ ধারণা নাই। যদি আমার এই ক্ষুদ্র জ্ঞানের অতীত রাজ্যে কিছু থাকে, তবে তাহা আমায় কে বলিয়া দিবে? আমার কি শক্তি আছে যে, আমি ভীষণ কুজ্ঝটিকা ভেদ করিয়া উষার অরুণ-কিরণচ্ছটা দেখিতে পাই? দীনের প্রতি অনেকে দয়া করে, কিন্তু পাতকীর প্রতি কেহই দয়া করে না। গুরু-শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাস, তাহা কত জন্মে হইবে জানিনা। তবে, উপায়? "জাতস্য হি ধ্রুবোমৃত্যুঃ ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।" জন্ম আর মৃত্যু, প্রবাহাকারে চলিতে থাকিল। প্রাণ হাঁপাইয়া উঠে; কোথা যাই, কি করি? হায়! হায়! উপায় কি? এ দুর্দ্দিন কেবল আমার নহে; সকলেরই আসিতেছে ও আসিবে। প্রতি গৃহে আর্ত্তনাদ। হীরক-খচিত স্বর্ণ-সিংহাসনে, পর্ব্বত-প্রমাণ ধনরাশিতে, অযুত দাস-দাসীতে প্রাণের এ জ্বালা জুড়ায় কৈ? আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি নাই, কোন বিষয়েই পূর্ণতা নাই,

হৃদয়ে শান্তি নাই, মুখে মধুরতা নাই, আশার নিবৃত্তি নাই। সুখ দুঃখের, জন্ম মৃত্যুর অনুগামী।

আমি যেন সর্ববিষয়ে পরতন্ত্র একটা জীব-বিশেষ। এ জীবনের সার্থকতা কি? যাহা সুখ বলি, তাহা আবার একদিন দুঃখও বটে। সুখ-দুঃখের নিয়ম নাই। এই প্রহেলিকাময় জীবনভার-বহনে কি ফল কিছুই বুঝি না। জীবনের এই ঘোর সমস্যার কে মীমাংসা করিয়া দিবে? এ জীবন অপেক্ষা স্থাবর জীবন শতগুণে শ্রেষ্ঠ। জ্ঞান আছে, বুদ্ধি আছে, অথচ এ জটিল প্রশ্নের মীমাংসা কিছুতেই করিতে পারি না। আর আমি ভাবিতে পারি না, যদি আমার জ্ঞানের পরপারে অচিন্ত্যশক্তি কেহ থাক, তবে বলিয়া দাও আমি কিরূপে এ যাতনা হইতে অব্যাহতি পাই। ঐ নীল আকাশের অন্তস্থলে, ঐ গ্রহনক্ষত্র-মণ্ডলে যদি কেহ বিরাজমান থাক, তবে বলিয়া দাও কিরূপে আমি এ যাতনা হইতে অব্যাহতি পাই। এই ক্ষুদ্র প্রাণটুকুতে, অনন্ত জগৎ পুরিয়া দেখিলাম কিছুতেই শান্তি নাই। অনন্ত জলধির জলে এ পিপাসা মিটে না। যাহারা এই বিষয়-প্রপঞ্চ লইয়া মজিয়া আছে, তারা বেশ আছে, তারা মোহনিদ্রায় অভিভূত আছে। যে জাগে, সেই কাঁদে। ইচ্ছা আছে—পুর্ণ হয় না, অগ্রসর হই—কে যেন ঠেলিয়া ফেলিয়া দেয়। কে যেন সমস্ত শক্তি নিরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। অনন্ত সরিৎ সাঁতরে পার হওয়া অসাধ্য। এইটুকুই কি মনুষ্য-জীবনের শেষ পর্য্যাপ্তি? জ্ঞান, বিজ্ঞান, যুক্তি, তর্ক, বিচার এখানে নিরস্ত। কিসে আমি শক্তিহীন হইলাম বুঝি না। ওঃ কি পরিতাপ! মানব কিসের জন্য গর্ব্ব করে কিছুই বুঝি না। আমার শক্তি নাই বলিয়াই আমি পরমুখাপেক্ষী।

আমার সম্মুখে বিস্তৃত স্বপ্নরাজ্য, উহা সরিয়া না গেলে, সত্য বস্তু চিনিব কিরূপে? চিরদিন মিথ্যাতেই বঞ্চিত হইয়া আসিতেছি, মিথ্যা সরিয়া না গেলে সত্য চিনিব কিরূপে? ক্ষণভঙ্গুর দেহ, নিত্য বলিয়া বোধ হয়; বিনাশশীল জগৎ, সত্য বলিয়া বোধ হয়; প্রতিনিয়ত ক্ষয়শীল জীবন, চিরস্থায়ী বলে মনে করি। দেহের ও মনের সুখ-দুঃখ আত্মার বলিয়া মনে করি। স্বপ্নবৎ জীবন, যৌবন, দেহ, গেহ, পুত্র, কলত্র চিরসঙ্গী বলিয়া মনে করি। এসব মিথ্যার লীলা সরিয়া না গেলে সত্য বস্তু চিনিব কিরূপে? যে সমর্থ সে নিজ বলে সমস্ত বাধা অতিক্রম করিয়া চলিয়া যায়, আমি অক্ষম কোনও বাধা অতিক্রম করিতে পারি না। সুতরাং আমি পরমুখাপেক্ষী। কিন্তু এমন কে

আছে যে আমার প্রতি দয়া করিবে? ভয় নাই, অবশ্যই কেহ এ জগতের অন্তরালে বিদ্যমান আছেন। যাঁহার শক্তি ভাস্করে, গ্রহনিকরে, ভূধরে, জলধি-কন্দরে, ভূস্তরে, প্রস্তরে, চরাচরে বিরাজমান। জড়ের পাশে চিৎ, সেই চিতের প্রেরণায় জড় কার্য্য করিতেছে। সমস্ত শক্তি যেন একস্থানে কেন্দ্রীভূত হইয়া আছে. সেই শক্তি সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে। যখন শক্তিমান্‌কে দেখিতে না পাই, তখন সেই শক্তিকেই মা বলিয়া ডাকি, তাঁরই পূজা করি। আর যখন শক্তিমানকে দেখিতে পাই তখন তাঁহার চরণে লুঠাইয়া পড়ি। কিন্তু সেই শক্তিমানের দেখা পাওয়া বড় কঠিন। শাস্ত্র ও গুরুবাক্যে এবং স্বীয় অনুভব-বলে, আভাষে যদিও তাঁহাকে চেনা যায় কিন্তু ধরা কঠিন। সাঁতার দিতে হইলে যেমন হাত পা সব খোলা থাকা চাই, সেইরূপ তাঁকে ধরিতে হইলে সব ত্যাগ করিতে হয়। দুকুল রেখে তাঁকে পাওয়া কঠিন। যদিও তিনি সর্ব্বভূতের ঈশ্বর, আত্মা ও সুহৃদ্, তথাপি আমরা এমন একটা দুর্ভেদ্য আবরণের বাহিরে আছি যাহাতে সেই সুহৃদ্‌কে দেখিতে পাই না। পাইবার জন্য সেরূপ চেষ্টাই বা আমাদের কৈ? যতন করিলে অবশ্যই রতন মিলে। আমি মোহ-মদিরা-পানে বিচেতন, সংজ্ঞা নাই, নিজের জ্ঞান না হইলে কে জ্ঞান দিবে? যাহাকে পাইতে চাই সে পরমকারুণিক প্রেমিক। জলে, অনিলে. অনলে, ব্যোমে, মহীতে তাঁহার অপার করুণা প্রকাশিত। যে জন প্রেমিক সে প্রেমের বশ্য। প্রেম ব্যতীত তাঁহাকে ধরা যায় না। যাহাকে আমরা ভালবাসি, স্বতই আমরা তাহার গুণ-পক্ষপাতী হই। যদি সর্ব্বদুঃখ-বিনাশন সেই প্রেমিক পুরুষকে আমরা ভালবাসিতে ইচ্ছা করি, তাহা হইলে তাঁহার গুণাবলীর অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য এবং তাহা কীর্ত্তন করাও কর্ত্তব্য এ কর্ত্তব্য তাঁহার প্রয়োজনের জন্য নহে, আমার স্বপ্রয়োজনের জন্য। দূর হোক বাহ্যজগৎ, উহাতে কি আছে? কতকগুলা মন-মজান জিনিস আছে! সহস্র যুগ ধরিয়া যদি মানব বাহ্যজগতের সেবা করে, তবুও তৃপ্তি পাইবে না। আত্ম-তৃপ্তিতেই তৃপ্তির পরিসমাপ্তি, নচেৎ কিছুতেই তৃপ্তি আসিতে পারে না। মন যত বহির্ম্মুখ হইবে তত যাতনার বৃদ্ধি, যত অন্তর্ম্মুখ হইবে তত যাতনার নিবৃত্তি। প্রেম ও আনন্দই জীবনের প্রয়োজন, সেই সাগরে মিলিতে হইলে প্রেমময়কে পাওয়া আবশ্যক। স্বজাতীয় বস্তুই ঠিক্ মিলিতে পারে, বিজাতীয় ও স্বজাতীয়ে মিলন হয় না। সুতরাং প্রেমময়ের সহিত মিলিতে হইলে প্রেম দিয়াই মিলিতে হইবে। সুতরাং তাঁহার প্রতি তীব্র অনুরাগ উদ্দীপিত করা

আবশ্যক। জীবনের সর্ব্ববিধ অসামঞ্জস্যের সামঞ্জস্য যেখানে হইবে, সেখানে সর্ব্বস্ব বলি দিতেই হইবে। আমরা যদি হৃদয় সেই প্রেমিকের নিকট বিক্রয় করি, তাহা হইলে তিনিও আমাদের নিকট চিত্ত-বিক্রয় করিবেন।

ভগবান্ নিজ মুখেই বলিতেছেন ;—

নাহমাত্মানমাশাসে মদ্ভক্তৈঃ সাধুভির্বিনা।
শ্রিয়শ্চাত্যন্তিকীং ব্রহ্মন্ যেষাং গতিরহং পরা। ভাঃ ৯। ৪। ৪৭
যে দারাগার-পুত্রাপ্ত-প্রাণান্ বিত্তমিমং পরং।
হিত্বা মাং শরণং যাতাঃ কথং তাং স্ত্যক্তু মুৎসহে।
ময়ি নির্ব্বদ্ধহৃদয়াঃ সাধবঃ সমদর্শনাঃ।
বশে কুর্ব্বন্তি মাং ভক্ত্যা সৎস্ত্রিয়ঃ সৎপতিং যথা। ৪৮

"হে মুনিবর! যে সকল মানবদের আমিই পরাগতি, সেই সমস্ত সাধু ভক্তজন আমার প্রিয়, এজন্য সাধুভক্তেরা আমার হৃদয় গ্রাস করিয়াছে। যাহারা পুত্র, কলত্র, গৃহ, স্বজন, ধন, প্রাণ এবং ইহলোক ও পরলোক সমুদয় বিসর্জ্জন দিয়া আমার শরণাপন্ন, আমি তাহাদিগকে কিরূপে পরিত্যাগ করিতে পারি? সর্ব্বত্র সমদর্শী সাধু পুরুষেরা আমাতে হৃদয় সমর্পণ করিয়া সতী স্ত্রী যেমন পতিকে বশীভূত করে, সেইরূপ তাহারা আমাকে বশীভূত করিয়াছে। তাহারা আমার সেবা ব্যতীত মুক্তিও কামনা করে না। তাহারা আমা-ভিন্ন আর কিছুই জানে না; আমিও তাহাদের হৃদয় ব্যতীত আর কিছু জানি না।" অতএব আমরা যদি সর্ব্বান্তঃকরণে ভগবানের শরণাপন্ন হইতে পারি, তাহা হইলে তিনি অবশ্যই মাদৃশ শক্তিহীন ব্যক্তিদিগকে উদ্ধার করিবেন।

তাঁর দয়ার অবধি নাই; তিনি গুরুরূপে, শাস্ত্ররূপে, কখনও স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়া পতিতজনের উদ্ধারার্থ, স্বয়ং দ্বারে দ্বারে ঘুরিতেছেন। আমরা নিজ কর্ম্মদোষে নিরবধি কষ্ট পাইতেছি। তাঁকে দেখিতে পাই না বলিয়া আমরা দুঃখ করি, কিন্তু দেখিবার জন্য কোনই চেষ্টা করি না। তিনি দূরে নহেন বাহিরে নহেন, অন্তরেই বিরাজমান, তবুও তাঁহাকে দেখিতে যত্ন করি না, স্বয়ং সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেও তখন সামান্য বুদ্ধিতে উপেক্ষা করি। কত দুঃখ, কত যাতনা, কত তাপ, কত আর্ত্তনাদ, তবুও এ নিরয় হইতে অব্যাহতি পাইতে চেষ্টা করি না। প্রতিপদেই দোষ আমাদের, সুতরাং আমরা অন্য কাহাকেও দোষী করিতে পারি না। অনন্ত মহিমাময় ভগবানের নাম, সেই নামেই সর্ব্বার্থসিদ্ধি। যেখানে শাস্ত্র-বিমুখতা, সেখানে নাম প্রধান। ভগবানের

নামে পাপ-তাপ-শোক-দুঃখ সমস্তই দূর হয়। বস্তু শক্তি অচিন্ত্য, উহা বিচার দ্বারা প্রমাণ করা যায় না, কিন্তু অনুষ্ঠানবলে আপনি ক্রিয়াশক্তি প্রকাশ পায়। ভবদাবদাহ-নির্ব্বাণের একমাত্র উপায় নামামৃত। ভবরোগের একমাত্র ঔষধ নামামৃত, সন্তপ্তহৃদয়ে শান্তিবারি সেচনের উপায় নামামৃত। কামাসক্ত-চিত্ত ব্যক্তির এ পক্ষে বিশ্বাস-স্থাপন সুদুর্লভ। যে বিষয়ের জন্য পাগল, সে ভগবানের প্রতি বিমুখ। আর যে ভগবানের জন্য পাগল, সে সংসারের প্রতি বিমুখ। কিন্তু ধন, জন, পুত্র কলত্রাদির সম্বন্ধ অনিত্য, আর ভগবানের সহিত সম্বন্ধ নিত্য। সুতরাং ভগবানের প্রয়োজনীয়তাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। দুঃখ-হানি ও শান্তিপ্রাপ্তি নিমিত্ত, ভগবানের একান্ত প্রয়োজনীয়তা। আমি দুঃখী, আমি সুখ চাই। যদি বল বিষয়ে পর্য্যাপ্ত সুখ আছে, "আপাতবিষয়া রম্যাঃ পর্য্যন্ত-পরিতাপিনঃ" সে সুখ আপাত-রমণীয়, কিন্তু পরিণামে পরিতাপ-প্রদ।

তুমি অর্থার্থী, ভগবানের শরণাপন্ন হও, তিনি তোমার অপ্রাপ্তবস্তু মিলাইয়া দিবেন, প্রাপ্তবস্তু রক্ষা করিবেন। সে কামী, ভগবানের শরণাগত হউক, তাহার সর্ব্বকাম পূর্ণ হইবেক। তুমি মুমুক্ষু, মুকুন্দের শরণাগত হও, আশা পূর্ণ হইবে। তুমি মোক্ষার্থী, তাঁর শরণ লও, তিনি তোমায় মুক্তি দিবেন। তুমি সেবারসিক, তাঁহার শরণাগত হও, তাঁহার চরণসেবার অধিকারী হইতে পারিবে। সে দ্বারে কেহই নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আইসে না। তবু অবিবেকী মূর্খজনে তাঁহাকে নিষ্ঠুর বলে। নিজে চলিতে না জানিলে পথের দোষ হয়। দোষ কারও নহে, দোষ নিজ কর্ম্মের। ভগবান কল্পতরু, তাঁহার নিকট যাহা প্রার্থনা কর তাহাই পাইবে। তাঁহাকে প্রাণের সহিত ডাক, তাহা হইলে তিনি দেখা দিবেন। সেই মায়িক পুরুষকে দেবতারাও সহজে চিনিতে পারেন না। যাঁহার মায়ায় বিমুগ্ধ হইয়া মাতা যশোদা পুত্রভাবে দেখিয়াছিলেন, যাঁহার ইচ্ছায় কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডের উদ্ভব হয়, সেই সর্ব্বেশ্বর পুরুষকেও ব্রজে কেহ সখা, কেহ পতি, কেহ পুত্রভাবে দেখিয়াছিল। কি আশ্চর্য্য ব্যাপার! কেহই তাঁহার স্বরূপ-নির্ণয় করিতে পারে না। তিনি ভক্তের নিকট সততই বিরাজমান, কিন্তু অভক্তের দূরে। যাতনার হাত হতে অব্যাহতি পাইতে হইলে তাঁহাকে পাওয়াই চাই। ফেলিয়া দাও দূরে তর্কভাণ্ড; শাস্ত্র ও গুরুবাক্যে দৃঢ় প্রত্যয় স্থাপন কর; সাধনা কর, নিশ্চিতই বাসনা পূর্ণ হইবে। নিশ্চয়ের দৃঢ়তা না জন্মিলে বিশ্বাস জন্মিবে না। বিশ্বাস না জন্মিলে শ্রদ্ধা, রতি জন্মিবে না। সুতরাং প্রথমে নিশ্চয়ের দৃঢ়তা হওয়া আবশ্যক।

(ক্রমশঃ)

বৃন্দাবন-সংবাদ।

(উদ্ধবের উক্তি)

লেখক—শ্রীগোপালচন্দ্র কবিকুসুম।

(১)

গোকুলে আকুল সব এবে, নিরানন্দ, বিষাদ মলিন,
বৃন্দাবন-বিহারী-বিহনে শান্তিহীন যেন রাত্রি দিন।
ধবলী-শ্যামলী-লীলা আর শষ্প-আশে গোষ্ঠে নাহি যায়!
গোপাঙ্গনা কুরঙ্গ-নয়না নাহি মিলে কদম্বতলায়!
কালিন্দীর নীলাম্বু নিচয় নাহি তুলে তরঙ্গ-তুফান;—
মুরারির মুরলীর রবে আর কভু বহে না উজান!
ব্যাকুল কোকিলকুল ডালে আর নাহি তোলে সে ঝঙ্কার,
পুঞ্জে পুঞ্জে গুঞ্জরি ভ্রমর কুঞ্জে কুঞ্জে ভ্রমে নাক আর!
কমনীয় কুসুম-সুষমা, মনোরম পরিমল-বাসে—
ধীরে ধীরে নিকুঞ্জ-কুটীরে নাহি খেলে মঞ্জুল বাতাসে!
ক্ষীণ-পুণ্য বৃন্দাবনধামে মধুমাসে না আসে উষসী,
প্রিয়া-চঞ্চু না করে চুম্বন, শুকসারি সারি বসি!

(২)

সুনিবিড় নিতম্বের ভারে, পয়োধরে মন্থর-গমনা,
ভেটিবারে শ্যাম-জলধরে প্রেমভরে, পঙ্কজ-আননা,
মেঘ-মন্দ্রে সান্দ্র অন্ধকারে, বিকম্পিতা চম্পক-লতিকা,
অভিসারে নাহি সরে আর বিম্বাধরা আভীর-বালিকা।
কুতূহলী হোলীর উৎসবে না হেরিয়া নন্দের দুলাল,
প্রেমাঙ্কিত কুঙ্কুমের রাগে নহে কেহ ফাগে লালে লাল!
গোপবালা নানা ছলা করি নাহি আনে যমুনার বারি;
অনর্গল নয়নের জলে সবাকার পূর্ণ হেম-ঝারি!
কম্বুগ্রীবা কাদম্বার মত অসম্বৃতা নীলাম্বরী পরি'—
মুগ্ধাঙ্গনা বৃন্দাবন-পথে নাহি ফিরে দিবা-বিভাবরী।

সকলি বিশীর্ণ-কায় হায়, তব তীব্র বিরহ-অনলে,—
যমুনাই বাড়িতেছে শুধু গোপিনীর গুপ্ত অশ্রুজলে।

নীলাম্বরের কথা।

বহুরূপ তারা।

লেখক—শ্রীরাধাগোবিন্দ চন্দ্র, এম্, বি, এ, এ।

বৃষরাশির SU তারাটীর কথা আমরা পূর্ব্বে একবার আলোচনা করিয়াছি, এই তারাটী দীর্ঘকাল কমবেশী ৯.৭ স্থুলত্বে অবস্থান করিয়া অকস্মাৎ একদিন হ্রাস পাইতে আরম্ভ করে এবং বার হইতে যোল দিনের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া যায়। এই প্রকার অদৃশ্য অবস্থায় SU তারা প্রায় ছয় মাস হইতে এক বৎসর কাটায়। ক্যানাডা হইতে মিঃ ওয়াটার ফিল্ড সংবাদ দিয়াছেন যে ৩০ আগষ্টের দুই তিন দিন পূর্ব্বে SU তারার জ্যোতিঃ হ্রাস পাইতে আরম্ভ করিয়া ১১ সেপ্টেম্বর উহা ১২.৪ স্থুলত্বে পরিণত হইয়াছে। ঐ সময়ে আকাশের অবস্থা ভাল না থাকায় আমরা উহাকে পর্য্যবেক্ষণ করিতে পারি নাই। আমরা ৩ অক্টোবর উহাকে দেখিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম, ঐ দিন উহার স্থুলত্ব ১২.১ হইতেও ক্ষীণ ও আমাদের দূরবীণে অদৃশ্য ছিল, এবং অদ্যাবধি উহা আমাদের দূরবীণে অদৃশ্য আছে। গত ১৯১৬ খৃঃ অঃ এই তারাটী একবার অদৃশ্য হইয়াছিল, তৎপরে গত আট বৎসর উহা স্বাভাবিক স্থুলত্ব ৯.৭ এ বিদ্যমান ছিল, তবে মধ্যে মধ্যে অতি সামান্যমাত্র কমবেশী হইত।

ক্ষুদ্র সর্পরাশির V তারাটীর উদয় হইয়াছে, আমরা ২৯ অক্টোবর রাত্রি ৪টা ২৪ মিনিটের সময়ে উহাকে পূর্ব্বগগনে প্রথম দেখিয়াছি। ঐ দিন উহার স্থুলত্ব ১১.৪ ছিল তৎপরে ২৯ নভেম্বর ও ৪ ডিসেম্বর উহাকে আবার পর্য্যবেক্ষণ করিয়া ছিলাম, উভয়দিনেই উহাকে ১১.৭ স্থুলত্বে দেখিয়াছি। ২৯ নভেম্বরের পর্য্যবেক্ষণ-কালে ঐ তারাটীর অতি নিকটে ১২.০ স্থুলত্বের আর একটী ক্ষুদ্র তারা দেখিতে পাই, ঐ দিন রাত্রি শেষ হইয়া যাওয়ায় উহাকে বেশ ভাল করিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিতে পারি নাই; তৎপরে ৪ ডিসেম্বর রাত্রি সাড়ে

তিনটার সময়ে আকাশের অবস্থা খুব ভাল থাকায় আমরা অত্যন্ত মনোযোগের সহিত উহাকে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া স্থির নিশ্চয় করিয়াছি যে V. Hydrae র অতি নিকটে ১২·০ স্থূলত্বের একটী ক্ষুদ্র তারা আছে। আমরা ইতিপুর্ব্বে আর কখনও ঐ ক্ষুদ্র তারাটীকে দেখি নাই, বহুরূপ তারা সম্বন্ধীয় কোন পুস্তকাদিতেও এই তারাটী যে যুগল-নক্ষত্র তাহারও কোন নিদর্শন পাই নাই। আমাদের মনে হয় ঐ ক্ষুদ্র তারাটী হয় নূতন নতুবা V. Hydrae তারার সহচর অর্থাৎ V. Hydrae তারা যুগল নক্ষত্র, কিন্তু উহাদের পরস্পরের দূরত্ব ও কৌণিক অবস্থান এরূপ ছিল যে ইতিপুর্ব্বে উহাদিগকে পৃথক্ দেখা যায় নাই। বস্তুতঃ V. Hydrae তারা এবারে যতটা ক্ষীণ হইয়াছে ইতিপুর্ব্বে আর কখনও ততটা ক্ষীণ হয় নাই সুতরাং V তারার উজ্জ্বল জ্যোতিতে ক্ষীণ তারাটী ঢাকিয়া থাকায় উহাকে দেখিতে পাওয়া যাইত না। কিন্তু তাহা হইলেও ফটোগ্রাফের প্লেটে অথবা আলোক বিশ্লেষণ যন্ত্রেও উহা লুকাইয়া থাকিতে পারে না, এইজন্য আমরা হারভার্ড মান মন্দিরের কর্ত্তৃপক্ষের নিকটে এই তারাটীর পুর্ব্বের গৃহিত ফটোগ্রাফ ও Spectroscopic পর্য্যবেক্ষণের বিবরণ চাহিয়া পাঠাইয়াছি এবং আমাদের পর্য্যবেক্ষণের সবিশেষ বিবরণ লিখিয়াছি। তাঁহাদের নিকট হইতে সংবাদ পাইলে তবে ঐ তারাটীর সম্বন্ধে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিব।

হ্রদ সর্পরাশির R. তারাটীও পুর্ব্বগগনে দেখা দিয়াছে, ২৯ নভেম্বর শেষ রাত্রে ৫টা ১২ মিনিটের সময়ে আমারা উহাকে প্রথম দেখিয়াছি ঐ দিন উহার স্থূলত্ব ৯·১৪ ছিল। ১ অক্টোবর ঐ তারাটীর ক্ষীণতম জ্যোতিতে থাকিবার কথা, উহার ক্ষীণতম জ্যোতিঃ ৯·৮ পর্য্যস্ত হইতে পারে সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে উহার জ্যোতিঃ বৃদ্ধি পাইতে আরম্ভ করিয়াছে। আগামী ১৯২৫ খৃঃ অঃ এপ্রিল মাসের ২৭ তারিখে উহা স্থূলতম জ্যোতিতে উপনীত হইবে। ক্ষীণতম জ্যোতিঃ হইতে স্থূলতম জ্যোতিতে উপনীত হইতে এই তারাটীর ১৯০ দিন সময় লাগে। সুতরাং হিসাব মত ১৯ অক্টোবর হইতেই উহার জ্যোতিঃ বৃদ্ধি আরম্ভ হইয়াছে। আমাদের মনে হয় মার্চ্চ মাসের মাঝামাঝি এই তারাটী খালি চক্ষে দেখিতে পাওয়া যাইবে।

বকরাশির চাই তারাটী এক্ষণে স্থূলতম জ্যোতিতে উপনীত হইয়াছে এবং খালিচক্ষে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। কিন্তু চাই এবারে পুর্ণতম স্থূলজ্যোতিঃ প্রাপ্ত না হওয়ায় সাধারণের পক্ষে খালি চক্ষে দেখা কষ্টসাধ্য। Binocular

অথবা ফিল্ড গ্লাস দ্বারা আজকাল সন্ধ্যার পরেই পশ্চিম আকাশে চাই তারাকে স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। এবারে উহার স্থূলত্ব ৬'২ এর বেশী হয় নাই।

উত্তর কিরীট রাশির R তারাটী ১৯২৩ খৃঃ অঃ আগস্ট মাস হইতে ১৯২৪ খৃঃ অঃ ১ জুন পর্য্যন্ত সাধারণতঃ ৬'১ স্থূলত্বে বিদ্যমান ছিল, অবশ্য মধ্যে মধ্যে সামান্য হ্রাস-বৃদ্ধি হইত। পরে ২৫ জুলাই জ্যোতিঃ বৃদ্ধি পাইয়া ৫'৮ স্থূলত্ব লাভ করে এবং ২রা সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ঐ অবস্থায় থাকে তৎপরে উহার জ্যোতিঃ হ্রাস পাইতে আরম্ভ হয় এবং ১৩ই অক্টোবর ক্ষীণতম জ্যোতিঃ ৮'৮ স্থূলত্বে পরিণত হয়, তৎপরে উহার জ্যোতিঃ বৃদ্ধি আরম্ভ হয়, এবং ২০শে ডিসেম্বর স্বাভাবিক স্থূলত্ব ৬'২ প্রাপ্ত হইয়া আজিও ঐ অবস্থায় বিদ্যমান আছে। উহার পর্য্যবেক্ষণের বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল:—

সন ও তারিখ।			স্থূলত্ব	মন্তব্য।
১৯২৪ খৃঃ অঃ	সেপ্টেম্বর		৫ ৮০	স্থূলতম।
		১৬	৬ ০১	
,,		২৬	৬'২০	
	,,	২৮	৬ ৬০	
,,	অক্টোবর	৭	৮'১০	
,,	,,	১৩	৮ ৮০	ক্ষীণতম
,,	,,	১৬	৮ ৪০	
,,	,,	১৭	৮'৫০	
,,	,,	২০	৮ ২০	
,,	,,	২২	৮'০০	
,,	,,	২৪	৭'৪০	
,,	,,	২৮	৭ ০০	
,,	,,	৩১	৬ ৯০	
,,	নভেম্বর	২	৬ ৮০	
,,		১৪	৬ ৬০	সূর্য্যাস্তের পরে পশ্চিমাকাশে দৃষ্ট।
,,		২২	৬ ৪০	সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে পূর্ব্বাকাশে দৃষ্ট।
,,	,,	২৯	৬'৪০	
,,	ডিসেম্বর	৩	৬'৪০	
,,	,,	৭	৬ ৪০	
,,	,,	২০	৬'২০,	

তিমিরাশির মার তারাটী ২২শে ডিসেম্বর স্থূলতম জ্যোতিঃ ৩'৬৫তে উপনীত হইয়া খালিচক্ষে দৃষ্ট হইতেছে। এবারে মার চতুর্থ শ্রেণীর তারার স্থূলত্ব লাভ করায় সাধারণতঃ সকলেই উহাকে দেখিতে পাইয়াছেন। এখনও মার কিছুদিন খালিচক্ষে দেখিতে পাওয়া যাইবে।

কোপেন হেগেনের সেণ্ট্রাল বুরো ২০শে সেপ্টেম্বর ঘোষণা করেন যে জার্ম্মাণির বননগর হইতে ১৫ই সেপ্টেম্বর তারিখে মিঃ ফিন্‌স্লার একটী নূতন ধূমতারার আবিষ্কার করিয়াছেন। ফিন্‌স্লারের আবিষ্কারের পরে ১৯শে সেপ্টেম্বর বেডেল্‌সবার্গ হইতে প্রেগার, ২১শে সেপ্টেম্বর লিক মানমন্দির হইতে জেফার্স, ২২শে সেপ্টেম্বর নর্থফিল্ড হইতে উইলসন্ এবং গিন্‌গ্রিচ, ২৩শে সেপ্টেম্বর ওয়াসিংটন হইতে বাওয়ার উহাকে পর্য্যবেক্ষণ করেন। ডিয়ার বর্ণ মানমন্দির হইতে কুমারী গুশী এবং প্রফেসার কম্রি উহার অবস্থান গতি ও দূরত্ব প্রভৃতি নির্ণয় করিয়াছেন। ইয়ারকিস্ মানমন্দির হইতে প্রফেসার ভন্ বিসব্রোক ২০শে সেপ্টেম্বর উহার ফটো গ্রহণ করেন। ২১শে সেপ্টেম্বর ৪০ ইঞ্চি ব্যাসের দূরবীণে উহাকে পর্য্যবেক্ষণ করা হয়। অতঃপর ধূমতারাটীকে খালিচক্ষেও দেখিতে পাওয়া যায় ঐ সময়ে উহার ক্ষুদ্র পুচ্ছও দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল। প্রফেসর কোবল্ড এই ধূমতারায় যে গতিবিধি ও অবস্থানাদি নির্ণয় করেন তাহা, ৭৭০ খৃঃ অঃ চীনদেশে দৃষ্ট একটী ধূমতারার সহিত অধিকাংশে মেলে। আমরা এখান হইতে এই ধূমতারাটীকে দেখিবার সুযোগ পাই নাই।

"চণ্ডী ও গীতোক্ত নিষ্কামবাদ।"

লেখক—শ্রীসুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

গীতায় নিষ্কামবাদ এবং চণ্ডীতে অর্গলাস্তবে 'দেহি দেহি' প্রার্থনা-বাদ দৃষ্ট হয়। উভয়ই মহাশাস্ত্র এবং মানব-জীবের মুক্তি-ফলপ্রদ। কিন্তু, দৃশ্যতঃ মনে হয়, ঐ দুইটি শাস্ত্র যেন পরস্পর বিপরীতমুখী। কেননা একটি শাস্ত্র মানবকে কর্ম্মফল "শ্রীকৃষ্ণে" অর্পণ করিয়া কর্ম্ম দ্বারা কর্ম্মমুক্ত হইবার উপায় প্রদান করিতেছে; অপর শাস্ত্রটি "দেহি দেহি" প্রার্থনা-বাদ দ্বারা প্রার্থনা পরিপুরণ করিয়া যেন বাসনানুগত কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া কর্ম্মাসক্তি বাসনা-সিদ্ধির জন্য বাসনানুগত প্রার্থনা করিতেছে।

বস্তুতঃ কিন্তু আমার মনে হয় উভয় শাস্ত্রই জীবকে একই পথে একই গন্তব্যে পরিচালিত করিতেছে।

মানুষ বাসনানুগত কর্ম্মবদ্ধ জীব। কর্ম্মানুসরণ করিয়া কর্ম্ম করিবার জন্যই "দেহি"রূপে জীব জীবদেহ অর্থাৎ স্থূলদেহ ধারণ করিয়াছে।

সুতরাং বাসনাবদ্ধ দেহী জীব বাসনা পরিপূরণের জন্য মহাশক্তির নিকট "দেহি দেহি" অর্থাৎ "দেহী" কিনা শরীরী হইয়া জীবাত্মা দেহি দেহি অর্থাৎ দেও দেও বলিতেছে।

দেহি দেহি বলিয়া কার কাছে চাহিতেছে? মহাশক্তির নিকট। পাইবে কে? জীব। কিরূপে পাইবে? আত্মশক্তির উদ্বোধন করিয়া। অর্থাৎ শক্তির সাহায্যে শক্তি-লাভ করিয়া জীব প্রকাম্যের অধিকারী হইবে।

আগে প্রকাম্যের অধিকারী হইয়া বাসনা-পরিপূরণ করিয়া তখন বাসনানুগত ভোগ অর্থাৎ কর্ম্ম-ভোগ, কর্ম্মের দ্বারা ক্ষয় করিয়া বাসনা শুদ্ধ করিয়া কর্ম্মশুদ্ধির দ্বারা তবে কর্ম্ম-মুক্ত অর্থাৎ বাসনা-বদ্ধ কর্ম্মমুক্ত হইবে।

অর্থাৎ অনাসঙ্গ কর্ম্ম দ্বারা অনাসক্ত হইয়া, শক্তি-সাহায্যেই অর্থাৎ আত্ম-শক্তিতে, কিনা আত্মার শক্তিতে মুক্ত হইবে।

সুতরাং দেখা যায় গীতা ও চণ্ডী একই বিষয়ে অর্থাৎ মুক্তির পথে মানবকে পরিচালিত করিতেছে। উভয় শাস্ত্রই মুক্তি-নিয়ামক হইয়া মুক্তির উপায় নির্দ্ধারিত করিতেছে।

উভয় শাস্ত্রই জীবাত্মা অর্থাৎ জীব-চৈতন্যকে উদ্বোধিত করিতেছে। জীবাত্মা নর-নারায়ণরূপী অর্জ্জুন, অর্থাৎ যিনি অর্জ্জনে কিনা acquire করিবার জন্য সমর্থবান অর্থাৎ অধিকার করিবার শক্তি কিনা সামর্থ্যযুক্ত জীবকে প্রাপ্তি অর্থাৎ পাইবার জন্য উদ্বোধিত করিয়া প্রাপ্ত করাইয়া প্রবোধিত করিতেছে।

জীব কে? কে ইনি? ইনি পরমব্রহ্ম; পরমব্রহ্ম মায়িকভাবে আপনার মায়ায় জগৎ সৃষ্টি করিয়া আপনার সৃষ্ট জগতে আসিয়া মায়িক লীলা করিতেছেন। জীব-রূপে ব্রহ্ম কর্ম্ম-সাধনের জন্য এবং ব্রহ্ম-কর্ম্ম-সাধন করিয়া ব্রহ্মেই গমন করিবার জন্য আসিয়াছেন।

জীবভাবে মায়িক দেহে মোহাধীন হইয়া আত্ম-বিস্মৃতিবশতঃ উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া, জীব প্রকৃতির অধীনতায় মোহপাশাবদ্ধ হইয়া কর্ম্মের ফেরে পড়িয়া কর্ম্মাধীন হইয়াছে।

মায়া যাঁহার সৃষ্ট, মোহ যাঁহার সৃষ্ট, যাঁহারই বাসনা, যাঁহারই কামনা, কর্ম্ম যাঁহার অধীন, তিনি মোহপাশবদ্ধ হইয়া কর্ম্মাধীন হইয়া পড়িয়াছেন।

যিনি স্বয়ং আত্মা, যিনি জীব-চৈতন্য, যিনি "স্ব", তিনি নিত্যমুক্ত স্বভাব-বিশিষ্ট হইয়া, মায়া-প্রকৃতির অধীনে পাশবদ্ধ নিরুপায়ভাবে পড়িয়া আছেন।

জগৎ যাঁহার সৃষ্ট, ব্রহ্মাণ্ড যাঁহার পদানত, যিনি স্বয়ং ব্রহ্মশক্তি, তিনি ব্রহ্মাণ্ডের নিকট দেহি দেহি করিতেছেন। যিনি খাদক, যিনি ক্ষুধা, যিনি খাদ্য, তিনি ক্ষুধার জ্বালায় খাদ্যের নিকট দেহি দেহি করিতেছেন। খাদ্য তাঁহার আয়ত্ত, কিন্তু সামর্থ্যহীন-ভাবে মনে করিতেছেন অনায়ত্ত বা অসাধ্য।

ইহাই ভ্রান্তি, অজ্ঞানতা, মায়া-প্রভাব বা অবিদ্যা। চণ্ডীতে, অবিদ্যাসম্ভূত মায়া-মরীচিকা-ভ্রান্ত জীবকে বিদ্যায়ত্ত করিয়া বিদ্যা-প্রভাবে অবিদ্যামুক্ত করিয়া মায়াতীত করিবার জন্য, উপায়-সাধনা প্রদান করিয়াছে। মায়া-শক্তি মায়া-মোহ বা অবিদ্যা প্রকৃতি পাশ হইতে মুক্ত হইবার জন্য মহাশক্তি ব্রহ্ম-চৈতন্য অর্থাৎ জ্ঞানলাভ করিয়া ব্রহ্ম-জ্ঞান অর্থাৎ শুদ্ধসত্ব হইয়া আত্মশুদ্ধ হইয়া জ্ঞান-প্রভাবে অর্থাৎ বিদ্ কিনা বিদ্যা-প্রভাবে অবিদ্যা-মুক্ত হইবার উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছে।

জীব বাসনানুগত হইয়া কর্ম্মাধীন হওয়া এবং কর্ম্ম জীবের অধীন হওয়ার মধ্যে তফাৎ আছে। জীব বাসনার দাস নহে; বাসনা জীবের দাসী হওয়া যায়।

কর্ম্মহীন কেহ নহেন, ব্রহ্ম স্বয়ং সৃষ্টি-বাসনায় কর্ম্মযুক্ত হইয়া "ঈশ্বর।" "ভগবান"রূপে "কর্ম্ম বিধান" করিতেছেন। জীবরূপী ব্রহ্ম হইয়া তিনিই জীবের দ্বারা তাঁহার কর্ম্ম সাধন করিয়া লইতেছেন।

সুতরাং মানুষের একটা কর্ত্তব্য, একটা বিশেষরূপ কর্ত্তব্যের দায়িত্ব আছে; মানুষ ভগবানের সৃষ্ট, শ্রেষ্ঠ জীব; সুতরাং মানুষ ব্রহ্মের সৃষ্টির যন্ত্র-স্বরূপ হইয়া ব্রহ্ম-কর্ম্ম সাধন করিবে।

কিন্তু, মানুষ সাধারণতঃ অবিদ্যাচ্ছন্ন হইয়া আত্ম-বিস্মৃত হইয়া বাসনাধীন হইয়া কামফল-প্রাপ্তির জন্য যত্নপরায়ণ হয়। মরীচিকা-লুব্ধ মৃগের ন্যায় মরীচিকায় ভ্রান্ত হইয়া বিড়ম্বিত হইয়া থাকে। ইহা জীবের অজ্ঞানতার ফল।

কিন্তু, জ্ঞান-যোগে জীব আত্মাবধারণ করিয়া আত্ম-উদ্বুদ্ধ হইলে, আত্ম-শক্তি-বলে সমুদয় প্রকামা অনায়াসলব্ধরূপে আয়ত্ত করিয়া, অর্থাৎ জীবের প্রকাম্য জীবের আয়ত্ত হয়, এবং জীব শুদ্ধ জ্ঞানে শুদ্ধভাবে তাহা ভোগ করে। Lower Self অর্থাৎ জীব ক্ষুদ্রত্বে আপনার শক্তি অজ্ঞাত থাকিলে বাসনা-পাশে বদ্ধ হইয়া মরীচিকাভ্রান্ত লুব্ধ মৃগের ন্যায় বিড়ম্বিত হয়।

(ক্রমশঃ)

শ্রীহরিঃ

(১৮৪৫ সালের ২০ আইন্ মতে রেজেষ্ট্রীকৃত)

হিন্দু-পত্রিকা

৩১শ বর্ষ, ৩১শ খণ্ড
১০ম সংখ্যা।

মাঘ।

১৩৩১ সাল।
১৮৪৬ শকাব্দাঃ

শ্রেয় ও প্রেয় যাত্রী।

লেখক—সম্পাদক।

(১)

শ্রেয় প্রেয় নামে গুরু আছে দুই জন,
নিরন্তর ধরাধামে করিছে ভ্রমণ।
অহর্নিশ দুইজনে মানবে আহ্বানে,
এস এস নরনারী মম সন্নিধানে।
শ্রেয় বলে, শুন শুন মম উপদেশ,
সহজে পারিবে যেতে দিব্য ব্রহ্মদেশ।
প্রেয় বলে, ব্রহ্মলোক শুধুই কল্পনা,
মিথ্যা কথা বলি শ্রেয় করিছে বঞ্চনা।
সুখময় মম পথে এস জীবগণ,
খেয়ে দেয়ে সুখে থেকে, কাটাও জীবন।

(২)

জ্ঞানী যত শ্রেয়োমার্গে করিছে গমন,
অজ্ঞানেরা প্রেয়োমার্গে করে বিচরণ।
এইরূপে দুই শ্রেণী দুই দিকে যায়,
অবশেষে পরস্পরে দেখা নাহি পায়।
প্রেয়োযাত্রী যত সদা ভাবে মনে মনে,
বড়ই পণ্ডিত তারা সব কিছু জানে।
অন্ধ যথা অন্ধ দ্বারা হইয়া চালিত,
অন্ধময় কূপ মধ্যে হইয়া পতিত,
শিরে করাঘাত করে, ত্যজে অশ্রুজল,
প্রেয়োযাত্রী সেইরূপে ভুঞ্জে কর্ম্মফল।
বিত্তমোহে প্রেয়োযাত্রী সদাই উন্মত্ত,
হৃদয়ে জাগে না কভু পরকালতত্ত্ব।
ইহলোক ভিন্ন আর নাহি কোন লোক,
ঘোর অন্ধকারে থাকে, না পায় আলোক।
শুনে না জ্ঞানের কথা, বোঝে না শুনিলে,
বক্তা শ্রোতা বোদ্ধা মিলে অল্পই ভূতলে।
অবর জনের দ্বারা আত্মা হ'লে প্রোক্ত,
শিষ্য-সন্নিধানে কভু হ'ন না সুব্যক্ত।

(৩)

অজর অমর আত্মা মারে না, মরে না,
মরা মারা ধর্ম্ম কভু আত্মায় খাটে না।
নাহিক জনম তার, নাহিক মরণ,
নাহি চক্ষু কর্ণ তার, নাহিক চরণ।
দেখেন শোনেন তবু, করেন গমন,
মন নাহি তার তবু করেন মনন।
সূক্ষ্ম হ'তে সূক্ষ্ম তিনি, স্থূল হ'তে স্থূল,
জগতের হন তিনি একমাত্র মূল।
অনলে আছেন তিনি, আছেন অনিলে,
আকাশে আছেন তিনি, আছেন সলিলে।

ক্ষিতিতে আছেন তিনি, জীবের অন্তরে,
সর্ব্বত্র আছেন তিনি সবার ভিতরে।
অন্তরে থাকিয়া তিনি যমেন সকলে,
এইহেতু শাস্ত্রে তাঁরে অন্তর্য্যামী বলে।
শান্ত সমাহিত হ'য়ে ভজিলে তাঁহারে,
কৃপা করি দেন দেখা জীবের অন্তরে।
তাঁহারে জানিলে হয় জীবন সফল,
না জানিলে তাঁরে হয় জীবন বিফল।

শ্রীশ্রীসরস্বতী-মূর্ত্তি ও পূজার সার্থকতা।

লেখক—শ্রীনরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ, বি, টি।

আজকাল প্রায় অনেকেরই মনে এই সন্দেহের উদয় হইতে দেখা যায় যে "অন্যান্য দেবদেবীর ন্যায় সরস্বতী দেবীও সাম্প্রদায়িক গণ্ডীর অন্তর্ভুক্ত কিনা?" কিন্তু আমাদের যেন মনে হয় যে এইরূপ ধারণা হওয়ার কোনও সঙ্গত কারণ নাই। কারণ সরস্বতী বিদ্যাধিষ্ঠাত্রী-দেবী। যে বয়সে লোকে সরস্বতীর পূজা করিয়া থাকে সে বয়সে সাম্প্রদায়িক মতভেদ হৃদয়ে স্থান পায় না। মন তখন (বাল্যকালে) এতই সরল ও কোমল থাকে যে ভেদজ্ঞানের সৃষ্টি না করিয়া দিলে উহা কখনই স্বতঃ মনে উদিত হইতে পারে না। এতদ্ব্যতীত, সরস্বতীর উপাসনা বিদ্যার উপাসনা ব্যতীত আর কিছুই নহে। যে শক্তির সাহায্যে বাহ্য ও অন্তর্জ্জগতের নিখিল বস্তু সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান হয়, সেই শক্তিই দেবী সরস্বতী। এই ঐশী শক্তির আরাধনা বা সাহায্য ব্যতীত জ্ঞানার্জ্জন অসম্ভব। কাজেই এই শক্তির উপাসনা (যিনি যে সম্প্রদায়ভুক্তই হউন না কেন) সকলকেই করিতে হয়। তবে স্বীকার করুন বা নাই করুন। আপাততঃ শ্রুতিকটু ও যুক্তিবিরুদ্ধ বোধ হইলেও, ইহাতে হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টান প্রভৃতি সকলেই সমান অধিকারী! জ্ঞানতঃ বা অজ্ঞানতঃ সকলেই এই শক্তির উপাসনা করেন ও করিতে বাধ্য (নাম যাহাই দেন না কেন), নচেৎ জ্ঞানলাভ ও বিদ্যার্জ্জন অসম্ভব। কেন, তাহা সরস্বতী-মূর্ত্তির ব্যাখ্যা পাঠ করিলেই বুঝা যাইবে।

শ্রীশ্রীসরস্বতীর ধ্যান।

"তরুণ-শকলমিন্দোর্বিভ্রতী শুভ্রকান্তিঃ
কুচভর-নমিতাঙ্গী সন্নিষণ্ণা সিতাব্জে।
নিজ কর-কমলোদ্যল্লেখনী পুস্তক-শ্রীঃ
সকল বিভবসিদ্ধ্যৈ পাতু বাগ্‌দেবতা নঃ।"

যিনি চন্দ্রের তরুণ (নূতন) শকল (কলা) ললাটে ধারণ করিয়াছেন, যিনি শুভ্রকান্তি, কুচভরনমিতাঙ্গী ও শ্বেত-পদ্মাসনা, যিনি নিজ কমল-হস্তে লেখনী পুস্তক ও বীণা ধারণ করিয়া আছেন, সেই বাগ্‌দেবতা সকল বিভব (ঐশ্বর্য্য) সিদ্ধির অনুকূল হইয়া আমাদের রক্ষা করুন।

অমাবস্যার গাঢ় অন্ধকারের পরই প্রথম চন্দ্রকলা উদয়কালে যেরূপ তমোরাশি বিদূরিত করিয়া সান্ধ্যগগন আলোকিত করে, সেইরূপ প্রথম জ্ঞান ও বিদ্যার সঞ্চার সংসারানভিজ্ঞতা-রূপ অন্ধকার বিনাশ করিয়া জীবনের প্রথম অংশকে আনন্দময় করিয়া তুলে। সান্ধ্যগগনে নবোদিত শশিকলা যেরূপ ঈষদ্দৃষ্ট সম্পূর্ণ চন্দ্রমণ্ডলের নিম্নে অসম্পূর্ণতার আভাস মাত্র দিয়া আপনাকে আংশিক প্রকাশ করে, সেইরূপ অনন্ত জ্ঞানের আধারস্বরূপা দেবী সরস্বতীও বিজ্ঞান ও আত্মজ্ঞানকে লোকলোচনের অন্তরালে প্রচ্ছন্ন রাখিয়া তদাভাস-স্বরূপ পার্থিব-জ্ঞানের কলামাত্র জগৎসমক্ষে ধারণ করিয়া বিরাজিতা আছেন। নবোদিত শশিকলা যেমন উজ্জ্বল হইলেও স্বীয় অসম্পূর্ণতা ও ক্ষুদ্রত্ব নিবন্ধন ম্লান ও নিষ্প্রভ বলিয়া প্রতীয়মান হয়, সেইরূপ অসীম ও অনন্ত জ্ঞানের তুলনায় আমাদের এই সংসারলব্ধ সসীম জ্ঞানও ম্লান ও অকিঞ্চিৎকর বলিয়া মনে হয়। বিরাট অনন্তজ্ঞানের নিকট আমাদের এই কণা (কলা) মাত্র জ্ঞান সর্ব্বাংশে নিতান্ত হীন হইলেও কদাচ তুচ্ছ নহে। এই অসম্পূর্ণ জ্ঞান ব্যতীত সম্পূর্ণ জ্ঞান লাভ হয় না। সসীমের সাহায্য ব্যতীত অসীমকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। এই সংসারে জীবনব্যাপী চেষ্টা করিয়াও আমরা জ্ঞানের কণামাত্র লাভে সমর্থ হই মাত্র। তাই জ্ঞান-ও-বিদ্যাদায়িনী দেবী সরস্বতী 'তরুণশকলমিন্দোর্বিভ্রতী' বা নবোদিত (জ্ঞান) শশিকলা-ধারিণী। আ মরি, এই সামান্য কথার মধ্যে কি গভীর ভাবই প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। আরও হয়ত কত আছে যাহা আমাদের এই সামান্য বুদ্ধির অতীত বা অগোচর।

এখন দেখা যাউক, সরস্বতী-মূর্ত্তির কল্পনায় আর কি কি বিশেষত্ব আছে। প্রথমতঃ, সরস্বতীর বর্ণ অমলধবল (শ্বেত)। শ্বেতবর্ণ সাত্ত্বিকভাব প্রকাশ করিতে উপযোগী। জ্ঞানদায়িনী দেবী সরস্বতীর বর্ণ শ্বেত না হইয়া অপর কোনও বর্ণ হইলে উহার সার্থকতা থাকিত না। কারণ, সাত্ত্বিকভাব রাজসিক

ও তামসিক প্রকৃতিসুলভ চাঞ্চল্যবর্জ্জিত। চাঞ্চল্যহীন, বিকার-রহিত ও একাগ্র না হইলে প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান, এমন কি কোনও জ্ঞানই সম্ভব হয় না। বিকার-গ্রস্ত চঞ্চল মনের সাধনাসম্ভূত ফল বা জ্ঞান, সাত্ত্বিক জ্ঞানের ন্যায় জগতের উপকারে না আসিয়া অনিষ্টেরই কারণ হইয়া থাকে। [উদাহরণ-স্বরূপ পাশ্চাত্য জগতের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারাদির উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই সকল আবিষ্কার সুবিধাজনক হইলেও মানবকে অলস ও স্বার্থপর করিয়া তুলিয়াছে।] অতএব যে জ্ঞান সৃষ্টি বিপর্য্যয়ের কারণ ও মনকে চঞ্চল ও বিকারগ্রস্ত করে তাহাকে প্রকৃত জ্ঞান বলা যায় না। জ্ঞান অর্থে তত্ত্বজ্ঞানই বুঝায়। এই জন্য প্রকৃতজ্ঞান সাত্ত্বিকভাব ব্যতীত হইতে পারে না। কাজে কাজেই জ্ঞানাধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতীর বর্ণ অনিন্দ্য শ্বেত। তাঁহার সমস্তই শ্বেত। দ্বিতীয়তঃ তাঁহার আসন শ্বেতপদ্ম। অনন্তজ্ঞানের অফুরন্ত ভাণ্ডার মস্তকস্থিত সহস্রদলপদ্ম বা মস্তিষ্কই সেই আসনরূপী শ্বেতপদ্ম। (তৃতীয়তঃ) তাঁহার বাহন হংস। হংস অর্থে শ্বাস প্রশ্বাস। এই শ্বাস প্রশ্বাস সংযত করিতে পারিলেই প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয়। নিশ্বাস বহিতে থাকিলে মন চঞ্চল থাকে, আর (কুম্ভক দ্বারা) সংযত হইলে মন ক্রমশঃ স্থির হয়। ইহা বোধ হয় বিদ্যারাধনারত ব্যক্তিমাত্রেই জানেন। নিবিষ্ট মনে কোনও বিষয়ে চিন্তা করিতে গেলে শ্বাস স্বতঃই আংশিক রুদ্ধ হয়, ফলে মানব চিন্তা-ভঙ্গে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। তাই শ্বাসের সংযম, কমলবনবিহারী হংসের পৃষ্ঠে পাদ-রক্ষা দ্বারা জ্ঞাপিত হইয়াছে অর্থাৎ বিদ্যার্থীর সংযত ও একাগ্র হওয়া আবশ্যক।

চতুর্থতঃ দেবীর হস্তে বীণা ও পুস্তক। আমরা সাধারণতঃ পুস্তক-পাঠ ও দর্শন-স্পর্শনাদি কার্য্য দ্বারা জ্ঞান লাভ করি। যে ভাবেই জ্ঞানার্জ্জনের চেষ্টা হউক না কেন, তাহাতে কম্পিত স্নায়ুমণ্ডলীর সাহায্য অপরিহার্য্য। কারণ, আমাদের জ্ঞান সাধারণতঃ পঞ্চেন্দ্রিয়ের সাহায্যেই ঘটিয়া থাকে। দর্শন, স্পর্শন, শ্রবণ, আস্বাদন ও ঘ্রাণ এই পাঁচটি ক্রিয়ার সাহায্যে অনুভব-শক্তি দ্বারা যাবতীয় বস্তুর সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান ও ধারণা জন্মিয়া থাকে। বিজ্ঞান স্পষ্টই বলিতেছে যে ঐ কয়টি কার্য্যে জ্ঞানের সঞ্চার, কম্পনের সাহায্যেই হইয়া থাকে। এবং সেই কম্পন ধারণ ও বহন জন্য জীবদেহে প্রত্যেক ইন্দ্রিয়েরই এক একটি বিশেষ যন্ত্র আছে। যেমন, দৃষ্ট বস্তুর কম্পন-ধারণ জন্য চক্ষু, শ্রুত শব্দের কম্পন-ধারণ জন্য কর্ণ ইত্যাদি। কোনও ইন্দ্রিয় দ্বারা কোনও বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিতে হইলে, শরীরস্থ সেই ইন্দ্রিয়ের বিশেষ যন্ত্র বাহ্য বায়ুমণ্ডলাগত কম্পন জন্য কম্পিত হয়। ফলে বীণার সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম তন্ত্রীরূপী দেহস্থ স্নায়ুরাজি কম্পিত হইয়া সেই বহির্জ্জগৎস্থ কম্পন মস্তিষ্কে বহন করিয়া থাকে। সেই কম্পন মস্তিষ্কে নীত হইলে, অনন্ত কৌশলময় বিশ্বশিল্পীর কৌশলে, সেই কম্পন-জনিত অনুভূতির ফলে, বস্তু সম্বন্ধীয় জ্ঞানের

উদয় হয়। ইহাই বুঝাইবার জন্য দেবীর একহস্তে পুস্তক ও অন্য হস্তে কম্পিত-সূক্ষ্মতন্ত্রীবহুলা ঝঙ্কারশীলা বীণা! অন্যান্য সমস্ত প্রচলিত বাদ্যযন্ত্র অপেক্ষা বীণার ঝঙ্কার বা কম্পন পরিমাণে অধিক এবং বীণার সূক্ষ্ম তন্ত্রীরাজি দেহস্থিত সূক্ষ্ম স্নায়ুমণ্ডলীর অনুরূপ। তাই বিদ্যাদায়িনী দেবী সরস্বতী শ্বেতবর্ণা, সহস্রদল-কমলবাসিনী, হংসারূঢ়া এবং 'বীণাপুস্তক-রঞ্জিতহস্তা'।

পঞ্চমতঃ দেবী 'কুচভরনমিতাঙ্গী' অর্থাৎ পূর্ণ-যৌবনা ও বিনয়াবনতা। যৌবন অহঙ্কার ও চাপল্যের কাল। এই কালে সকলেই (বিশেষতঃ স্ত্রীলোক) একটু গর্ব্বিতা হয়। তাহার সেই গর্ব্ব কথায়, ভাবভঙ্গিতে, আকারে ইঙ্গিতে প্রকাশ পায়। এই গর্ব্বের উদাহরণ স্বরূপ ৺দাশরথি রায় তাঁহার পাঁচালীর একস্থলে বলিয়াছেন, "যদি ঘোষের ঝির যৌবন থাকে, "ঘোল" "ঘোল" বলে ডাকে, (তিনি) ঘোল আজ্ঞা বই দেন না।" কিন্তু এ হেন যৌবনেও যে রমণী গর্ব্বিতা না হইয়া সলজ্জা ও বিনীতা থাকেন তিনিই প্রকৃত সুশীলা। পূর্ণ-যৌবনা রমণী অনিন্দ্যসুন্দরী হইয়াও যদি যৌবন-সম্পদে গর্ব্বিতা হন তাহা হইলে যেমন তাঁহার সৌন্দর্য্যের মহিমার লাঘব হয়, সেইরূপ বিদ্যাসম্পৎ-প্রাপ্ত ব্যক্তিও বিনয়ী না হইয়া গর্ব্বিত হইলে তাঁহার বিদ্যার গৌরব থাকে না। "বিদ্যা দদাতি বিনয়ম্।" শিক্ষিত ব্যক্তির যদি অকপট সরলতা, গাম্ভীর্য্য ও নম্রতা (বিনয়) না থাকে, তবে তিনি কখনই "প্রকৃত বিদ্বান্" পদবাচ্য নহেন। কেননা "অগাধজলসঞ্চারী বিকারী ন চ রোহিতঃ, গণ্ডূষ জলমাত্রেণ শফরী ফর্ফরায়তে।" অল্পশিক্ষিত ব্যক্তিরই অহঙ্কার জন্মে। প্রকৃত বিদ্বান ব্যক্তি কখনও অযথা চাপল্য প্রকাশ করেন না। বরং "বিটপিশ্রেণীর" ন্যায় 'ফলশালী' হইলেও "অহঙ্কারে উচ্চশির না করে কখন।"

আবার শিক্ষিত ব্যক্তি সর্ব্বদা নূতন নূতন বিষয়ে জ্ঞানলাভের জন্য আগ্রহান্বিত ও উদ্‌গ্রীব থাকেন। সম্মুখে ঈষৎ নতভাব এই আগ্রহ-সূচক। তাই জ্ঞান ও বিদ্যাদায়িনী দেবী নমিতাঙ্গী অর্থাৎ বিনয়াবনতা ও আগ্রহান্বিতা। অহঙ্কারের যথেষ্ট কারণ সত্বেও তিনি নিরহঙ্কারা। তাঁহার শান্ত সৌন্দর্য্য শশিকলার ন্যায় কোমল ও স্নিগ্ধলাবণ্যযুক্ত, সূর্য্যরশ্মির ন্যায় তীক্ষ্ণ ও উগ্র নহে। তাঁহার জ্ঞানৈশ্বর্য্য মোহিনীশক্তি আছে, মাদকতা নাই—গাম্ভীর্য্য আছে, চাঞ্চল্য নাই—তেজঃ আছে দাহ নাই, সমস্ত শক্তি তাঁহার বশে, তাই তিনি "সকল-বিভবসিদ্ধা।"

পূজার সময়টিও কেমন সুন্দর নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে দেখুন। প্রকৃতপক্ষে সরস্বতীর আরাধনা বা বিদ্যাচর্চ্চার কোনও নির্দ্দিষ্ট সময় হইতে পারে না। যে, যে বয়সে তাহার উপযুক্ত হয়, সেই বয়সই তাহার পক্ষে বিদ্যার্জ্জনের প্রশস্ত সময়। সুকুমার-মতি শিশু হইতে মুমূর্ষু বৃদ্ধ পর্য্যন্ত ইহাতে সমান অধিকারী। কারণ—

"অনন্ত শাস্ত্রং বহু বেদিতব্যং
স্বল্পশ্চ কালো বহবশ্চ বিঘ্নাঃ।"

কাজেই যখনই সুযোগ পাইবে তখনই বিদ্যা ও জ্ঞান অর্জ্জন করিবে। ইহাই শাস্ত্রের ব্যবস্থা। তথাপি সাধারণের সুবিধার জন্য বাল্যকালই বিদ্যার্জ্জনের প্রশস্ত সময় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কারণ, শৈশবে উৎসাহ, সাহস ও ভরসা বেশী থাকে, হৃদয় আশায় পূর্ণ এবং মন কোমল ও সরল থাকে। যাহা একবার শিক্ষা করা যায়, আজীবন তাহা হৃদয়ে অঙ্কিত রহিয়া যায়। তাই বৎসরের যে সময় শিশুর আনন্দময় সরল মনের অনুরূপ, সেই মধুর বসন্তই সরস্বতী পূজার উপযুক্ত কাল। যে সময়ে শীতের দারুণ অন্তঃসঙ্কোচের পরে মধুর বসন্তের প্রারম্ভে কোকিল কুহরাহুত মধুপ ঝঙ্কার ও মলয় হিল্লোলের মধ্যে প্রকৃতি বহির্ম্মুখী হইয়া নব-পত্র-পুষ্পাদিতে বিকাশ পাইতে আরম্ভ করে, যে সময়ে বিমল গগন-তলে সমুজ্জ্বল প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের মধ্যে কুসুম-গন্ধবাহী মলয়ানিল সুখস্পর্শে দেহ মন আকুল ও প্রফুল্ল করিয়া তোলে, যে সময়ে মন স্বতঃই প্রফুল্ল থাকে, সেই মনোরম সময়ে শ্রীপঞ্চমী দিনে বসন্তের নবীন উপহার স্বরূপ আম্রমুকুল ও ফলপুষ্পাদি দ্বারা ৺সরস্বতীর অর্চ্চনার ব্যবস্থা কি অসঙ্গত হইয়াছে? এমন সুন্দররূপে ও সরলভাবে এই দুর্ব্বোধ্য বিষয় বুদ্ধির সীমার মধ্যে আনয়ন করা সূক্ষ্মদর্শী আর্য্যঋষিগণ ব্যতীত অপরের সাধ্য হইত কিনা সন্দেহ।

অনেকে মনে করেন এরূপভাবে মূর্ত্তির কল্পনা করিয়া বিদ্যাদায়িনী শক্তির পূজা পৌত্তলিকতা মাত্র। মূর্ত্তি পূজা করে না কে? মূর্ত্তির কল্পনা ও আরাধনা সকলেই করেন ও করিবেনও। ইহার হস্ত হইতে পরিত্রাণের উপায় নাই। সাকারবাদীর ত নাই, নিরাকারবাদীরও নাই।

নিরীহ সংসার-জ্ঞানহীন সরল শিশু তাহার পিতামাতার বা প্রিয় ক্রীড়নকের মূর্ত্তি চিন্তা করিয়া তৃপ্তিলাভ করে, যুবক-যুবতী প্রিয়তম ব্যক্তির মূর্ত্তি মানসপটে অঙ্কিত করিয়া সুখ অনুভব করে, আর বয়স্ক ব্যক্তি তাহার ইষ্ট বিষয়ের (পুত্র, পৌত্র, পুত্রবধূ, হর্ম্ম্যাদির) কল্পিত মূর্ত্তির ধ্যানে আত্মপ্রসাদ লাভ করে। কার্য্যতঃ সমস্ত জীবই মূর্ত্তির কল্পনা ও মানস পূজা করিয়া থাকে। তবে প্রচলিত প্রথানুসারে মৃন্ময়ী মূর্ত্তি গঠন ও স্থাপন করিয়া পূজায় কাহারও কাহারও আপত্তি থাকিতে পারে। কিন্তু প্রতিমা-পূজাও শাস্ত্রবিরুদ্ধ নয়। শাস্ত্রে দেখা যায় যে প্রকৃতি ও রুচিগত পার্থক্য নিবন্ধন সকলেই একইরূপ উপাসনার পাত্র ও অধিকারী হয় না বা হইতেও পারে না। কারণ "ভিন্ন রুচির্হি লোকঃ।" দ্বিতীয়তঃ মানসিক অবস্থা ও ধারণাশক্তি অনুসারে উপাসনার প্রণালী ও অধিকারী নির্ণীত হয়। একই দেবতার বা একই প্রকারের পূজার অধিকারী সকলে হইতে পারে না। তাই বহুদর্শী ঋষিগণ লিখিয়াছেন—

"অগ্নির্দেবো দ্বিজাতীনাং, মুনীনাং হৃদিদৈবতম্।
প্রতিমা স্বল্পবুদ্ধীনাং, সর্ব্বত্র সমদর্শিনাম্॥"

স্বল্পবুদ্ধি ও বাসনাময় জীবের প্রতিমা-উপাসনাই একমাত্র সঙ্গত ব্যবস্থা, কারণ তাহাদের মন চঞ্চল। প্রতিমা-পূজার অন্য যতই দোষ থাঁকুক না কেন, নিম্নলিখিত কয়টি কারণে ইহা জনসমাজে প্রচলিত ও বিশেষভাবে আদৃত হইয়াছে।

(১) ইহাতে ইস্টবস্তু চিন্তার সাহায্য করে।

(২) অপর কিছু হউক বা না হউক, মনে একটু তৃপ্তি আনয়ন করে। (এই তৃপ্তির অভাবেই নিরাকারবাদীরা কার্য্যতঃ নাস্তিক হইয়া পড়েন)

(৩) নয়ন-সম্মুখে আদর্শ স্থাপিত থাকায় একাগ্রতার বা মন স্থিরীকরণে বিশেষ সাহায্য করে।

(৪) "সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা" অর্থাৎ সাধকের সাধন-সুবিধার জন্যই দেবতার রূপ কল্পনা করা হয়। কারণ, মানব নিজের সসীম বুদ্ধিতে অসীম ও অনন্তরূপ ব্রহ্মের ধারণা করিতে পারে না। যেমন পৃথিবী অপেক্ষা বহুলক্ষ গুণ বৃহত্তর সূর্য্যমণ্ডলকেও আতসী কাচের (magnifying glassএর) সাহায্যে (শক্তির খর্ব্বতা না করিয়াও) স্বল্পায়তনে কেন্দ্রীভূত করা যায়, সেইরূপ অসীম ব্রহ্মকে সসীম মূর্ত্তিতে কল্পনা করিয়া উপাসনার পথ সুগম করা হয় মাত্র।

অতএব এই বিশ্বময়ী সরস্বতী শক্তির সাধকগণের সহিত সমস্বরে গাহিতে বাসনা হয়,—

"হিম-চন্দন-কুন্দেন্দু-কুমুদাম্ভোজ-সন্নিভা।
বর্ণাধিদেবী যা তস্যৈ চাক্ষরায়ৈ নমো নমঃ॥
যয়া বিনা জগৎ সর্ব্বং শশ্বজ্জীবন্মৃতং ভবেৎ।
জ্ঞানাধিদেবী যা তস্যৈ সরস্বত্যৈ নমো নমঃ॥
যয়া বিনা জগৎ সর্ব্বং মূকমুন্মত্তবৎ সদা।
বাগধিষ্ঠাত্রী যা দেবী তস্যৈ বাণ্যৈ নমো নমঃ॥
স্মৃতিশক্তি-জ্ঞানশক্তি-বুদ্ধিশক্তি-স্বরূপিণী।
প্রতিভা-কল্পনাশক্তি র্যা চ তস্যৈ নমো নমঃ॥
জ্ঞানং দেহি স্মৃতিং দেহি বিদ্যাং বিদ্যাধিদেবতে।
প্রতিষ্ঠাং কবিতাং দেহি বিচার-ক্ষমতাং শুভাম্॥"

ব্রহ্মই মানব-জীবনের লক্ষ্য।*

লেখক—সম্পাদক।

ওঁ আপ্যায়ন্তু মমাঙ্গানি বাক্‌প্রাণশ্চক্ষুঃশ্রোত্রমথোবলমিন্দ্রিয়াণি চ সর্ব্বাণি, সর্ব্বং ব্রহ্মৌপনিষদং. মাহং ব্রহ্ম নিরাকুর্য্যাং, মা মা ব্রহ্ম নিরাকরোদনিরাকরণমস্তু অনিরাকরণং মেহস্তু, তদাত্মনি নিরতে য উপনিষৎস্ন ধর্ম্মাস্তে ময়ি সন্তু তে ময়ি সন্তু; ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

আমার অঙ্গসমূহ, এবং আমার বাক্, প্রাণ, চক্ষু, শ্রোত্র, বল ও ইন্দ্রিয়সকল পরিতৃপ্ত হউক। বিশ্বস্থ সমস্তই উপনিষৎপ্রতিপাদ্য ব্রহ্ম। আমি যেন ব্রহ্মকে পরিত্যাগ না করি, ব্রহ্ম যেন আমাকে পরিত্যাগ না করেন, ব্রহ্মের সহিত যেন আমার নিত্য সম্বন্ধ বিদ্যমান থাকে। ব্রহ্মনিরত আমাতে যেন উপনিষদুক্ত ধর্ম্মসমূহ প্রতিষ্ঠিত থাকে। শান্তি শান্তি শান্তি।

মহর্ষির এই সার্ব্বজনীন প্রার্থনায় কোনও সাম্প্রদায়িকতা নাই। দেশ-জাতি-বর্ণ-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে সকলের পক্ষেই এই প্রার্থনা উপযোগিনী। হিন্দু, খৃষ্টান্, মুসলমান্ প্রভৃতি সকলেই ভগবৎসমীপে এই প্রার্থনা উপস্থিত করিতে পারেন।

ঋষির প্রথম প্রার্থনা এই যে—"আমার অঙ্গসমূহ পরিতৃপ্ত হউক।" আপাতদৃষ্টিতে এই প্রার্থনা অত্যন্ত স্বার্থবিজড়িত বলিয়া প্রতীত হইতে পারে, কিন্তু ধীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলে সকলেই বুঝিতে পারিবেন যে, আমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি অসম্পূর্ণ বা অপরিতৃপ্ত থাকিলে, আমার দ্বারা আমার বা আমার পরিবারস্থ জনগণের কিংবা আমার সমাজের অথবা জগতের কোনও উপকারই হইতে পারে না। স্বয়মসিদ্ধঃ কথং পরান্ সাধয়েৎ? অতএব সর্ব্বপ্রথমে আমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উন্নতিসাধন আবশ্যক। আমাদের একাদশটী ইন্দ্রিয়। উহারা সকলেই শরীরান্তর্গত। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং একটী অন্তরিন্দ্রিয়—যাহার নাম মন, ইহারাই আমাদের সর্ব্বস্ব। আমরা

* বঙ্গীয় বৈশ্য-বারুজীবিসভার দ্বাবিংশ অধিবেশনে সভাপতির বক্তৃতা

জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা মনের সাহায্যে বাহ্য বিষয়ের জ্ঞান লাভ করি; আবার ঐ মনের সাহায্যেই পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারা আমরা যাবতীয় কার্য্য সম্পাদন করি। ঐ সকল ইন্দ্রিয় যদি সুস্থ ও সবল না থাকে, তবে আমরা জগতের কোনও মহৎ কার্য্যই করিতে পারি না। কার্য্য করিতে গেলেই সম্মুখে একটী আদর্শ আবশ্যক। আমাদের সে আদর্শ কি? মহর্ষি বলেন—সেই আদর্শ 'ব্রহ্ম'। মহর্ষি বলেন—সেই ব্রহ্ম "শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসোমনঃ যদ্ বাচোহ বাচঃ প্রাণস্য প্রাণশ্চক্ষুষশ্চক্ষুঃ"—তিনি কর্ণের কর্ণ মনের মন, বাকের বাক্, প্রাণের প্রাণ ও চক্ষুর চক্ষু—অর্থাৎ কর্ণ, মন, বাক্, প্রাণ ও চক্ষু যাঁহার শক্তি দ্বারাই শ্রবণ, মনন, বচন, প্রাণন ও দর্শন-ক্রিয়া করে, তিনিই ব্রহ্ম। সেই ব্রহ্ম-রূপ আদর্শ কোথায় পাইব? মহর্ষি বলেন—উপনিষদে। সর্ব্বং ব্রহ্মৌপনিষদম্। 'ব্রহ্মরূপ আদর্শ সম্মুখে রাখিয়াই যেন আমরা সর্ব্ববিধ কর্ত্তব্য কার্য্য করিতে পারি'—ইহাই হইল ঋষির প্রাণের প্রার্থনা। আমার মন ও ইন্দ্রিয়াদি সুস্থ থাকিবে ইহা আমার স্বার্থসিদ্ধির জন্য নহে, বিশ্বের মঙ্গলের জন্য। ব্রহ্ম যেমন জগতের রক্ষক, আমিও যেন সেইরূপ নিজের মন ও ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা জগতের রক্ষাকার্য্যে ব্রতী হইতে পারি—ইহাই ঋষির মনোগত প্রার্থনা। এই তত্ত্ব-কথাই গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন—যথা:—

এবং প্রবর্ত্তিতং চক্রং নানুবর্ত্তয়তীহ যঃ।
অঘায়ুরিন্দ্রিয়ারামো মোঘং পার্থ স জীবতি॥

অর্থাৎ হে পার্থ, যে ব্যক্তি মৎ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত এই সংসারচক্রের অনুবর্ত্তন না করে, সে ব্যক্তির জীবন পাপময়, সে কেবল ইন্দ্রিয়সুখেই নিরত থাকে, সুতরাং তাহার জীবন-ধারণই বৃথা। ভগবান্ এই সংসারচক্র ঘুরাইয়া দিয়াছেন, এবং মানবগণকে আদেশ করিয়াছেন যে, তাহারাও যেন ঐ ঘূর্ণন-ক্রিয়ার সাহায্য করে। এইখানেই মনুষ্যের বিশেষত্ব প্রকট। পশ্বাদির সহিত মানুষের প্রভেদ এই যে, মানুষের যে মনন-শক্তি আছে, পশ্বাদির তাহা নাই। মানুষের ইচ্ছাশক্তি আছে; সেই ইচ্ছাশক্তি দ্বারাই তাহার কার্য্যকলাপ নিয়ন্ত্রিত হয়। পশ্বাদির সে শক্তি নাই; প্রকৃতি-নিরূপিত গণ্ডীর বাহিরে যাইবার শক্তি তাহাদের নাই। ভগবান্ মানুষকেই স্বাধীন করিয়াছেন, পশ্বাদিকে করেন নাই। যে যত স্বাধীন, তাহার দায়িত্ব তত অধিক; সুতরাং এই জগতের পালনার্থেও মনুষ্যের যে একটী দায়িত্ব রহিয়াছে. গীতায় তাহাই সুব্যক্ত হইয়াছে। এই কথাই (ঈশোপনিষদে) মহর্ষি স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন যথা—"মানুষ তাহার

ইহজগতের কর্ম্ম করিয়া শতবর্ষ জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করিবে। তাহার প্রতি এই আদেশ, কিন্তু সে যেন সাবধান থাকে, যেন কর্ম্মে লিপ্ত না হয়—অর্থাৎ তাহার কর্ম্ম যেন কেবল স্বার্থাভিমুখী না হয়।"

কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ

এবং ত্বয়ি নান্যথেতোঽস্তি ন কর্ম্ম লিপ্যতে নরে।

গীতায় শ্রীভগবদ্‌বাক্যেও, ঐ ঋষিবাক্যেরই প্রতিধ্বনি রহিয়াছে। শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন,

মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণি।

"হে অর্জ্জুন। কর্ম্মেই তোমার অধিকার আছে, কর্ম্মফলে তোমার অধিকার নাই। ফলাকাঙ্ক্ষায়—অর্থাৎ নিজের স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে কোনও কার্য্য করিও না। আর কার্য্য না করিয়াও কাল কর্ত্তন করিও না।" ইহা সম্পূর্ণ সত্য যে, জগতে সকলকেই কার্য্য করিতেই হইবে; কেহ কখনও সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় হইতে পারিবেন না। নহি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ। কার্য্য করিতেই হইবে, কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে ব্রহ্মকে সর্ব্বদা আদর্শ রাখিতে হইবে। ইংরেজীভাষায় সহজে বলিতে গেলে Heart within and God over head. ইহাই সকলের জীবনের মূলমন্ত্র হওয়া উচিত। এই জন্যই প্রাগুক্ত ঔপনিষদী প্রার্থনায় বলা হইতেছে আমি যেন ব্রহ্মকে পরিত্যাগ না করি এবং ব্রহ্ম যেন আমাকে পরিত্যাগ না করেন, আমাদের উভয়ের মধ্যে সতত যেন নিত্য সম্বন্ধ বিদ্যমান থাকে—অর্থাৎ আমরা যেন সর্ব্বদা 'ব্রহ্মচারী' থাকিতে পারি। ব্রহ্মণি চরতি ইতি ব্রহ্মচারী অর্থাৎ যাহার সমস্ত আচরণে ব্রহ্মই লক্ষ্যস্থানীয় হন, তিনিই প্রকৃত ব্রহ্মচারী; তিনি যে বর্ণের বা যে আশ্রমস্থই হউন ক্ষতি নাই। ইংরেজীতে ঐ ভাব প্রকাশ করিতে গেলে বলা যায়—To live, move and have our being in God.

আমরা যে যাহাই করি, ভগবানকে সম্মুখে রাখিয়াই তাহা করা কর্ত্তব্য—ইহাই ঋষির আদেশ এবং সর্ব্বদেশের সকল শাস্ত্রের উপদেশ। পরে ঋষি বলিতেছেন—যে "উপনিষদুক্ত ধর্ম্মসমূহ যেন সতত ব্রহ্মরত আমাতে প্রতিষ্ঠিত থাকে।" এই উপনিষদুক্ত ধর্ম্ম কি, তাহা উপনিষদেই বিশদভাবে বিবৃত হইয়াছে। এস্থলে তাহার বিশদ-বিবৃতির সময় ও সুযোগ নাই। অন্য বহুস্থলেই উহার বিবৃতি করা হইয়াছে। সংক্ষেপে বলিতে গেলে ইহাই বলা যায় যে, সত্য, (কায়িক

বাচিক ও মানসিক,) অস্তেয়—অর্থাৎ পর-দ্রব্যের অগ্রহণ, সংযম—পরদারের অনভিমর্ষণ, অহিংসা, আস্তিক্য বা ঈশ্বরবিশ্বাস ইত্যাদিই উপনিষদুক্ত ধর্ম্ম। এই সকল ধর্ম্ম সর্ব্বাবস্থায় সকলেরই সেব্য। আমরা বাল্যকালে শিক্ষাপ্রাপ্ত করিয়া থাকি যে—মাতৃবৎপরদারেষু পরদ্রব্যেষু লোষ্টবৎ। আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যতি স পণ্ডিতঃ। ইহার মধ্যেই উপনিষদের সারাংশ নিবদ্ধ রহিয়াছে।

এই ঔপনিষদ ধর্ম্মের পরিচালনার জন্য চতুর্ব্বিধ আশ্রম-ধর্ম্ম এবং চতুর্ব্বিধ বর্ণ-ধর্ম্মের ব্যবস্থা। ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস—এই ৪ আশ্রমের এবং ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই ৪ বর্ণের সারতত্ত্ব মৎপ্রণীত 'আমিত্বের প্রসার' গ্রন্থের ১ম ও ২য় খণ্ডে বিশদরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। যাঁহারা ঐ বিষয় সুবিশদরূপে জানিতে চাহেন, তাঁহারা ঐ গ্রন্থ পাঠ করিবেন।

প্রথম আশ্রম ব্রহ্মচর্য্যের উদ্দেশ্য ব্রহ্মচারীর শরীর ও মনকে জগতের কার্য্যের জন্য প্রস্তুত করা। যখন তাঁহার মনের ও শরীরের পূর্ণতা সংঘটিত হয়, তখনই তাঁহার গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিবার বিধি। প্রথমটী ছাত্রজীবন, দ্বিতীয়টী গার্হস্থ্যজীবন (Student's life and citizen's life.)। তৃতীয় আশ্রম বানপ্রস্থে কোনও নির্জ্জন স্থানে থাকিয়া ঈশ্বর-চিন্তা ও ধর্ম্ম-শিক্ষা-প্রদান এবং চতুর্থ আশ্রমে কেবল ব্রহ্মচিন্তা। মহাকবি কালিদাস সংক্ষেপে বলিয়া গিয়াছেন—

শৈশবেঽভ্যস্তবিদ্যানাং যৌবনে বিষয়ৈষিণাম্
বার্দ্ধকে মুনিবৃত্তীনাং যোগেনান্তে তনুত্যজাম্।

বর্ণধর্ম্ম প্রত্যেক ব্যক্তির স্বীয় স্বীয় গুণ ও কর্ম্ম অনুসারে বিভক্ত হইয়াছে। ব্রাহ্মণ-স্বভাবে সত্ত্বগুণ প্রধান ও রজস্তমঃ অপ্রধান থাকিবে। ক্ষত্রিয়-প্রকৃতিতে রজই প্রধান ও সত্ত্বতমঃ অপ্রধান থাকিবে। বৈশ্যও রজঃ-প্রধান, কিন্তু ক্ষত্রিয় অপেক্ষা তাহার সাত্ত্বিকতা অল্প ও তামসিকতা অধিক। শূদ্র-স্বভাবে তমোগুণের প্রাবল্য ও সত্ত্ব-রজোগুণের অপ্রাধান্য থাকিবে। সত্ত্ব রজঃ তমঃ—এই ৩ গুণের তারতম্য বা অল্পাধিক্য বর্ণভেদের মূল কারণ। এই বর্ণভেদ কোনও না কোনও আকারে সর্ব্বদেশেই দৃষ্ট হয়। সত্ত্বগুণের বহির্ব্বিকাশ শ্বেত, (এ জন্য সাত্ত্বিক ব্যক্তিকে শ্বেতবর্ণ বলা যায়।) রজোগুণের বহির্ব্বিকাশ রক্ত-নীল-পীতাদি ও তমোগুণের বহির্ব্বিকাশ কৃষ্ণবর্ণ। মহাভারতে বলা হইয়াছে—

ন বিশেষোঽস্তি বর্ণানাং সর্ব্বং ব্রাহ্মমিদং জগৎ
ব্রহ্মণা পূর্ব্বসৃষ্টং হি কর্ম্মভির্ব্বর্ণতাং গতম্।

কামভোগপ্রিয়াস্তীক্ষ্ণাঃ ক্রোধনাঃ প্রিয়সাহসাঃ
ত্যক্তস্বধর্ম্মা রক্তাঙ্গাস্তে দ্বিজাঃ ক্ষত্রতাং গতাঃ।
গোভ্যোবৃত্তিং সমাস্থায় পীতাঃ কৃষ্যুপজীবিনঃ
স্বধর্ম্মান্ নানুতিষ্ঠন্তি তে দ্বিজা বৈশ্যতাং গতাঃ।
হিংসানৃতপ্রিয়া লুব্ধাঃ সর্ব্বকর্ম্মোপজীবিনঃ
কৃষ্ণাঃ শৌচপরিভ্রষ্টাস্তে দ্বিজাঃ শূদ্রতাং গতাঃ।
ইত্যেতৈঃ কর্ম্মাভির্ব্যস্তাঃ দ্বিজাঃ বর্ণান্তরং গতাঃ
ধর্ম্মোযজ্ঞক্রিয়া তেষাং নিত্যং ন প্রতিষিধ্যতে।

(শান্তিপর্ব্ব)

বর্ণসমূহের কোনও পার্থক্য নাই, সমস্ত জগৎ ব্রহ্মময়। ব্রহ্মা কর্ত্তৃক (সমভাবে) সৃষ্ট হইয়া পরে (কর্ম্ম দ্বারা) বিভিন্ন বর্ণ প্রাপ্ত হইয়াছে। কামভোগপ্রিয়, উগ্রস্বভাব, ক্রোধপরবশ, সাহসপ্রিয়, স্বধর্ম্মত্যাগী, রক্তাঙ্গ দ্বিজগণ ক্ষত্রিয়ত্ব লাভ করিয়াছিলেন। যে সকল পীতবর্ণ কৃষিজীবী দ্বিজ গবাদি পশুপালনবৃত্তি অবলম্বন করিয়া, স্বধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেন না, তাঁহারা বৈশ্যত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। হিংসা ও মিথ্যাপ্রিয়, লুব্ধ ও সর্ব্ববিধ-কর্ম্মজীবী—কৃষ্ণবর্ণ শৌচবিহীন দ্বিজগণ শূদ্রত্ব লাভ করিয়াছিলেন। এই সকল কর্ম্ম দ্বারা বিভক্ত দ্বিজগণ বর্ণান্তর প্রাপ্ত হন। ধর্ম্ম, যজ্ঞ-কার্য্য তাঁহাদের নিত্য, তাহা কাহারও পক্ষে নিষিদ্ধ নয়।

শ্রীমদ্‌ভাগবতেও ঐরূপ বলা হইয়াছে—

একএব পুরা বেদঃ প্রণবঃ সর্ব্ববাঙ্ময়ঃ,
দেবো নারায়ণোনান্য একোঽগ্নির্বর্ণ এবচ।

পূর্ব্বে একমাত্র বেদ, সর্ব্ববাক্যময় একমাত্র প্রণব, একমাত্র দেব নারায়ণ, এক অগ্নি ও একমাত্র বর্ণ ছিল।

শ্রীমদ্‌ভাগবতে ব্রাহ্মণাদিবর্ণের লক্ষণ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে—

শমোদমস্তপঃ শৌচং সন্তোষঃ ক্ষান্তিরার্জ্জবং
জ্ঞানং দয়াচ্যুতাত্মত্বং সত্যঞ্চ ব্রহ্মলক্ষণম্।
শৌর্য্যং বীর্য্যং ধৃতিস্তেজঃ ত্যাগশ্চাত্মজয়ঃ ক্ষমা,
ব্রহ্মণ্যতা প্রসাদশ্চ সত্যঞ্চ ক্ষত্রলক্ষণম্।
দেবগুর্ব্বচ্যুতে ভক্তিঃ ত্রিবর্ণপরিপোষণম্।
আস্তিক্যমুদ্যমোনিত্যং নৈপুণ্যং বৈশ্যলক্ষণম্।
শূদ্রস্য সন্নতিঃ শৌচং সেবা স্বামিন্যমায়য়া
অমন্ত্রযজ্ঞোহ্যস্তেয়ং সত্যং গোবিপ্ররক্ষণম্।

ইন্দ্রিয়সংযম, মনঃসংযম, তপস্যা, শৌচ, সন্তোষ, ক্ষমা, ঋজুতা, জ্ঞান, দয়া, ভগবৎপরতা ও সত্য—এগুলি ব্রাহ্মণের লক্ষণ। শৌর্য্য, বীর্য্য, ধৈর্য্য, তেজঃ, ত্যাগ, আত্মজয়, ক্ষমা, ব্রহ্মণ্যতা, প্রসাদ ও সত্য ক্ষত্রিয়ের লক্ষণ। দেবতা-গুরু ও-ভগবানে ভক্তি, ধর্ম্ম-অর্থ-ও কামের পরিপোষণ, আস্তিকতা, উদ্যম-শীলতা এবং নিপুণতা বৈশ্যের লক্ষণ। শূদ্রের লক্ষণ—বিনয়, শৌচ ও অকপট-ভাবে প্রভুর সেবা করা, মন্ত্রহীন যজ্ঞসম্পাদন, অস্তেয়, সত্য, গোব্রাহ্মণ রক্ষা প্রভৃতি। এই সকল লক্ষণই তত্তদ্বর্ণের পরিচায়ক। ঐ শ্রীমদ্ভাগবতেই আছে—

যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসোবর্ণাভিব্যঞ্জকং
যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তৎ তেনৈব বিনির্দ্দিশেৎ।

অর্থাৎ যে বর্ণের যে লক্ষণ কথিত হইল তাহা অন্যত্র দৃষ্ট হইলে তাহাকে তদ্ দ্বারা নির্দ্দেশ করিবে—তাৎপর্য্য এই যে যদি ব্রাহ্মণবংশজ ব্যক্তিতে ক্ষত্রিয়োচিত বৈশ্যোচিত কিংবা শূদ্রোচিত গুণ ও কর্ম্ম দৃষ্ট হয়, তবে সেই ব্রাহ্মণবংশজ লোককে ক্ষত্রিয় বৈশ্য বা শূদ্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিবে। আর যদি শূদ্রবংশজ বা বৈশ্যবংশজ কিংবা ক্ষত্রিয়বংশজ ব্যক্তিতে ব্রাহ্মণোচিত লক্ষণ বা গুণ ও কর্ম্ম দৃষ্ট হয়, তবে সেই শূদ্রবংশজ বা বৈশ্যবংশজ কিংবা ক্ষত্রিয়-বংশজ লোককেও ব্রাহ্মণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিবে ইত্যাদি।

বর্ত্তমানে আশ্রমধর্ম্মের ও বর্ণধর্ম্মের বহু বিপর্য্যয় সংঘটিত হইয়াছে। মুমুর্ষু হিন্দুসমাজের শরীরে নবজীবনের লক্ষণ আনয়ন করিতে ইচ্ছুক সমাজনেতৃগণের ঐ বিষয়ে মনোযোগদান একান্ত কর্ত্তব্য। নিপুণভাবে শাস্ত্রের আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, মহর্ষিরা অত্যন্ত উদারচেতা ছিলেন। এমন কি তাঁহারা চতুর্থ জাতি শূদ্রকেও জ্ঞানবিজ্ঞানে বঞ্চিত করেন নাই। যজুর্ব্বেদে ঋষি বলিতেছেন—

যথেমাং বাচং কল্যাণীং বদানি ব্রহ্মরাজন্যাভ্যাং
শূদ্রায়চার্য্যায় স্বায় চারণায়। অর্থাৎ –

'এ কল্যাণী বেদবাণী, উচ্চারিয়া বলি আমি, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়গণে, শূদ্র আর বৈশ্যজনে।

প্রাচীন বর্ণবিভাগ গুণকর্ম্মগত ছিল, কিন্তু এখন তাহা কেবল জন্মের উপরেই স্থাপিত রহিয়াছে। গুণকর্ম্মের সহিত উহার সম্বন্ধ তিরোহিত হইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। সমাজসংস্কারের বা সমাজোন্নয়নের দ্বিবিধ পন্থা আছে। একটি revolution বা বিপ্লব, অপরটি Evolution বা ক্রমবিকাশ। ক্রমবিকাশই

কল্যাণকর। ধীরে ধীরে স্বাস্থ্যকর ভাবে সংস্কার করাই বুদ্ধিমান্ দেশহিতৈষি-ব্যক্তিগণের কর্ত্তব্য সহসা আমূল-পরিবর্ত্তন-সাধনে অগ্রসর হইলে, বহুবিধ বিপৎপাতের আশঙ্কা আছে। আমাদের এই ক্ষুদ্রসমাজ দ্বিতীয় পন্থারই অনুসরণ করিয়াছেন। প্রথম হইতেই আমরা সকল জাতির সহিত সদ্ভাব রাখিয়া, ধীরে ধীরে স্বসমাজের উন্নতিকল্পে চেষ্টাবান্ হইয়াছি এবং তজ্জন্যই প্রথম হইতেই আমরা আমাদের কার্য্যে সকল জাতিরই সহানুভূতি লাভ করিয়া আসিতেছি

আমাদের ক্ষুদ্রসমাজ চতুর্ব্বর্ণের কোন্ বর্ণের অন্তর্ভুক্ত—ইহা লইয়া কিয়ৎকাল পূর্ব্বে বিতর্ক উপস্থিত হয়। ঢাকার খ্যাতনামা উকীল মহোদয় শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র ভাওয়াল বি-এল্ মহাশয় বারুজীবিজাতিকে 'ক্ষত্রিয়'-বর্ণান্তর্গত প্রতিপন্ন করিবার জন্য একখানি গ্রন্থ লিখিয়াছেন। ঐ গ্রন্থে তিনি বহু যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন। বারুজীবিজাতি পূর্ব্বে কোন্ বর্ণের অন্তর্ভুক্ত ছিল—তাহার নির্দ্ধারণ করিতে গেলে, তাহাদের বর্ত্তমান ব্যবসায়াদির দিকেও দৃষ্টিপাত করা আবশ্যক হয়। আর তৎসম্বন্ধে শাস্ত্রীয় প্রমাণের ও দেশের প্রাচীন কিম্বদন্তীর এবং চিরাচরিত আচারের প্রতিও লক্ষ্য করার প্রয়োজন হয়। এই সমস্ত বিষয়ের আলোচনা করিয়া সুপ্রসিদ্ধ সন্ন্যাসী শ্রীমৎ ধর্ম্মানন্দ মহা-ভারতী মহাশয় স্থির করিয়াছেন যে—'বারুজীবিজাতি বৈশ্যবর্ণান্তর্গত।' শ্রীমৎ ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী প্রণীত সিদ্ধান্ত-সমুদ্র ৩য় খণ্ড (যাহা যশোহর হিন্দু-পত্রিকা-কার্য্যালয়ে পাওয়া যায়) তাহা এবং ৺বাবু প্রসন্নগোপাল রায় বি-এল্ কর্ত্তৃক প্রকাশিত 'বঙ্গীয় বৈশ্য' নামক গ্রন্থ (হিন্দু-পত্রিকা-কার্য্যালয়ে পাওয়া যায়) পাঠ করিলে বারুজীবিজাতির প্রকৃত ইতিহাস জানিতে পারা যায়। জাতীয় ইতিহাস জানিবার জন্য অন্যান্য শিক্ষিত সমাজের ন্যায় শিক্ষিত বারুজীবি সমাজেরও আগ্রহান্বিত হওয়া উচিত। আশা করি, তাঁহারা প্রত্যেকে উক্ত গ্রন্থ দুইখানি পাঠ করিবেন।

বৌদ্ধযুগে বহু বারুজীবী বৌদ্ধধর্ম্ম অবলম্বন করেন। "ধর্ম্ম" নামে বুদ্ধই হিন্দু-দিগের দ্বারাও পূজিত হইতেন। 'ধর্ম্মমঙ্গল' গ্রন্থে দেখা যায়—ধর্ম্মের দ্বাদশ জন সেবক ছিলেন, যথা—ভোজ, মথুর, মহামুদ, চন্দ্রচন্দ্র, মহীপাল, লাউসেন, কাশ্যপনন্দন ও শিবদত্ত প্রভৃতি। পশ্চিমবঙ্গ রাঢ়দেশে শিবদত্তের নিবাস ছিল, তিনি বারুজীবিজাতীয় ছিলেন।

ধর্ম্মমঙ্গলে আছে—

মহাভক্ত সেবক ছিল বারুই শিবদত্ত
ধর্ম্মপূজা করিল সে অতি সুমহত্ব।

ঐ স্থানে উৎসপুর গ্রামে আর একজন বারুজীবী ধর্ম্মসেবক ছিলেন—ধর্ম্মমঙ্গলে আছে—

উৎসপুরে সুখদত্ত বারুই-নন্দন
করিছে ধর্ম্মের পূজা মজাইয়া মন।
গাজন লইয়া এল ময়না মণ্ডলে
শিরে ধর্ম্ম-পাদুকা সোণার চতুর্দ্দোলে।

প্রাচীন কবি রমাই পণ্ডিতের গ্রন্থে যে একজন ধর্ম্মভক্ত বারুজীবীর উল্লেখ পাওয়া যায়—তাঁহার নাম শ্রীকুমার দাস। এই শ্রীকুমার দাস বৈশ্য-পর্য্যায়ে উল্লিখিত হইয়াছেন। রমাই পণ্ডিত লিখিয়াছেন—

প্রথমে বন্দনা করি বিপ্র-পদতল,
তার পর সম্ভাষণ ক্ষত্রিয়ের দল।
তারপর আশীর্ব্বাদ শ্রীকুমার দাস,
যার স্বর্ণদীপে জ্বলে আলো বার মাস।
ধর্ম্মের পূজায় যেই ঐকান্তিক ভক্ত
ধর্ম্মেরে সন্তোষে যেত বুকের কাটি রক্ত।
বারুইকুলে জন্ম তার পূর্ব্বজন্মে যোগী—
বৈশ্যধর্ম্ম-পালনেতে অতি সুখ-ভোগী।
দশদিক্ মানে যারে, মানে বিপ্রগণ
ধর্ম্মের প্রসাদে নাহি যমের তাড়ন।

এখানে স্পষ্ট বলা হইল যে ভক্তাধিকভক্ত ধর্ম্মসেবক বারুজীবী শ্রীকুমার দাস বৈশ্যধর্ম্ম পালন করেন। প্রাচীন কবি রমাই পণ্ডিত ইঁহাকে নিশ্চিতরূপেই বৈশ্যজাতীয় বলিয়া স্থির করিয়াছেন। বৈশ্য-বন্দনা-স্থলে তিনি শ্রীকুমারেরই উল্লেখ করিয়াছেন।

প্রাচীন আর্য্যদেবতা উষা বা Aurora এখনও বারুজীবীদিগের কুলদেবতা-রূপে অর্চ্চিতা হইয়া থাকেন। Doctor Wise তাঁহার গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

"Along the banks of the Lakshya in Eastern Bengal, the Baruis celebrate without a Brahmin the Navamipuja in honour of Ushas Eos, Aurora in the month of the waxing moon in Ashwin."

পূর্ব্ববঙ্গে আশ্বিনমাসের শুক্লপক্ষীয় নবমীতে বারুইগণ লক্ষ্যানদীর তীরে ব্রাহ্মণের সাহায্য ব্যতীত উষাদেবীর পূজা করেন।

আর্য্যাচারের এই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বারুজীবিজাতির মধ্যে পুরাকাল হইতে বিদ্যমান আছে। উষা বৈদিক প্রধান দেবতা। উষাদেবীর পূজা বারুইজাতির মধ্যেই এখনও বহুস্থানে বিদ্যমান। প্রাচীন গ্রীক্‌দেশে উচ্চ ও সম্ভ্রান্ত সম্প্রদায়ের লোকেরাই Aurora বা উষার পূজা করিবার অধিকারী ছিলেন। পুরাতন রোমক-সম্রাট্‌দিগের প্রধান পুরোহিতেরা উষার পূজা করিতেন। আরবের প্রসিদ্ধ কোরিশ-(Koresh) জাতি উষা-পূজার জন্য রাশি রাশি রৌপ্য-মুদ্রা ব্যয় করিতেন।

এ প্রসঙ্গে ইহাও বলা আবশ্যক যে, পর্ণলতিকা চিরকুমারী। হিন্দুশাস্ত্রে পর্ণলতিকা কৌমার্য্যের জ্ঞাপিকা। বেদোক্তা উষাদেবীও চিরকুমারী। যখন আশ্বিন-শুক্লপক্ষে বঙ্গে কুমারী-(দুর্গা-) পূজা হয়, তখন এ দেশীয় বারুইগণ পর্ণলতিকার উদ্যানে উষা-পূজা করিয়া থাকেন। আর্য্যাচারের এরূপ উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত সর্ব্বত্র সুলভ নহে।

বৈশ্য ও ক্ষত্রিয়ের অধিকারের মধ্যে তারতম্য অল্প। বৈশ্যজাতি কৃষি-বাণিজ্যাদি দ্বারা দেশের ধনসম্পদ্ বৃদ্ধি করিবেন, এবং ক্ষত্রিয়জাতি শস্ত্র-ধারণপূর্ব্বক দেশ রক্ষা করিবেন—এই মাত্র পার্থক্য। অপরাপর বিষয়ে উভয়ের অধিকার একই রূপ। কৃষি ও বাণিজ্য-ব্যবসায় দ্বারা জীবিকা-নির্ব্বাহ হইতে বারুজীবিজাতির বৈশ্যত্বই প্রমাণিত হয়। প্রাচীন কিম্বদন্তী, দেশাচার ও শাস্ত্রীয় প্রমাণ হইতেও উহারই বলবত্তা প্রতিপাদিত হয়।

বর্ত্তমানে প্রায় সমস্ত জাতিই স্বীয় স্বীয় জাতির গৌরব বৃদ্ধি করিবার জন্য উদ্‌যোগী হইয়াছেন। কিন্তু আমি বলি যে, সর্ব্বোচ্চ জাতি ব্রাহ্মণগণও যদি বর্ত্তমানে উচ্চ আদর্শ হইতে দূরবর্ত্তী হন, তবে তাঁহারাও সমাজে সম্মান পাইতে পারিবেন না। যে জাতিই সমাজে সম্মানিত হইতে চাহেন, তাঁহাদের উচ্চগুণের অধিকারী হওয়া আবশ্যক। তাঁহাদের বিদ্যা বুদ্ধি, শিক্ষা দীক্ষা ও পরোপকার-বৃত্তির উন্নতি হইলেই তাঁহারা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য বা শূদ্র যে নামেই অভিহিত হউন্ না কেন, সমাজে নিশ্চিতই সম্মানিত হইবেন। আমি আপনাদিগকে বলি, যে আপনারা ব্রাহ্মণের বিদ্যা, ক্ষত্রিয়ের শৌর্য্য, বৈশ্যের ধনার্জ্জন ও দানশক্তি এবং শূদ্রের সেবাধর্ম্মের অধিকারী হউন্। সমাজ-সেবকের শত্রু নাই। আমি যদি আপনার উপর প্রভুত্ব করিতে চাই, আপনি তাহা সহ্য করিবেন না, কিন্তু আপনার সেবককে আপনি ভাল না বাসিয়া পারেন না।

হিন্দুসমাজ বর্ত্তমানে বহুবিধ জাতিতে বিভক্ত। সেই বিভাগগুলি যতদিন আছে, ততদিন যদি সেই সকল জাতীয় লোক সংঙ্ঘবদ্ধ হইয়া তাহাদের উন্নতি-সাধন করেন, তাহা হইলে ক্রমে সমগ্র হিন্দুসমাজেরই উন্নতি হইবে। বহু ব্যষ্টি লইয়াই সমষ্টি, ব্যষ্টির মঙ্গল হইতে সমষ্টির মঙ্গল সংঘটিত হয়।

জ্ঞান ও অজ্ঞান, শিক্ষা ও অশিক্ষা, নিঃস্বার্থপরতা ও স্বার্থপরতা ইত্যাদি জাতিকে উন্নত বা অবনত করে। বারুজীবিজাতির সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি-সাধনের জন্যই এই সভার সৃষ্টি ও আইনানুসারে ইহা রেজেষ্টিকৃত হয়। ১৩০৮ সালে এই সভা স্থাপিত হয়, এবং এই ২৩ বৎসর এই সভা বঙ্গদেশের বারুজীবিজাতিকে একতাবদ্ধ করিতে যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন, এবং অনেকাংশে কৃতকার্য্যও হইয়াছেন। পূর্ব্বে বারুজীবিসমাজ বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। ঐ সকল শ্রেণীর মধ্যে বৈবাহিক আদান-প্রদানাদি প্রচলিত ছিল না। এই সভার সৃষ্টির পর হইতে ক্রমে এইরূপ বিবাহ প্রচলিত হইয়াছে। এই সভার যত্নে ও উদ্‌যোগে ঢাকা, নোয়াখালি, বরিশাল, ফরিদপুর, ২৪পরগণা, হাওড়া, মুর্শিদাবাদ, হুগলী, যশোহর, খুলনা, নদীয়া, পাবনা প্রভৃতি জেলার বারুজীবিগণ পরস্পরের মধ্যে বিবাহ-সম্বন্ধ স্থাপন করিতে সমর্থ হইতেছেন। এই সভার চেষ্টায় অনেক হাইকুল, মধ্যইংরাজী স্কুল, প্রাথমিক বালক-বিদ্যালয় ও বালিকাবিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। ঐ সকল বিদ্যালয়ে সকলজাতির ও সর্ব্বসম্প্রদায়ের দরিদ্র বালকেরা ও হিন্দুজাতি বিনা বেতনে শিক্ষালাভ করিয়া থাকে। সকল জাতি এবং সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সহিত সদ্‌ভাব রাখিয়া, এই সভা তাহার কার্য্যক্ষেত্রের প্রসার ক্রমশঃ বর্দ্ধিত করিয়াছেন ও করিতেছেন। যদিও প্রত্যক্ষভাবে বারুজীবিজাতির উন্নতিসাধনের জন্যই এই সভার সৃষ্টি, তথাপি পরোক্ষভাবে ইহা সকল জাতির—সকল সম্প্রদায়েরই যথাসম্ভব উপকার-সাধন করিয়া থাকেন। অথচ কি গবর্ণমেণ্ট, কি অন্যজাতি, কাহারও নিকট এই সভা অদ্যাপি কপর্দ্দক গ্রহণ করেন নাই।

বরপণপ্রথা যাহা অনেক সমাজের ঘোর কলঙ্কস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, সেই কুপ্রথা যাহাতে বারুজীবিসমাজে প্রবেশ করিতে না পারে, এই সভা তাহার বিশেষ ব্যবস্থা করিয়াছেন। অদ্যাপি উহা এ সমাজে প্রবেশ করিতে পারে নাই।

বর্ত্তমান হিন্দু ও মুসলমান্ সমাজের শিক্ষিত যুবকেরা সাধারণতঃ চাকরীর জন্য যেরূপ লালায়িত, তাহা দেখিলে দুঃখ হয়। এই সমাজের শিক্ষিত যুবকদিগের মধ্যে যাহাতে ঐরূপ লালসা বৃদ্ধি না পায় এবং তাঁহারা যাহাতে স্বাধীনভাবে জীবিকার্জ্জন করিতে পারেন, সেজন্য সভার যথেষ্ট চেষ্টা আছে।

এই সভার একটী স্থায়ী সভাগৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে। সভার একটী স্থায়ী ফণ্ড বা ধনভাণ্ডারও হইয়াছে। সভার মুখপত্র 'বৈশ্য-পত্রিকা' ১৫শ বর্ষ যাবৎ

প্রকাশিত হইতেছে। সভার অনেক কৃতী যুবক-সভ্য বৈশ্য-পত্রিকায় নানাবিধ নিবন্ধ প্রকাশ দ্বারা বঙ্গসাহিত্যের পরিপুষ্টি-সাধন করিতেছেন।

বিলাতপ্রত্যাগতদিগের সমাজে পুনঃ প্রবেশের অর্গল, শাস্ত্রীয় রীত্যনুসারে উন্মুক্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। শিক্ষাবিস্তারকল্পে বিদ্যালয়-স্থাপন এবং দুঃস্থ বালকদিগের সাহায্য প্রদান দ্বারা, এই সভা জ্ঞানবিস্তারের পথ পরিষ্কৃত করিয়া দিয়াছেন। বহু ছাত্র এই সভার যত্নে ও সাহায্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধি লাভ করিয়া, আপনাদিগকে প্রতিষ্ঠান্বিত করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এই সভা যতদূর সম্ভব, বারুজীবিজাতির উন্নতির পথ পরিষ্কৃত করিয়া দিয়াছেন। এ জাতির ভবিষ্যৎ তাহাদের নিজ-হস্তে।

"যেমন বুনিবে বীজ ফলিবে তেমন।"

As thou sowest so shalt thou reap. এ কথাটী বড় সারগর্ভ। হিন্দুশাস্ত্রের কর্ম্মফলতত্ত্ব বাইবেলে উক্ত ভাষায় ব্যক্ত হইয়াছে। যে ব্যক্তি বা সমাজ যত উন্নতই হউন, কর্ম্মে বিরত হইলে, তাঁহার ভবিষ্যৎ অন্ধকারময়। কোনও ব্যক্তি-বিশেষের উপর সমস্ত কার্য্যের ভার রাখিয়া নিশ্চিন্ত থাকা উচিত নয়। প্রত্যেকেরই স্মরণ রাখা উচিত যে, তাঁহার নিজের প্রতি—নিজ পরিবারের প্রতি যেমন কর্ত্তব্য আছে, সেরূপ যে সমাজের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, তাহার প্রতিও তাঁহার কর্ত্তব্য আছে। জ্ঞানের বিকাশের সহিত কর্ত্তব্যের পরিধি বাড়িয়া যায়। ঐ পরিধি যত বাড়িবে, ততই আমরা দেখিতে পাইব যে, স্বজাতির প্রতি যেরূপ কর্ত্তব্য আছে, অন্যান্য জাতির প্রতিও সেরূপ কর্ত্তব্য আছে। শুধু অন্যান্য জাতি নয়, অপরাপর ধর্ম্মসম্প্রদায়ের প্রতিও কর্ত্তব্য আছে। ব্রহ্মকে আদর্শ রাখিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলে কর্ত্তব্যপথ নিষ্কণ্টক হয়; চক্ষুর আবরণ খুলিয়া যায়। যে জাতির মধ্যে উচ্চ আদর্শসম্পন্ন ব্যক্তি যত অধিক হইবে, সে জাতি তত উন্নত হইবে।

প্রত্যেক সামগ্রীরই দুইটী দিক্ আছে। সভা অনেক বিষয়ে এই জাতির অনেক উন্নতি করিতে সমর্থ হইয়া থাকিলেও এখনও তাঁহার অসমাপ্ত কার্য্য অনেক রহিয়াছে। সমাজ যতই উন্নত হইবে, অসমাপ্ত কার্য্যের পরিমাণও ততই বৃদ্ধি পাইবে। অসভ্যসমাজের কোনও অভাব নাই। সমাজ যত সভ্য হয়, তাহার অভাবও তত বৃদ্ধি পায়। যখন আমরা প্রথম সভা সংস্থাপন করি, তখন আমাদের সংকল্প হয় যে, অন্ততঃ দশ বৎসর পরে আমাদের জাতির মধ্যে একজন স্ত্রী বা পুরুষকেও নিরক্ষর থাকিতে দিব না। কিন্তু, ২৩ বৎসর চলিয়া গেল, গত সেন্সাসে দেখিতে পাইলাম যে, আমাদের জাতির মধ্যে নিরক্ষর ব্যক্তির সংখ্যা এখনও শতকরা ৮০ জন। যদিও ভারতে গড়ে নিরক্ষর ব্যক্তির সংখ্যা শতকরা ৯৫ জন, তাহার তুলনায় আমাদের জাতির প্রাথমিক-শিক্ষোন্নতি কিছু অধিক, তথাপি আমাদের জাতির ইহা নিতান্তই অগৌরবের বিষয়

যে, আমাদের জাতির মধ্যে নিরক্ষরের সংখ্যা এখনও এত অধিক। স্ত্রীশিক্ষার অভাবে অশিক্ষিতের সংখ্যা এত অধিক। আমি মোটামুটি হিসাব করিয়া দেখিয়াছি যে, সমগ্র বাঙ্গালায় আমাদের স্বজাতিদিগের মধ্যে গ্রাজুয়েট এবং আন্‌ডার্-গ্রাজুয়েটদের সংখ্যা প্রায় দুই সহস্র। নিকটবর্ত্তী খালিশপুরেই প্রায় ২৫ জন গ্রাজুয়েট্ আছেন। স্বীয় শিক্ষাবসানেই এই শিক্ষিত যুবকদিগের স্বজাতির প্রতি কর্ত্তব্য-সাধনের কি শেষ হইয়াছে? আমি আমার স্বজাতীয় শিক্ষিতদিগকে অনুরোধ করি যে, তাঁহারা এক একটী জেলার কোনও কোনও অংশে স্বীয় স্বীয় কার্য্যক্ষেত্রের কেন্দ্র স্থাপন করিয়া, বালক-বালিকাদিগের প্রাথমিক শিক্ষার বিধান করুন। বয়স্ক ও বয়স্কাদের জন্য সান্ধ্য-বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা করুন। যে পর্য্যন্ত আমাদের জাতির মধ্যে একজনও নিরক্ষর স্ত্রী বা পুরুষ থাকিবেন, সে পর্য্যন্ত আমাদের সভার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষিতের সংখ্যা-বৃদ্ধির সহিত উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিতের সংখ্যা আপনিই বাড়িয়া যাইবে। আমাদিগের সভার সভ্যগণ কর্ত্তৃক স্থাপিত বিদ্যালয়ের দ্বারা অন্যান্য জাতিও উপকৃত হইবেন। এই প্রাথমিক-শিক্ষার সহিত শিল্প, বাণিজ্য, কৃষি ইত্যাদি-বিষয়ক শিক্ষারও আবশ্যক। এই সভার অন্যতম সভ্য সুবিখ্যাত চিত্রশিল্পী বাবু শশিভূষণ পাল তাঁহার প্রতিষ্ঠিত চিত্র-বিদ্যালয়ের দ্বারা কেবল স্বজাতির নহে অপরাপর জাতিরও যথেষ্ট উপকার করিতেছেন। যশোহর-জেলায়ও ঐরূপ একটী চিত্র-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত শশধর দাস মহাশয়ও শ্রীযুক্ত শশী বাবুর ন্যায় ঐরূপ চিত্র-বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া দেশের যথেষ্ট উপকার করিতেছেন। এইরূপ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইলে সভা হইতে সাধ্যমত সাহায্য করা হইয়া থাকে।

যশোহর ও খুলনা-জেলায় আমাদের স্বজাতির সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে। তাহার মধ্যে শিক্ষিতের সংখ্যাও নিতান্ত নগণ্য নহে। তাঁহাদের নিকট আমার সানুনয় নিবেদন ও প্রার্থনা এই যে, আগামী বৎসরে তাঁহারা এই দুইটী জেলায়—অন্ততঃ ইহার একটী জেলায় প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার করিয়া আমাদের জাতীয় অগৌরব-মোচন-কল্পে অন্যজেলার আদর্শ বা উদাহরণ-স্থল হউন্। বয়স্ক অশিক্ষিতদিগের জন্য নৈশবিদ্যালয়ের বিশেষ প্রয়োজন, ইহা যেন কেহ বিস্মৃত না হন।

স্বজাতীয়দিগের ব্যবসায় বাণিজ্যের সৌকর্য্যার্থে—এই সভা "বৈশ্যবারুজীবিব্যাঙ্ক" নামে একটী ব্যাঙ্ক স্থাপন করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। ঐ ব্যাঙ্কের সংসৃষ্টি-পত্রাদি বৈশ্য-পত্রিকায় পুনঃ পুনঃ প্রকাশিত হইয়াছিল, এবং তৎসম্বন্ধে কোনও পরিবর্ত্তন-পরিবর্দ্ধনের প্রয়োজন বোধ করিলে তাহা জ্ঞাপন করা এবং কে কত অংশ লইবেন—তাহা জ্ঞাপন করিবার জন্যও আহ্বান করা হইয়াছিল, কিন্তু ২ ব্যক্তি মাত্র অল্প কিঞ্চিৎ অংশ লইবার

ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। ব্যাঙ্ক স্থাপন করিয়া শেষে অংশ সংগ্রহ করা অপেক্ষা, অংশ-বিলির বন্দোবস্ত পূর্ব্বে করিয়া অন্ততঃ মূলধনের অর্দ্ধ বা এক তৃতীয়াংশ অংশের বিষয় নিঃসন্দেহ হইয়া, পরে, ব্যাঙ্ক স্থাপন করাই সমীচীন বোধ হওয়ায় ঐ ব্যাঙ্ক রেজেষ্ট্রি করা হয় নাই। আমার নিবেদন যে, যদি আপনারা সমাজের ধনবল বৃদ্ধি করিতে চাহেন, তাহা হইলে ব্যবসায়-বাণিজ্য দ্বারাই উহা হইতে পারিবে। উহা করিতে গেলেই ব্যাঙ্কের আবশ্যক। আমাদের স্বজাতির মধ্যে খুব বড় ধনী না থাকিলেও একশত হইতে এক সহস্র মুদ্রা পর্য্যন্ত অংশ গ্রহণ করিতে পারেন এরূপ অনেক লোক আছেন। তাঁহারা কে কত অংশ লইবেন, তাহা জানাইলে, অন্ততঃ পঞ্চাশ হাজার টাকার অংশের বিষয় কৃতনিশ্চয় হইতে পারিলে, অবিলম্বে ব্যাঙ্ক রেজেষ্ট্রি করা যাইবে। উহাতে ব্যক্তিগত বা সমাজগত লাভ ভিন্ন ক্ষতির সম্ভাবনা নাই। আশা করি, সভায় যাঁহারা উপস্থিত আছেন, তাঁহারাই এই কার্য্যে অগ্রণী হইয়া অপরের উদাহরণস্থল হইবেন। আমার বিবেচনায় খুলনায় এই ব্যাঙ্ক সংস্থাপিত হওয়া উচিত।

বৈশ্য পত্রিকার গ্রাহক-সংখ্যা আরও বৃদ্ধি করার প্রয়োজন। সমাজের প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তি যদি এই পত্রিকা গ্রহণ করেন, তবে ইহার বহু সহস্র গ্রাহক হইতে পারে।

সভার অংশের টাকা সংগ্রহ এবং নূতন সভ্য করিয়া সভার মূলধন বৃদ্ধি করার দিকে সকলেরই লক্ষ্য করা উচিত। আমাদের সমাজের বহু কৃতবিদ্য ব্যক্তিকে এই সভার সভ্য করিবার জন্য কোনই চেষ্টা হইতেছে না। অর্থ না হইলে যে কোনও কার্য্যই সাধিত হয় না, তাহা সকলের স্মরণ রাখা উচিত। যাঁহার অর্থ আছে, তিনি অর্থ দিয়া সাহায্য করুন, আর যাঁহার অর্থ নাই, তিনি সভার উদ্দেশ্য প্রচার করিয়া সভ্য-সংখ্যা-বৃদ্ধির চেষ্টা করুন; এবং সকলেই প্রতি গ্রামে গ্রামে প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার করিয়া সভার উদ্দেশ্য সুসম্পন্ন করুন। শিক্ষাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যাহাতে সজাতীয়গণ সংযত, সচ্চরিত্র হয়েন তদ্বিষয়ে যত্নবান্ হইতে হইবে।

উচ্চশিক্ষিতগণের প্রতি আমার নিবেদন এই যে, তাঁহারা যেমন পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোচনা করেন, তেমন সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃতভাষার ও হিন্দু-শাস্ত্রের অনুশীলন করুন। কেবল কাব্যাদি পড়িলে চলিবে না, শ্রুতি স্মৃতি পুরাণাদির অনুশীলনও আবশ্যক। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণও সংস্কৃত ভাষা-ভাণ্ডারের বেদ, উপনিষৎ, দর্শন, ধর্ম্মশাস্ত্র, সাহিত্য প্রভৃতির সমাদর করেন, কিন্তু আমরা তাহার সমাদর করিতে কুণ্ঠিত। ইহা সত্য যে আমরা যে সভ্যজাতি বলিয়া পরিচয় দিতে পারি, তাহার একমাত্র নিদান আমাদের সংস্কৃতভাষা। সংস্কৃতভাষাই প্রত্যেক হিন্দুর জাতীয়-জীবনের গতিপথ নির্দ্দেশ করিতে সমর্থ।

যাঁহারা সংস্কৃতভাষার আলোচনা করিবেন, তাঁহারা শুধু স্বজাতির নয়, সমগ্র হিন্দুসমাজের গৌরব বৃদ্ধি করিবেন। হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজের মূলতত্ত্ব জানিতে গেলে সংস্কৃতভাষা শিক্ষা করা প্রয়োজন। কোনও হিন্দুর পক্ষেই হিন্দুশাস্ত্রে অজ্ঞতা মার্জ্জনীয় নহে। আমি ৩১ বর্ষ যাবৎ হিন্দু-পত্রিকা সম্পাদন করিতেছি। এই সম্পাদন-কার্য্যে ব্রাহ্মণ প্রভৃতি অন্য জাতির সাহায্য পাইয়াছি, কিন্তু অনেক সময় আমার চিত্তে আক্ষেপ হয় যে, আমার সজাতীয় ২।১ ব্যক্তির সাহায্য ভিন্ন অন্য সজাতীয় সাহায্য হইতে আমি একেবারেই বঞ্চিত। আমি আশা করি, অদূর ভবিষ্যতে আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায় শাস্ত্রানুশীলনে মনোযোগী হইবেন। যাহাতে প্রত্যেক ব্যক্তিই চরিত্রে ও শরীরে সবল ও ভগবদ্ভক্ত সরল ও পরোপকারপরায়ণ হন, তাহার দিকেও দৃষ্টি রাখিতে হইবে। চরিত্র-গঠনও সভার অন্য প্রধান উদ্দেশ্য। চরিত্রহীন ব্যক্তিমাত্রই দেশের ও জাতির কলঙ্ক, একথা সকলেরই স্মরণ রাখা উচিত।

প্রাচীনকালে বিদ্যাশিক্ষার সহিত চরিত্র-গঠনের প্রতি কিরূপ তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখা হইত, তাহা বেদোক্ত বিদ্যা-ব্রাহ্মণ-সংবাদ হইতে আপনারা অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন।

বিদ্যা হবৈ ব্রাহ্মণমাজগাম গোপায় মা শেবধিষ্টেঽহমস্মি।
অসূয়কায়ানৃজবেঽয়তায় মা মা ব্রুয়া বীর্য্যবতী তথাস্যাম্।
য আতৃণত্ত্যবিতথেন কর্ণাবদুঃখং কুর্বন্নমৃতং সম্প্রযচ্ছন্।
তং মন্যেত পিতরং মাতরঞ্চ তস্মৈ ন দ্রুহ্যেৎ কতমচ্চনাহ।
অধ্যাপিতা যে গুরুং নাদ্রিয়ন্তে বিপ্রা বাচা মনসা কর্ম্মণাবা।
যথৈব তে ন গুরোর্ভোজনীয়াস্তথৈব তান্ন ভুনক্তি শ্রুতং তৎ।
যমেব বিদ্যাঃ শুচিমপ্রমত্তং মেধাবিনং ব্রহ্মচর্য্যোপপন্নম্।
যস্তে ন দ্রুহ্যেৎ কতমচ্চনাহ তস্মৈ মা ব্রূয়া নিধিপায় ব্রহ্মনিতি
নিধিঃ শেবধিরিতি।

বিদ্যা মূর্ত্তিমতী হইয়া বেদবেদাঙ্গবিৎ ব্রাহ্মণের নিকট আগমন করিয়া বলিলেন—"আমাকে রক্ষা কর, আমি তোমার দ্বারা রক্ষিত হইয়া সুখনিধান হইব।" ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করিলেন—"কাহার নিকট হইতে তোমাকে আমি রক্ষা করিব?" বিদ্যা উত্তর করিলেন—"যাহারা অসূয়াবিশিষ্ট, অসরল (অর্থাৎ বাক্যে মনে দেহে অসৎপ্রবৃত্তি যুক্ত) ও অসংযত তাহাদিগের নিকট হইতে আমাকে রক্ষা করিবে। ঐ সকল লোকের নিকট আমাকে বলিও না—অর্থাৎ তাহাদিগকে বিদ্যা দান করিও না। যিনি সত্য ভাবে কর্ণে অমৃতত্ব-প্রাপ্তির জন্য সুখে ব্রহ্মতত্ত্ব শ্রবণ করান, তাঁহাকে পিতামাতার সমান জ্ঞান করিবে। কদাচ তাঁহার (উপদেশের) বিরুদ্ধাচরণ করিবে না।"

তৎপরে দুষ্ট শিষ্যগণের সম্বন্ধে বিদ্যা বলিতেছেন যে, "যে সকল শিষ্য গুরুর নিকট বিদ্যা শিক্ষা করিয়া তাঁহাকে বাক্য কর্ম্ম ও মন দ্বারা শ্রদ্ধা না করে, তাহারা যেমন গুরুগৃহে ভোজন-প্রাপ্তির অযোগ্য, তেমন তাহাদের বিদ্যাও ফলদানের অযোগ্যা হইবে।

অতঃপর বিদ্যা বলিতেছেন "হে ব্রহ্মণ্, যাঁহারা যম নিয়ম দ্বারা শুচি এবং ব্রহ্মচর্য্যসম্পন্ন, মেধাবী ও প্রমাদশূন্য হইয়াছেন, এবং যাঁহারা কখনও বিরুদ্ধাচরণ করেন না, সেই নিধিপতিগণের নিকটেই আমাকে বলিবে, অর্থাৎ ঐরূপ ব্যক্তি আমাকে রক্ষা করিবেন, সুতরাং তাঁহাকেই বিদ্যা দান করিবে। নিধি ও শেবধি একই কথা।"

ভগবান্ আপনাদিগের মঙ্গল করুন্। আপনারা কর্ম্মক্ষেত্রে কখনও ঈশ্বরকে ভুলিবেন না; এবং আপনারা তাঁহাকে না ভুলিলে তিনিও আপনাদিগকে ভুলিবেন না। আপনারা সংখ্যায় অল্প কিন্তু আপনারা যদি জ্ঞানবিজ্ঞান দ্বারা বিভূষিত ও পরোপকার বৃত্তি দ্বারা প্রণোদিত হন এবং ভগবান্কে মস্তকের উপরে রাখিয়া স্বদেশের—স্বজাতির উন্নতিকল্পে কটিবদ্ধ হন, তাহা হইলে আপনাদের সংখ্যাজনিত ক্ষুদ্রত্ব দূরীভূত হইবে এবং সমাজে সকলের নিকট সমাদৃত হইবেন। অধিক বাক্য-ব্যয় না করিয়া নীরবে ভগবান্কে মস্তকের উপর রাখিয়া কার্য্য করিতে হইবে। সারাজীবন এই উচ্চ আদর্শ সর্ব্বদা আপনাদের নয়নপথে রাখিয়া কার্য্য করিয়া যাইবেন। ইহাও মনে রাখিবেন যে, অতি নিভৃতস্থানে যে কার্য্য করিতেছেন এবং মনের অতি নিভৃত কোণে যে চিন্তা করিতেছেন, তাহা ভগবান্ জানিতে পারিতেছেন। ব্রহ্মকে বিস্মৃত হইবেন না।

আমার বক্তব্য শেষ হইল, এইক্ষণ আমরা সকলে দণ্ডায়মান হইয়া ভগবানের স্তোত্র পাঠ করিয়া সভার অন্যান্য কার্য্য সম্পন্ন করিব।

ওঁ নমস্তে সতে সর্ব্বলোকাশ্রয়ায়
নমস্তে চিতে বিশ্বরূপাত্মকায়।
নমোঽদ্বৈততত্ত্বায় মুক্তি প্রদায়
নমো ব্রহ্মণে ব্যাপিনে নির্গুণায়॥
ত্বমেকং শরণ্যং ত্বমেকং বরেণ্যং
ত্বমেকং জগৎকারণং বিশ্বরূপম্।
ত্বমেকং জগৎ কর্ত্তৃ-পাতৃ-প্রহর্ত্তৃ
ত্বমেকং পরং নিশ্চলং নির্ব্বিকল্পম্॥
ভয়ানাং ভয়ং ভীষণং ভীষণানাং
গতিঃ প্রাণিনাং পাবনং পাবনানাম্

মহোচ্চৈঃ পদানাং নিয়ন্তৃ ত্বমেকং
পরেষাং পরং রক্ষকং রক্ষকাণাম্ ॥
পরেশ প্রভো সর্ব্বরূপাবিনাশিন্
অনির্দ্দেশ্য সর্বেন্দ্রিয়াগম্য সত্য।
অচিন্ত্যাক্ষর ব্যাপকাব্যক্ততত্ত্ব
জগদ্ভাসকাধীশ পায়াদ পায়াৎ ॥
ত্বদেকং স্মরামস্ত্বদেকং জপাম-
স্ত্বদেকং জগৎসাক্ষিরূপং নমামঃ।
সদেকং নিধানং নিরালম্বমীশং
ভবাম্ভোধিপোতং শরণ্যং ব্রজামঃ ॥

অর্থাৎ তুমি নিত্য, তুমি সর্ব্বলোকের আশ্রয়—তোমাকে নমস্কার করি। তুমি জ্ঞান-স্বরূপ, বিশ্বের আত্মাস্বরূপ, অদ্বৈততত্ত্ব, মুক্তিদায়ক,—তোমাকে নমস্কার। তুমি সর্ব্বব্যাপী নির্গুণ ব্রহ্ম, তোমাকে নমস্কার। তুমি একমাত্র শরণ্য অর্থাৎ আশ্রয়, তুমি অদ্বিতীয় বরণীয়, তুমি একমাত্র জগতের কারণ, তুমি বিশ্বরূপ; একমাত্র তুমি জগতের সৃষ্টি-কর্ত্তা, পালন কর্ত্তা এবং অন্তে সংহারকর্ত্তা, তুমি একমাত্র পরম পুরুষ, নিশ্চল ও নানাবিধকল্পনাশূন্য। তুমি ভয়ের ভয়, তুমি ভয়ানকের ভয়ানক, তুমি প্রাণীদিগের একমাত্র গতি, পাবিত্র্যজনক সকলের পাবিত্র্যজনক। তুমি উচ্চ পদাধিষ্ঠিত ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর প্রভৃতির নিয়ামক, তুমি শ্রেষ্ঠ পদার্থ সকলের শ্রেষ্ঠ ও রক্ষকদিগের রক্ষক। হে পরেশ! (ব্রহ্মাদি-দেবাধিপ) হে প্রভো! তুমি সর্ব্বরূপ, অবিনাশী, অনির্দ্দেশ্য এবং সর্বেন্দ্রিয়াগম্য—কোন ইন্দ্রিয়ের গোচর নহ। হে সত্যরূপ! হে অচিন্ত্য! হে অক্ষর! হে ব্যাপক! হে অব্যক্ততত্ত্ব! জগদ্ভাসকাধীশ! (জগদ্ভাসক চন্দ্র সূর্য্যাদির অধীশ্বর) অথবা হে জগদ্ভাসক! হে অধীশ! তুমি আমাদিগের অপায় অর্থাৎ ভক্তি-বিশ্লেষ ও জ্ঞান-বিশ্লেষ হইতে রক্ষা কর। সেই একমাত্র ব্রহ্মকে আমরা স্মরণ করি, সেই অদ্বিতীয় ব্রহ্মকে আমরা জপ করি; সেই এক জগৎসাক্ষিস্বরূপ ব্রহ্মকে আমরা প্রণাম করি। সেই তুমি সৎ, একমাত্র জগতের নিধান অর্থাৎ আশ্রয়ভূত, স্বয়ং নিরালম্ব অর্থাৎ আশ্রয়শূন্য; সেই তুমি ঈশ্বর, ভবসমুদ্রের পোতস্বরূপ! আমরা তোমার আশ্রয় গ্রহণ করিলাম।

মাহং ব্রহ্ম নিরাকুর্য্যাং মা মা ব্রহ্ম নিরাকরোৎ। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

অথর্ব্ববেদীয়

মুণ্ডক-উপনিষদ।

(মূল, বঙ্গানুবাদ, ইংরাজি অনুবাদ ও বিশদব্যাখ্যাসহ।)

লেখক—সম্পাদক।

ওঁ ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবাঃ
ভদ্রং পশ্যেমাক্ষভির্যজত্রাঃ।
স্থিরৈরঙ্গৈস্তুষ্টুবাংসস্তনূভিঃ
ব্যশেম দেবহিতং যদায়ুঃ ॥১
স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ
স্বস্তি নঃ পূষা বিশ্ববেদাঃ।
স্বস্তি নস্তার্ক্ষ্যোঽরিষ্টনেমিঃ
স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু ॥২
ওঁ শান্তিঃ, ওঁ শান্তিঃ, ওঁ শান্তিঃ ॥

প্রথম-মুণ্ডকে

প্রথমঃ খণ্ডঃ।

ওঁ ব্রহ্মা দেবানাং প্রথমঃ সংবভূব বিশ্বস্য কর্ত্তা ভুবনস্য গোপ্তা।
স ব্রহ্মবিদ্যাং সর্ব্ববিদ্যা-প্রতিষ্ঠামথর্ব্বায় জ্যেষ্ঠপুত্রায় প্রাহ ॥১
অথর্ব্বণে যাং প্রবদেত ব্রহ্মাথর্ব্বা তাং পুরোবাচাঙ্গিরে ব্রহ্মবিদ্যাম্।
স ভারদ্বাজায় সত্যবহায় প্রাহ ভারদ্বাজোঽঙ্গিরসে পরাবরাম্ ॥২
শৌনকো হ বৈ মহাশালোঽঙ্গিরসং বিধিবদুপসন্নঃ পপ্রচ্ছ।
কস্মিন্নু ভগবো বিজ্ঞাতে সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতীতি ॥৩
তস্মৈ স হোবাচ।
দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে ইতি হ স্ম যদ্ ব্রহ্মবিদো বদন্তি পরা চৈবাপরা চ ॥৪
তত্রাপরা ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ববেদঃ শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং
নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি।
অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে ॥৫

যত্তদদ্রেশ্যমগ্রাহ্যমগোত্রমবর্ণমচক্ষুঃ-শ্রোত্রং তদপাণি-পাদম্।
নিত্যং বিভুং সর্ব্বগতং সুসূক্ষ্মং তদব্যয়ং যদ্ভূতযোনিং পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ ॥৬
যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্ণতে চ যথা পৃথিব্যামোষধয়ঃ সংভবন্তি।
যথা সতঃ পুরুষাৎ কেশলোমানি তথাক্ষরাৎ সংভবতীহ বিশ্বম্ ॥৭
তপসা চীয়তে ব্রহ্ম ততোঽন্নমভিজায়তে।
অন্নাৎ প্রাণো মনঃ সত্যং লোকাঃ কর্ম্মসু চামৃতম্ ॥৮
যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদ্যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ।
তস্মাদেতদ্ ব্রহ্ম নাম রূপমন্নং চ জায়তে ॥৯

ইতি প্রথমমুণ্ডকে প্রথমঃ খণ্ডঃ ॥

প্রথম-মুণ্ডকে

দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ।

তদেতৎ সত্যং মন্ত্রেষু কর্ম্মাণি কবয়ো যান্যপশ্যং স্তানি ত্রেতায়াং বহুধা সন্ততানি।
তান্যাচরথ নিয়তং সত্যকামা এষ বঃ পন্থাঃ সুকৃতস্য লোকে ॥১
যদা লেলায়তে হ্যর্চ্চিঃ সমিদ্ধে হব্যবাহনে।
তদাজ্যভাগাবন্তরেণাহুতীঃ প্রতিপাদয়েৎ ॥২
যস্যাগ্নিহোত্রমদর্শমপৌর্ণমাসমচাতুর্ম্মাস্যমনাগ্রয়ণমতিথিবর্জ্জিতং চ।
অহুতমবৈশ্বদেবমবিধিনা হুতমাসপ্তমাং স্তস্য লোকান্ হিনস্তি ॥৩
কালী করালী চ মনোজবা চ সুলোহিতা যা চ সুধূম্রবর্ণা।
স্ফুলিঙ্গিনী বিশ্বরূচী চ দেবী লেলায়মানা ইতি সপ্তজিহ্বাঃ ॥৪
এতেষু যশ্চরতে ভ্রাজমানেষু যথাকালং চাহুতয়োহ্যাদদায়ন্।
তন্নয়ন্ত্যেতাঃ সূর্য্যস্য রশ্ময়োঃ যত্র দেবানাং পতিরেকোঽধিবাসঃ ॥৫
এহেহীতি তমাহুতয়ঃ সুবর্চসঃ সূর্য্যস্য রশ্মিভির্যজমানং বহন্তি।
প্রিয়াং বাচমভিবদন্ত্যোঽর্চ্চয়ন্ত্য এষ বঃ পুণ্যঃ সুকৃতো ব্রহ্মলোকঃ ॥৬
প্লবা হ্যেতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপা অষ্টাদশোক্তমবরং যেষু কর্ম্ম।
এতচ্ছ্রেয়ো যেঽভিনন্দন্তি মূঢ়া জরামৃত্যুং তে পুনরেবাপি যন্তি ॥৭
অবিদ্যায়ামন্তরে বর্ত্তমানাঃ স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতংমন্যমানাঃ।
জঙ্ঘন্যমানাঃ পরিযন্তি মূঢ়া অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ ॥৮

অবিদ্যায়াং বহুধা বর্ত্তমানা বয়ং কৃতার্থা ইত্যভিমন্যন্তি বালাঃ।
যৎকর্ম্মিণো ন প্রবেদয়ন্তি রাগাত্তেনাতুরাঃ ক্ষীণলোকাশ্চ্যবন্তে ॥৯
ইষ্টাপূর্ত্তং মন্যমানা বরিষ্ঠং নান্যচ্ছ্রেয়ো বেদয়ন্তে প্রমূঢ়াঃ।
নাকস্য পৃষ্ঠে তে সুকৃতেঽনুভূত্বেমং লোকং হীনতরং বা বিশন্তি ॥১০
তপঃশ্রদ্ধে যে হ্যুপবসন্ত্যরণ্যে শান্তা বিদ্বাংসো ভৈক্ষ্যচর্য্যাং চরন্তঃ।
সূর্য্যদ্বারেণ তে বিরজাঃ প্রয়ান্তি যত্রামৃতঃ স পুরুষো হ্যব্যয়াত্মা ॥১১
পরীক্ষ্য লোকান্ কর্ম্মচিতান্ ব্রাহ্মণো নির্ব্বেদমায়ান্নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন।
তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্ ॥১২
তস্মৈ স বিদ্বানুপসন্নায় সম্যক্ প্রশান্তচিত্তায় শমান্বিতায়।
যেনাক্ষরং পুরুষং বেদ সত্যং প্রোবাচ তাং তত্ত্বতো ব্রহ্মবিদ্যাম্ ॥১৩

ইতি প্রথমে মুণ্ডকে দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ।

ইতি প্রথম-মুণ্ডকং সমাপ্তম্ ॥

দ্বিতীয়-মুণ্ডকে

প্রথমঃ খণ্ডঃ।

তদেতৎ সত্যং যথা সুদীপ্তাৎ পাবকাদ্বিস্ফুলিঙ্গাঃ সহস্রশঃ প্রভবন্তে সরূপাঃ।
তথাক্ষরাদ্ বিবিধাঃ সোম্য ভাবাঃ প্রজায়ন্তে তত্র চৈবাপি যন্তি ॥১
দিব্যো হ্যমূর্ত্তঃ পুরুষঃ স বাহ্যাভ্যন্তরো হ্যজঃ।
অপ্রাণো হ্যমনাঃ শুভ্রো হ্যক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ ॥২
এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ।
খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী ॥৩
অগ্নির্ম্মূর্দ্ধা চক্ষুষী চন্দ্রসূর্য্যৌ দিশঃ শ্রোত্রে বাগ্বিবৃতাশ্চ বেদাঃ।
বায়ুঃ প্রাণো হৃদয়ং বিশ্বমস্য পদ্ভ্যাং পৃথিবী হ্যেষ সর্ব্বভূতান্তরাত্মা ॥৪
তস্মাদগ্নিঃ সমিধো যস্য সূর্য্যঃ সোমাৎ পর্জন্য ওষধয়ঃ পৃথিব্যাম্।
পুমান্ রেতঃ সিঞ্চতি যোষিতায়াং বহ্বীঃ প্রজাঃ পুরুষাৎ সংপ্রসূতাঃ ॥৫
তস্মাদৃচঃ সাম যজূংষি দীক্ষা যজ্ঞাশ্চ সর্ব্বে ক্রতবো দক্ষিণাশ্চ।
সংবৎসরশ্চ যজমানশ্চ লোকাঃ সোমো যত্র পবতে যত্র সূর্য্যঃ ॥৬
তস্মাচ্চ দেবা বহুধা সংপ্রসূতাঃ সাধ্যা মনুষ্যাঃ পশবো বয়াংসি।
প্রাণাপানৌ ব্রীহিযবৌ তপশ্চ শ্রদ্ধা সত্যং ব্রহ্মচর্য্যং বিধিশ্চ ॥৭

সপ্ত প্রাণাঃ প্রভবন্তি তস্মাৎ সপ্তার্চ্চিষঃ সমিধঃ সপ্ত হোমাঃ।
সপ্ত ইমে লোকা যেষু চরন্তি প্রাণা গুহাশয়া নিহিতাঃ সপ্ত সপ্ত ॥৮
অতঃ সমুদ্রা গিরয়শ্চ সর্বেঽস্মাৎ স্যন্দন্তে সিন্ধবঃ সর্ব্বরূপাঃ।
অতশ্চ সর্ব্বা ওষধয়ো রসশ্চ যেনৈষ ভূতৈস্তিষ্ঠতে হ্যন্তরাত্মা ॥৯
পুরুষ এবেদং বিশ্বং কর্ম্ম তপো ব্রহ্ম পরামৃতম্।
এতদ্ যো বেদ নিহিতং গুহায়াং সোঽবিদ্যাগ্রন্থিং বিকিরতীহ সোম্য ॥১০

ইতি দ্বিতীয়-মুণ্ডকে প্রথমঃ খণ্ডঃ।

দ্বিতীয়-মুণ্ডকে

দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ।

আবিঃ সন্নিহিতং গুহাচরন্নাম মহৎ পদমত্রৈতৎ সমর্পিতম্।
এজৎ প্রাণন্নিমিষচ্চ যদেতজ্জানথ সদসদ্বরেণ্যং পরং বিজ্ঞানাদ্যদ্বরিষ্ঠং প্রজানাম্ ॥১
যদর্চ্চিমদ্যদণুভ্যোঽণু চ যস্মিন্ লোকা নিহিতা লোকিনশ্চ।
তদেতদক্ষরং ব্রহ্ম স প্রাণস্তদু বাঙ্মনঃ।
তদেতৎ সত্যং তদমৃতং তদ্বেদ্ধব্যং সোম্য বিদ্ধি ॥২
ধনুর্গৃহীত্বৌপনিষদং মহাস্ত্রং শরং হ্যুপাসানিশিতং সংধয়ীত।
আয়ম্য তদ্ভাবগতেন চেতসা লক্ষ্যং তদেবাক্ষরং সোম্য বিদ্ধি ॥৩
প্রণবো ধনুঃ শরো হ্যাত্মা ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যতে।
অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং শরবত্তন্ময়ো ভবেৎ ॥৪
যস্মিন্ দ্যৌঃ পৃথিবী চান্তরীক্ষমোতং মনঃ সহ প্রাণৈশ্চ সর্ব্বৈঃ।
তমেবৈকং জানথ আত্মানমন্যা বাচো বিমুঞ্চথামৃতস্যৈষ সেতুঃ ॥৫
অরা ইব রথনাভৌ সংহতা যত্র নাড্যঃ স এষোঽন্তশ্চরতে বহুধা জায়মানঃ।
ওমিত্যেবং ধ্যায়থ আত্মানং স্বস্তি বঃ পরায় তমসঃ পরস্তাৎ ॥৬
যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদ্ যস্যৈষ মহিমা ভুবি দিব্যে ব্রহ্মপুরে হ্যেষ ব্যোম্ন্যাত্মা প্রতিষ্ঠিতঃ।
মনোময়ঃ প্রাণশরীরনেতা প্রতিষ্ঠিতোঽন্নে হৃদয়ং সন্নিধায়
তদ্বিজ্ঞানেন পরিপশ্যন্তি ধীরা আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি ॥৭
ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে ॥৮

হিরণ্ময়ে পরে কোশে বিরজং ব্রহ্ম নিষ্কলম্।
তচ্ছুভ্রং জ্যোতিষাং জ্যোতিস্তদ্ যদাত্মবিদো বিদুঃ ॥৯
ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি ॥১০
ব্রহ্মৈবেদমমৃতং পুরস্তাদ্ ব্রহ্ম পশ্চাদ্ব্রহ্ম দক্ষিণতশ্চোত্তরেণ।
অধশ্চোর্দ্ধং চ প্রসৃতং ব্রহ্মৈবেদং বিশ্বমিদং বরিষ্ঠম্ ॥১১

ইতি দ্বিতীয়-মুণ্ডকে দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ।

ইতি দ্বিতীয়-মুণ্ডকং সমাপ্তম্ ॥

তৃতীয়-মুণ্ডকে

প্রথমঃ খণ্ডঃ।

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি ॥১
সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নোঽনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ।
জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য মহিমানমিতি বীতশোকঃ ॥২
যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্।
তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি ॥৩
প্রাণো হ্যেষ যঃ সর্ব্বভূতৈর্বিভাতি বিজানন্বিদ্বান্ ভবতে নাতিবাদী।
আত্মক্রীড় আত্মরতিঃ ক্রিয়াবানেষ ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠঃ ॥৪
সত্যেন লভ্যস্তপসা হ্যেষ আত্মা সম্যগ্‌জ্ঞানেন ব্রহ্মচর্য্যেণ নিত্যম্।
অন্তঃশরীরে জ্যোতির্ম্ময়ো হি শুভ্রো যং পশ্যন্তি যতয়ঃ ক্ষীণদোষাঃ ॥৫
সত্যমেব জয়তে নানৃতং সত্যেন পন্থা বিততো দেবযানঃ।
যেনাক্রমন্ত্যৃষয়ো হ্যাপ্তকামা যত্র তৎ সত্যস্য পরমং নিধানম্ ॥৬
বৃহচ্চ তদ্দিব্যমচিন্ত্যরূপং সূক্ষ্মাচ্চ তৎসূক্ষ্মতরং বিভাতি।
দূরাৎ সুদূরে তদিহান্তিকে চ পশ্যৎস্বিহৈব নিহিতং গুহায়াম্ ॥৭
ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি বাচা নান্যৈর্দেবৈস্তপসা কর্ম্মণা বা।
জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধসত্ত্বস্ততস্তু তং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ ॥৮
এষোঽণুরাত্মা চেতসা বেদিতব্যো যস্মিন্ প্রাণঃ পঞ্চধা সংবিবেশ।
প্রাণৈশ্চিত্তং সর্ব্বমোতং প্রজানাং যস্মিন্ বিশুদ্ধে বিভবত্যেষ আত্মা ॥৯

যং যং লোকং মনসা সংবিভাতি বিশুদ্ধসত্ত্বঃ কাময়তে যাংশ্চ কামান্‌।
তং তং লোকং জয়তে তাংশ্চ কামাংস্তস্মাদাত্মজ্ঞং হ্যর্চয়েদ্‌ ভূতিকামঃ ॥১০

ইতি তৃতীয়-মুণ্ডকে প্রথমঃ খণ্ডঃ।

তৃতীয়-মুণ্ডকে

দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ।

স বেদৈতৎ পরমং ব্রহ্ম ধাম যত্র বিশ্বং নিহিতং ভাতি শুভ্রম্‌।
উপাসতে পুরুষং যে হ্যকামাস্তে শুক্রমেতদতিবর্ত্তন্তি ধীরাঃ ॥১
কামান্‌ যঃ কাময়তে মন্যমানঃ স কামভির্জ্জায়তে তত্র তত্র।
পর্য্যাপ্তকামস্য কৃতাত্মনস্তিহৈব সর্ব্বে প্রবিলীয়ন্তি কামাঃ ॥২
নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্‌ ॥৩
নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যো ন চ প্রমাদাত্তপসো বাপ্যলিঙ্গাৎ।
এতৈরুপায়ৈর্যততে যস্তু বিদ্বাংস্তস্যৈষ আত্মা বিশতে ব্রহ্মধাম ॥৪
সংপ্রাপ্যৈনমৃষয়ো জ্ঞানতৃপ্তাঃ কৃতাত্মানো বীতরাগাঃ প্রশান্তাঃ।
তে সর্ব্বগং সর্ব্বতঃ প্রাপ্য ধীরা যুক্তাত্মানঃ সর্ব্বমেবাবিশন্তি ॥৫
বেদান্তবিজ্ঞান-সুনিশ্চিতার্থাঃ সংন্যাসযোগাদ্‌ যতয়ঃ শুদ্ধসত্ত্বাঃ।
তে ব্রহ্মলোকেষু পরান্তকালে পরামৃতাঃ পরিমুচ্যন্তি সর্ব্বে ॥৬
গতাঃ কলাঃ পঞ্চদশ প্রতিষ্ঠা দেবাশ্চ সর্ব্বে প্রতিদেবতাসু।
কর্ম্মাণি বিজ্ঞানময়শ্চ আত্মা পরেঽব্যয়ে সর্ব্ব একীভবন্তি ॥৭
যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রেঽস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়।
তথা বিদ্বান্নামরূপাদ্বিমুক্তঃ পরাৎপরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্‌ ॥৮
স যো হ বৈ তৎপরমং ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি নাস্যাব্রহ্মবিৎকুলে ভবতি
তরতি শোকং তরতি পাপ্মানং গুহাগ্রন্থিভ্যো বিমুক্তোঽমৃতো ভবতি ॥৯
তদেতদৃচাঽভ্যুক্তম্‌।
ক্রিয়াবন্তঃ শ্রোত্রিয়া ব্রহ্মনিষ্ঠাঃ স্বয়ং জুহ্বত একর্ষিং শ্রদ্ধয়ন্তঃ।
তেষামেবৈতাং ব্রহ্মবিদ্যাং বদেত শিরোব্রতং বিধিবদ্‌ যৈস্তু চীর্ণম্‌ ॥১০

তদেতৎ সত্যমৃষিরঙ্গিরাঃ পুরোবাচ নৈতদচীর্ণব্রতোঽধীতে
নমঃ পরমঋষিভ্যো নমঃ পরমঋষিভ্যঃ ॥১১

ইতি তৃতীয়-মুণ্ডকে দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ।

ওঁ ভদ্রং কর্ণেভিরিতি শান্তিঃ ॥

ইত্যথর্ববেদীয়া মুণ্ডকোপনিষৎ সমাপ্তা।

ওঁ তৎসৎ।

মুণ্ডক-উপনিষদ্।

প্রথম মুণ্ডক।

(প্রথম খণ্ড)

আমরা যেন যজনশীল ও দেবতা-স্বরূপ হইয়া কর্ণ দ্বারা কল্যাণ শ্রবণ করিতে পারি, চক্ষু দ্বারা কল্যাণ দর্শন করিতে পারি। আমরা যেন দৃঢ়াঙ্গ স্তুতি মন্ত্রের দ্বারা স্তুতি করিতে করিতে দেবহিত আয়ু প্রাপ্ত হই।

বৃদ্ধশ্রবা ইন্দ্র আমাদিগকে স্বস্তি প্রদান করুন। বিশ্ববেদা পুষা আমাদিগকে স্বস্তি প্রদান করুন। অরিষ্টনেমি তার্ক্ষ্য আমাদিগকে স্বস্তি প্রদান করুন। বৃহস্পতি আমাদিগকে স্বস্তি প্রদান করুন।

ওঁ শান্তি, শান্তি, শান্তি।

১। ব্রহ্মা সকল দেবতার মধ্যে প্রথম দেবতা। তিনি এই বিশ্বের স্রষ্টা ও রক্ষক। তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র অথর্ববকে সর্ব্ব বিদ্যার মূল বিদ্যা (অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যা) শিক্ষা দিয়াছিলেন।

২। ব্রহ্মা অথর্ববকে যে ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা দিয়াছিলেন, অথর্ব্ব তাহা অঙ্গিরকে শিক্ষা দিয়াছিলেন। অঙ্গির ঐ বিদ্যা সত্যবহ ভারদ্বাজকে শিক্ষা দিয়াছিলেন। ভারদ্বাজ অঙ্গিরসকে পরা ও অপরা বিদ্যা শিক্ষা দিয়াছিলেন।

৩। প্রধান গৃহস্থ শৌনক অঙ্গিরসের নিকট বিধিবৎ উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—হে ভগবন্! কি জানিলে সকল বিষয় জানা যায়?

৪। অঙ্গিরস শৌনককে বলিলেন—ব্রহ্মবিদ্ ব্যক্তিরা দুই প্রকার বিদ্যার কথা উল্লেখ করিয়া থাকেন, যথাঃ—পরা ও অপরা (পরা অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ ও অপরা অর্থাৎ অশ্রেষ্ঠ।)

৫। ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ ও অথর্ব্ববেদ, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ ও নিরুক্ত, ছন্দঃ, জ্যোতিষ এইগুলি হইল অপরা বিদ্যা। আর যাহার দ্বারা অবিনাশী অক্ষর পুরুষকে অবগত হওয়া যায় সেই পরা বিদ্যা।

৬। যাহা দেখা যায় না, গ্রহণ করা যায় না, যাহার গোত্র নাই, বর্ণ নাই, চক্ষু নাই, কর্ণ নাই, হস্ত নাই, পদ নাই, যিনি নিত্য বিভু সর্ব্বব্যাপী সুসূক্ষ্ম অব্যয়, তাঁহাকেই ধীর ব্যক্তিরা সর্ব্বজীবের—সর্ব্বভূতের মুল কারণ বলিয়া জানেন।

৭। ঊর্ণনাভ অর্থাৎ মাকড়সা যেরূপ ঊর্ণা পরিত্যাগ করে ও পুনরায় উহা গ্রহণ করে, পৃথিবীতে যেরূপ ওষধি জন্মে, জীবিত পুরুষ হইতে যেমন কেশ লোমাদি জন্মে, তদ্রূপ এই অবিনাশী পুরুষ হইতে সমস্ত বিশ্ব উদ্ভূত হয়।

৮। তপস্যা দ্বারা ব্রহ্ম উপচিত হন। তৎপরে অন্ন উৎপন্ন হয়, অন্ন হইতে প্রাণ, মন, সত্য, সপ্তলোক এবং জীবের কর্ম্মফল উৎপন্ন হয়।

৯। যিনি সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্ববিদ্য এবং যাঁহার তপস্যা জ্ঞানময় তাঁহা হইতেই হিরণ্যগর্ভ, নাম, রূপ ও অন্ন উৎপন্ন হয়।

প্রথম মুণ্ডক।

(দ্বিতীয় খণ্ড)

১। ইহাই সত্য যে মহর্ষিরা বেদ-মন্ত্রে যে সমস্ত যজ্ঞরূপ কর্ম্ম দৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহাই ত্রেতাযুগে বহুভাবে বিস্তৃত হইয়াছিল। হে সত্যকামগণ! তোমরা সেই সমস্ত যজ্ঞ আচরণ কর, সাধু কর্ম্মফল দ্বারা যে লোক প্রাপ্ত হওয়া যায় তথায় যাইবার ইহাই পন্থা।

২। যখন অগ্নি সমিধ-প্রদানে প্রজ্বলিত হয় এবং তাহার অর্চ্চি লেলায়মান হয় তখন তাহাতে শ্রদ্ধার সহিত দুইবার সঘৃত আহুতি প্রদান করিতে হইবে।

৩। যাহার অগ্নিহোত্র দর্শ ও পৌর্ণমাস যাগ দ্বারা, চাতুর্ম্মাস্য যাগ দ্বারা, ও আগ্রয়ণ যাগ দ্বারা বর্জ্জিত এবং যাহার অগ্নিহোত্র অতিথি-বর্জ্জিত হয় এবং

যাহাতে বৈশ্বদেব যাগ অনুষ্ঠিত হয় না এবং যাহা বিধিপূর্ব্বক সম্পন্ন হয় না; সেই অগ্নিহোত্র সপ্তলোক ধ্বংস করে।

৪। কালী, করালী, মনোজবা, সুলোহিতা, সুধূম্রবর্ণা, স্ফুলিঙ্গিনী, বিশ্বরুচিদেবী, অগ্নির লেলায়মান এই সপ্ত জিহ্বা।

৫। যখন এই সপ্ত-জিহ্ব অগ্নি প্রজ্বলিত হয়, তাহাতে যদি যথাকালে আহুতি প্রদান করা যায়, তবে তাহারা সূর্য্যরশ্মিরূপে যজ্ঞরত ব্যক্তিকে যে স্থানে দেবতাদিগের অধিপতি বাস করেন সেই দেববাঞ্ছিত স্থানে লইয়া যায়।

৬। উজ্জ্বল আহুতিরা তাহাকে বলে—এস, এস এবং সূর্য্যরশ্মি দ্বারা যজমানকে লইয়া যায়। সেই সময় তাহারা যজমানকে প্রিয় বাক্য বলে ও অর্চ্চনা করে এবং বলে ইহাই তোমার ঈপ্সিত ব্রহ্মলোক যাহা সুকৃতি দ্বারা প্রাপ্ত হইয়াছ।

৭। এই অষ্টাদশ অবর যজ্ঞরূপ তরণী অদৃঢ়। মূঢ় ব্যক্তিরাই ইহাকে শ্রেয় বলিয়া অভিনন্দন করে এবং পুনঃ পুনঃ জরা মৃত্যুর অধীন হয়।

৮। মূঢ় ব্যক্তিরাই অন্ধকারের মধ্যে থাকিয়া আপনাদিগকে ধীর ও পণ্ডিত বিবেচনা করে এবং অন্ধ দ্বারা পরিচালিত হইয়া অন্ধেরা যেরূপ এদিক ওদিক অত্যন্ত ক্লিষ্ট হইয়া পরিভ্রমণ করে ইহাদের অবস্থাও তাদৃশ হয়।

৯। তাহারা অবিদ্যার মধ্যে বহুপ্রকারে বর্ত্তমান থাকিয়া আপনাদিগকে বালকবৎ কৃতার্থ জ্ঞান করে। কর্ম্মফলের প্রতি আসক্তি পরিত্যাগ না করিতে পারিয়া কর্ম্মিগণ আতুরবৎ হয়, এবং পুণ্য কার্য্যের ফল শেষ হইলে স্বর্গলোক হইতে পতিত হয়।

১০। যজ্ঞ এবং অন্যান্য পুণ্য কার্য্য শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া মূঢ় ব্যক্তিরা শ্রেয় কি তাহা বুঝিতে পারে না এবং স্বর্গে তাহাদের অর্জ্জিত সুকৃতির ফলভোগ করিয়া হীনলোকে প্রবেশ করে।

১১। যে সমস্ত শান্ত বিদ্বান্ তপস্যারত ব্যক্তি শ্রদ্ধাবান্ হইয়া অরণ্যে ভিক্ষাচর্য্যের দ্বারা জীবন অতিবাহিত করেন, তাহারা বিগতমোহ হইয়া সূর্য্যদ্বার দ্বারা অমৃত অব্যয় পুরুষ আত্মা যেখানে বাস করেন সেস্থানে গমন করেন।

১২। কর্ম্ম দ্বারা যে সমস্ত লোক প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহা পরীক্ষা করিয়া সমস্ত বাসনা হইতে নির্লিপ্ত হওয়াই ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য। উহা জানিবার জন্য তিনি ব্রহ্মনিষ্ঠ শ্রোত্রিয় গুরুর নিকট সমিধপাণি হইয়া গমন করিবেন।

১৩। প্রশান্তচিত্ত শমান্বিত শিষ্য গুরুর নিকট এইরূপভাবে গমন করিলে বিদ্বান্ গুরু যে ব্রহ্মের জ্ঞান দ্বারা তিনি নিত্য ও সত্য পুরুষকে প্রাপ্ত হইয়াছেন তাঁহার বিষয় ঐ শিষ্যকে উপদেশ দেন।

দ্বিতীয়-মুণ্ডক।

(প্রথম খণ্ড)

১। যেমন সুদীপ্ত পাবক হইতে সহস্র সহস্র অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হয় তদ্রূপ সেই অবিনাশী পুরুষ হইতে, হে সৌম্য! বিবিধ জীব উৎপন্ন হয় এবং তাহাতেই পুনরায় আগমন করে। ইহাই সত্য।

২। সেই দিব্য পুরুষের মূর্ত্তি নাই, তিনি ভিতরেও আছেন, বাহিরেও আছেন। তিনি অজ, তাঁহার প্রাণ কিংবা মন নাই। তিনি নির্ম্মল, তিনি অবিনাশী পুরুষ সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা হইতেও শ্রেষ্ঠতর।

৩। তাঁহা হইতেই প্রাণ, মন, সর্ব্ব ইন্দ্রিয়, আকাশ, বায়ু, জ্যোতিঃ, জল, সর্ব্বাধাররূপা পৃথিবী উৎপন্ন হয়।

৪। অগ্নি তাঁহার মস্তক-স্বরূপ, চন্দ্রসূর্য্য তাঁহার চক্ষুঃস্বরূপ, দিক্ তাঁহার কর্ণ-স্বরূপ, প্রকাশিত বেদ তাঁহার বাক্যস্বরূপ। বায়ু তাঁহার প্রাণস্বরূপ, বিশ্ব তাঁহার হৃদয়স্বরূপ, তাঁহার পদ হইতেই পৃথিবী উৎপন্ন হইয়াছে। তিনি সর্ব্ব-ভূতের অন্তরাত্মা।

৫। তাঁহা হইতে অগ্নি উৎপন্ন হয়, সূর্য্য উহার সমিধ। চন্দ্র হইতে বৃষ্টি উৎপন্ন হয়, পৃথিবীতে ওষধি জন্মে, পুরুষ যোষিদ্‌দিগেতে রেতঃ সিঞ্চন করে। এইরূপে পুরুষ হইতে বহু প্রজা উৎপন্ন হয়।

৬। তাঁহা হইতেই ঋক্, সাম, যজুর্ব্বেদ উৎপন্ন হয়। তাঁহা হইতেই দীক্ষা, যজ্ঞ, পশুযাগ, দক্ষিণা, সংবৎসর, যজমান, সর্ব্বলোক উৎপন্ন হয়। তাঁহাতে থাকিয়াই চন্দ্র এবং সূর্য্য লোককে উত্তাপ দেন।

৭। তাঁহা হইতেই সমস্ত দেবতা উদ্ভূত হন। তাঁহা হইতেই সাধ্য, মনুষ্যগণ, পশুপক্ষিগণ, প্রাণ এবং অপান, ব্রীহি ও যব, তপস্যা, সত্য, ব্রহ্মচর্য্য এবং বিধি উদ্ভূত হয়।

৮। তাঁহা হইতেই সপ্তপ্রাণ, সপ্তঅর্চ্চি, সপ্তসমিধ, সপ্তহোম, সপ্তলোক উদ্ভূত হয়। এই সপ্তলোকেই প্রাণ সমুদায় বিচরণ করে এবং হৃদয়ে সপ্ত সপ্ত ভাবে নিহিত থাকে।

৯। সমুদ্র ও পর্ব্বত তাঁহা হইতেই উদ্ভূত হয়। সর্ব্বপ্রকার নদী তাঁহা হইতে প্রবাহিত হয়। তাঁহা হইতে সমস্ত ওষধি উদ্ভূত হয়। তাঁহা হইতে রস উদ্ভূত হয়, যাহাদ্বারা অন্তরাত্মা ভূতাদির সহিত একত্র থাকে।

১০। এই পুরুষই সমস্ত, ইনি কর্ম্ম, তপস্যা, ব্রহ্ম, পরামৃত। যিনি ইঁহাকে হৃদয়ে অবস্থিত জানেন, তিনি, হে সৌম্য! অবিদ্যা-গ্রন্থি বিকীরণ করেন।

দ্বিতীয়-মুণ্ডক।

(দ্বিতীয় খণ্ড)

১। ইনি আবিঃ অর্থাৎ প্রকাশমান, সন্নিহিত অর্থাৎ হৃদয়ে সম্যগ্‌রূপে স্থিত আছেন, এইজন্য ইঁহার নাম গুহাচর অর্থাৎ হৃদয়-বিহারী। ইনি মহৎপদ অর্থাৎ ইনিই সর্ব্বপদার্থের আস্পদ-স্বরূপ। ইনিই সর্ব্ব বস্তুর কেন্দ্র-স্বরূপ। যাহারা গমন করে, যাহারা প্রাণন করে, যাহারা নিমেষ করে, সৎ এবং অসৎ সকলেই ইঁহাতে কেন্দ্রীভূত আছে। ইঁহাকে বরেন্দ্র বলিয়া, বরিষ্ঠ বলিয়া, প্রজাদিগের লৌকিক বিজ্ঞান হইতেও শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানিও।

২। যাঁহা তেজোময়, যাঁহা অণু হইতে অণু, যাঁহাতে লোক-সমুদয় এবং তদ্বাসিগণ প্রতিষ্ঠিত আছে, তাঁহাকেই অবিনাশী ব্রহ্ম বলিয়া জানিবা। তিনিই প্রাণ, তিনিই বাক্য, তিনিই মন, তিনিই সত্য, তিনিই অমৃত। হে সৌম্য! তিনি তোমার লক্ষ্যস্থানীয়, তাঁহাকেই বাণবিদ্ধ কর।

৩। মহা অস্ত্র উপনিষদ্‌রূপ ধনুক গ্রহণ করিয়া ও তাহাতে অভিধ্যানরূপ শাণিত শর সংযুক্ত করিয়া সন্ধান কর। তৎপরে ভক্তিপূর্ণচিত্তে ঐ ধনুর আকর্ষণ করিয়া সেই অবিনাশী পুরুষের প্রতি লক্ষ্য করিয়া তাহাতে বাণবিদ্ধ কর।

৪। প্রণবই ধনুঃস্বরূপ, আত্মা শরস্বরূপ, ব্রহ্ম লক্ষ্যস্বরূপ। অপ্রমত্ত হইয়া, ইঁহার প্রতি লক্ষ্য করিতে হইবে। শর যখন লক্ষ্য বস্তুর সহিত এক হইয়া যাইবে, তখনই লক্ষ্য বস্তু বিদ্ধ হয়। ব্রহ্মপ্রার্থীর নিয়মও ঐরূপ।

৫। তাঁহাতে আকাশ, পৃথিবী, অন্তরীক্ষ, ওতঃপ্রোতভাবে যুক্ত রহিয়াছে। তাঁহাতেই মন এবং ইন্দ্রিয় সকল ঐরূপভাবে রহিয়াছে। অন্য কথা ছাড়িয়া দিয়া তাঁহাকেই আত্মা বলিয়া জানিবা। তিনিই অমৃতত্বের সেতু।

৬। যেস্থানে সমস্ত নাড়ী যাইয়া সংযুক্ত হইয়াছে তিনি বহুপ্রকার হইয়াও সেইস্থানে বিচরণ করেন। রথনাভিতে অরা (চাকার পাখি) যেরূপ সংযুক্ত থাকে, ইহাও সেইরূপ। আত্মাকে ওঙ্কারস্বরূপ ধ্যান কর। তোমার মঙ্গল হউক, তুমি যেন অন্ধকাররূপ সমুদ্র পার হইতে পার।

৭। যিনি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্ববিৎ, এই বিশ্বে যিনি মহামহিমান্বিত, তিনি হৃদয়-নামক দিব্য ব্রহ্মপুরে আকাশ মধ্যে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন। তিনি মনোময়

এবং ইন্দ্রিয়দিগের নেতা। তিনি অন্নে প্রতিষ্ঠিত আছেন এবং হৃদয়ের সন্নিধানে আছেন। ধীর ব্যক্তিদের এইরূপ জ্ঞান হইলে, যে ব্রহ্ম আনন্দময়, অমৃতময় এবং প্রকাশময়, তাহারা তাঁহাকে দেখিতে পান।

৮। সেই পরাবরের অর্থাৎ কার্য্যকারণরূপ ব্রহ্মের দেখা পাইলে হৃদয়ের গ্রন্থির ভেদ হয়, সর্ব্বসংশয়ের ছেদ হয়, সর্ব্বকর্ম্ম নষ্ট হয়।

৯। হিরণ্ময় কোষে বিরজ (অনুরাগ-শূন্য) এবং নিষ্কল (অংশরহিত) ব্রহ্ম প্রতিষ্ঠিত আছেন। তিনি শুভ্র, তিনি জ্যোতিষের জ্যোতিঃ, যাঁহারা আত্মবিৎ, তাঁহারা তাঁহাকে এইভাবেই জানিয়া থাকেন।

১০। সেখানে সূর্য্য প্রকাশিত হন না, সেখানে চন্দ্র তারকাও নাই, বিদ্যুৎও নাই, অগ্নিও নাই। তিনি সকলকেই জ্যোতিঃ প্রদান করিয়া থাকেন, তাঁহার জ্যোতিতেই সকলে জ্যোতিষ্মান্ হয়।

১১। অমৃতস্বরূপ ব্রহ্ম সম্মুখে, পশ্চাতে, দক্ষিণে এবং বামে, উর্দ্ধে এবং নিম্নে। এই বিশ্বই ব্রহ্মময়, তিনিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

তৃতীয়-মুণ্ডক।

প্রথম খণ্ড।

১। দুইটী পক্ষী, যাহারা পরস্পর ঘনিষ্ঠভাবে পরস্পরের বন্ধু, তাহারা একই বৃক্ষে পরিষক্ত অর্থাৎ ঘনিষ্ঠভাবে সংলগ্ন থাকে। তাহাদের মধ্যে একটী সুস্বাদু ফল ভক্ষণ করে, অন্যটী কেবল অনাহারে থাকিয়া দৃষ্টি করে।

২। ঐ একই বৃক্ষে পুরুষ অনীশ্বরত্বহেতু মোহমুগ্ধ হইয়া শোকগ্রস্ত হয় এবং দুঃখে নিমগ্ন থাকে; কিন্তু যখন সে অন্যটীকে ঈশ্বররূপে জানিতে পারে এবং তাহাকে জুষ্ট (হৃষ্টচিত্ত) দর্শন করে এবং তাহার মহিমা অবলোকন করে, তখন সে বীতশোক হয়।

৩। যখন দ্রষ্টা জ্যোতির্ম্ময় কর্ত্তা হিরণ্যগর্ভকে দেখে এবং তাঁহাকে ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন পুরুষ বলিয়া অবগত হয়, তখন সেই ব্যক্তি বিদ্বান্ এবং পাপপুণ্য পরিত্যাগ করিয়া নিরঞ্জন হইয়া পরম সাম্য প্রাপ্ত হয়।

৪। ইনি সর্ব্বভূতে প্রাণরূপে প্রকাশিত আছেন এবং যিনি ইহা জানেন তিনি যথার্থ বিদ্বান। অতিবাদী অর্থাৎ যে কেবল বাক্য বলে সে বিদ্বান্ নহে। যথার্থ বিদ্বান আত্মায় ক্রীড়া করেন, আত্মায় আনন্দলাভ করেন এবং যথার্থ ক্রিয়াবান ব্যক্তি ব্রহ্মবিদ্‌দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

৫। সত্য, তপস্যা, সম্যগ্‌জ্ঞান ও ব্রহ্মচর্য্যের দ্বারা এই আত্মা সর্ব্বকালে লভ্য। ক্ষীণদোষ যতিগণ ইহাকে শরীরের মধ্যে সহস্রার পদ্মে জ্যোতির্ম্ময়রূপে দেখিয়া থাকেন।

৬। এই বিশ্বে সত্যেরই জয় হয়, অসত্যের জয় হয় না। সত্যের দ্বারাই দেবযান* পথ প্রস্তুত হয়। আপ্তকাম মহর্ষিগণ ঐ পথ দিয়াই সত্যের সেই পরম নিধান স্থানে গমন করেন।

৭। তিনি বৃহৎ, তিনি দিব্য, অচিন্ত্যরূপ, সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতররূপে প্রকাশিত হন। তিনি দূর হইতে সুদূরে অথচ তিনি নিকটে। যাঁহারা তাঁহাকে ইহলোকেই দেখিতে পান তাঁহাদের হৃদয়াভ্যন্তরে তিনি নিহিত আছেন।

৮। চক্ষু দ্বারা তাঁহাকে দেখা যায় না, বাক্যের দ্বারা তাঁহার কথা প্রকাশ করা যায় না, অন্য কোন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা তাঁহার গ্রহণ বা বর্ণন হয় না। তপস্যা বা কর্ম্মের দ্বারা তাঁহাকে পাওয়া যায় না, জ্ঞান প্রসাদের দ্বারা যখন মানব বিশুদ্ধসত্ত্ব হয় তখনই ধ্যান করিতে করিতে তাঁহাকে নিষ্কলরূপে দেখিতে পাওয়া যায়।

৯। এই অণু-প্রমাণ আত্মাকে চেতঃ দ্বারা জানিতে হইবে। যে চিত্তে প্রাণ পঞ্চধা হইয়া প্রবেশ করিয়াছে সেই চিত্তের দ্বারা এই অণুপ্রমাণ আত্মাকে জানিতে হইবে। ইন্দ্রিয়ের দ্বারা চিত্ত ব্যাপ্ত রহিয়াছে। চিত্ত বিশুদ্ধ হইলেই আত্মা প্রকাশিত হন। বিশুদ্ধসত্ত্ব ব্যক্তি মনের দ্বারা যাহা সংকল্প করেন এবং যে সমস্ত কামনা করেন সেই সেই অবস্থা তিনি জয় করেন এবং সেই সেই কামনা তিনি প্রাপ্ত হন। এই জন্য ভূতিকাম ব্যক্তির আত্মজ্ঞের অর্চনা করিতে হয়।

তৃতীয় মুণ্ডক

দ্বিতীয় খণ্ড।

১। ব্রহ্মের পরম ধাম যাহাতে এই বিশ্ব নিহিত থাকিয়া উজ্জ্বলরূপে প্রকাশিত হইতেছে, আত্মজ্ঞ ব্যক্তি সেই ব্রহ্মধাম অবগত আছেন। ধীর ব্যক্তিরা নিষ্কাম হইয়া এই পরম পুরুষের উপাসনা করেন এবং তজ্জন্য তাঁহাদের পুনর্ব্বার জন্ম হয় না।

২। যাঁহারা মনে কামনা করেন তাঁহাদের সেই কামনা অনুসারে পুনর্ব্বার জন্ম হয়। পর্য্যাপ্তকাম ব্যক্তির এবং আত্মজ্ঞ ব্যক্তির এই সংসারেই সমস্ত কামনা ধ্বংস হইয়া যায়।

৩। বেদাধ্যয়নের দ্বারা এই আত্মা লভ্য নহেন। মেধা কিংবা বহু বিদ্যার দ্বারাও লভ্য নহেন। এই আত্মা যাঁহাকে বরণ করেন তাঁহার দ্বারাই তিনি লভ্য হন। আত্মা তাঁহাকে তাঁহার নিজের শরীররূপে বরণ করেন।

৪। বলহীনের দ্বারা এই আত্মা লভ্য নহেন। প্রমত্ত ব্যক্তিগণ ইঁহাকে প্রাপ্ত হয় না। তপস্যার অভাব হইলে ইঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। যে আত্মা এই উপায়গুলির দ্বারা অর্থাৎ বল, একাগ্রতা, তপস্যার দ্বারা তাঁহাকে পাইবার চেষ্টা করে সেই আত্মা ব্রহ্মধামে প্রবেশ করেন।

৫। ইঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া মহর্ষিগণ জ্ঞানতৃপ্ত, কৃতাত্মা, বীতরাগ ও প্রশান্ত হয়েন। যুক্তাত্মা ধীর ব্যক্তিরা সেই সর্ব্বব্যাপী পুরুষকে সর্ব্বত্র প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাতেই প্রবেশ করেন।

৬। বেদান্ত জনিত বিজ্ঞানের দ্বারা বিজ্ঞেয় বিষয়ে সুনিশ্চিত হইয়া, এবং সন্ন্যাস যোগ দ্বারা শুদ্ধসত্ত্ব হইয়া যতিগণ পরামৃতত্ব লাভ করিয়া ব্রহ্মলোকাদিতে পরান্তকালে পরিমুক্ত হয়েন।

৭। তাহাদের পঞ্চদশ কলা তাহাদের স্বীয় স্বীয় ভূতে প্রবেশ করে। তাহাদের ইন্দ্রিয় সকল তদভিমানী দেবতায় প্রবেশ করে। বিজ্ঞানময় আত্মা ও কর্ম্ম পরাব্যয়ের সহিত এক হইয়া যায়।

৮। গমনশীল নদীসমূহ যেমন সমুদ্রে যাইয়া নাম রূপ পরিত্যাগ করিয়া অদৃশ্য হয়, বিদ্বান্ তদ্রূপ নামরূপ ত্যাগ করিয়া সেই পরাৎপর দিব্যপুরুষে গমন করেন।

৯। যিনি সেই পরমব্রহ্মকে জানেন তিনি ব্রহ্ম হন। ইঁহার কুলে কখনও অব্রহ্মবিৎ জন্মগ্রহণ করেন না। তিনি শোক ও পাপ অতিক্রম করেন এবং হৃদয়গ্রন্থি হইতে মুক্ত হইয়া অমৃতত্ব প্রাপ্ত হন।

১০। ইহাই নিম্নোক্ত ঋকের দ্বারা উক্ত হইয়াছে। যাঁহারা ক্রিয়াবান্, শ্রোত্রিয় এবং ব্রহ্মনিষ্ঠ এবং স্বয়ং শ্রদ্ধার সহিত একর্ষি নামক অগ্নিতে আহুতি প্রদান করেন এবং যাঁহাদিগের দ্বারা শিরোব্রত বিধিবৎ সম্পন্ন হইয়াছে, তাঁহাদিগকেই এই ব্রহ্মবিদ্যা বলিতে হইবে।

১১। এই উপনিষদুক্ত সত্য, পূর্ব্বে ঋষি অঙ্গিরা প্রকাশ করিয়াছিলেন। অচীর্ণ ব্যক্তি ইহা অধ্যয়ন করিবে না। পরমঋষিদিগকে নমস্কার, পরমঋষিদিগকে নমস্কার।

ইতি মুণ্ডকোপনিষদে

বঙ্গানুবাদ শেষ।

ইংরাজি অনুবাদ।

THE INTRODUCTORY SANTI (PEACE).

1. May We, by performing our duties, hear what is good through our ears, see what is good through our eyes like gods. May we live lives beneficial to gods by singing inflexible hymns of praise.

2. May Briddhasrava Indra grant us swasti (well-being) ; may Viswaveda Pusha grant us well-being ; may Arishtanemi Tarkshya grant us well-being ; may Vrihashpati grant us well-being !

Om Santi (Peace), Santi, Santi.

First Mundaka

FIRST KHANDA

1. Of the Devas, BRAHMA was the first to be born. He was the maker of the Universe and its protector. To ATHARVA, his eldest son, he revealed the Science of Brahma, the basis of all Sciences.

2 Whatever BRAHMA revealed to ATHARVA the latter revealed to ANGIR, who in his turn revealed it to SATYAVAHA of the Bharadwaj Gotra, who did the same to ANGIRAS.

3. SAUNAKA, a great house-holder, approached ANGIRAS according to the prescribed rites and asked him. "Sir, what is that by knowing which everything becomes known ?"

4 ANGIRAS said to SAUNAKA ; "The knowers of Brahman have laid down that two kinds of Science are to be learnt—the Science superior and the Science inferior.

5. The Inferior Science comprises RIG-VEDA, YAJUR-VEDA, SAMA VEDA, ATHARVA-VEDA, Siksha (phonetics), Kalpa (ceremonial), Vyakarana (grammar) Nirukta (etymology), Chhandas (metre) and Jyotisha (astronomy). The superior Science is that by which (Akshara) the Imperishable is comprehended "

6 (The teacher now gives some idea of the Imperishable.)

That which can not be seen or seized, that which has no family or Varna, nor eyes, nor ears, nor hands, nor feet, that which is eternal, manifold, omnipresent, extremely subtle, imperishable, that which the wise regard as the source of all beings.

7. As the Spider sends forth and draws in its thread, as plants grow on earth, as hairs grow on the head and the body of a living person, so everything springs from the Imperishable.

8. By penance Brahman becomes filled with desire for procreation, and hence matter (food) is produced ; from matter breath, mind, truth, the Seven Worlds and the eternal results which attach to works (performed by men).

9. From him the causal Brahman, who is omniscient both generally and particularly, whose penance consists of knowledge, springs the effect-Brahman, name, form and matter (food).

(To be Continued.)

পার কি আনিতে কভু লহরীর মালা ?

লেখক—শ্রীকেদারনাথ মুখোপাধ্যায় ।

দ্বৈত কি অদ্বৈত, তাতে কিবা আসে যায় ?
মাতা পিতা ভেদ বটে নয়নেতে হয়,
জনম প্রথার কাছে পৃথক কোথায় ?
পুরুষ প্রকৃতি খেলা সেই সৃষ্টিময় ।

অনলে দাহিকা, সলিলে তরঙ্গ, আহা !
ভাবনা, কিবা সে অব্যক্ত মাধুরীময় !
তরঙ্গ ধরিতে যাও, জল যে গো তাহা,
অগ্নি বল যারে, তার দাহিকা পোড়ায় ॥

পার কি আনিতে কভু লহরীর মালা,
তারে করি সযতনে সলিল-বিহীন ?
দাহিকা আন না দেখি, বিনা অগ্নিকণা,
তখন দেখিব বুঝে, মানব প্রবীণ ॥

সুবর্ণের অলঙ্কার কত শত আছে,
বিহঙ্গ কুসুম ছাঁদে ধরি ভিন্নরূপ ।
আন দেখি একবার অই গুলি কাছে,
বর্জ্জিত করিয়া সোণা, দেখি সে কিরূপ ?

তিনি যিনি চিদানন্দ,—নাশ ও বিনাশ ;
অনাদি অনন্ত তেঁই তাঁহারই নাম ।
দু'য়ে এক একে দুই, কাজ কি প্রকাশ ?
ঘরে বনে যেথা রও গাও তাঁর গান ॥

হরি হরি বলি হও হরিষ-বদন,
হর হর চিন্তা করি তাপ দুখ হর ।
ব্রহ্মতত্ত্বে মতি রাখি গোঁয়াও জীবন,
আত্মাশক্তি ভাবি সবে হও অগ্রসর ॥

কত কোটি কল্প ভ্রমি' পায় কিনা তাঁয়,
তবুও পাবার প্রথা ভক্তে খালি কয় ।
কহিতে কতই রুচি ব্যক্ত হয়ে যায়,
যা খুসী সাপটি ধর প্রাণ যাঁরে চায় ॥

শ্রীহরিঃ

(১৮৪৫ সালের ২০ আইন্ মতে রেজেষ্টীকৃত)

হিন্দু-পত্রিকা

৩১শ বর্ষ, ৩৬শ খণ্ড ১২শ সংখ্যা।	চৈত্র।	১৩৩১ সাল। ১৮৪৬ শকাব্দাঃ

বিশ্ব-সৃষ্টি।

লেখক —শ্রীগোপালচন্দ্র কবিকুসুম।

.. জানে কখন্ কোন্ দিন, দূর-ব্যাপ্ত দীপ্ত নীহারিকা,
নিবিড় গভীর অন্ধকারে জ্বালাইল স্বর্গ-দীপ-শিখা।
অকস্মাৎ উঠিল জাগিয়া দীর্ঘ দীর্ণ চিন্তার প্রান্তরে
সুপ্রাচীন নিদ্রিত অতীত, স্নেহপূর্ণ মধুর মর্ম্মরে।
অভিনব প্রেম-মূর্চ্ছনায় পরিপূর্ণ নীরব সঙ্গীত
দিকে দিকে গুঞ্জরিল সুখে, বিশ্ব-যন্ত্রে করুণ ললিত।
জড়ত্বের অন্তিম রেখায় অনুভূতি, অনন্ত চেতনা,
বিধাতার বিরাট্ চরণে নিবেদিল মর্ম্মের বেদনা।
মহাপ্রাণ সিন্ধুর হৃদয়ে উচ্ছ্বসিল নির্ম্মল বাসনা,
আঁকি দিল প্রকৃতির পটে, লক্ষ কোটি মদির কামনা।

সংসারের সৌন্দর্য্য-শিয়রে স্ফুরজ্জিল আশার স্বপন,
বিহ্বলিত প্রেমাবেশে সুখে ধরণীর সহস্র চুম্বন।
সে অবধি চির বিরাজিত বিশ্বদৃশ্য, রহস্য আধারে,
তরঙ্গিত নীল নীরনিধি তাহারে বেড়িছে চারিধারে।
গূঢ়তম ভূমার পাথারে কে করিবে সমস্যার সীমা?
বিশ্বের বিচিত্র চিত্রপটে সুশোভিত ধাতার মহিমা!!

ত্রিদিব।

(১)

জাগে অনাহত চিন্ময়ী চেতনা
তটিনীর কূলে নির্ঝর পাশে!
খেলে দেববালা পীত রৌদ্রতলে,
মন্দাকিনী ধীরে বহিয়া আসে।

(২)

স্বরগের চারু কলপ লতিকা
শোভে নীলাকাশ তাহার পরে।
অমরাবালার সুধা-কণ্ঠ-ধারা
সঞ্চরিছে ধীর সমীর-ভরে।

(৩)

স্নিগ্ধ প্রকৃতি কনকাঞ্চল
নন্দনবনে মৃদুল দোলে;—
সরসী সরিৎ সিন্ধু তড়াগে—
অপরূপ জ্যোতিঃ চির উথলে।

(৪)

ত্রিদিব-সঙ্গীত নীহারিকা-স্রোতে
হেম-বিহগের কূজনে জাগে,
ভাসে চিদাকাশে পরমাণু-রাশি—
কারণ-প্রতিমা প্রণব-বাগে।

(৫)

হিয়ার মাঝারে গুমরি' গুমরি'
মরে না নিয়ত কামনা কত।
শিশির-সিক্ত যুথিকার মত—
হেসে উঠে ধীরে বাসনা শত।

(৬)

কি জানি কেমন স্বপন-সঙ্গীতে
কোন্ অচিন্তিত জগত-পানে।
প্রদোষের শেষে সান্দ্র আঁধারে,
অনুসরে প্রাণ, ব্যাকুল তানে।

(৭)

দূর স্মৃতি পটে করুণতা-মাখা—
দেখা যায় হেন নূতন দেশ!
নিরমল প্রেম-পরিমল-মাখা,—
নাহি পাপ-তাপ-কলুষ-লেশ!!

ভক্তি-কথা।

লেখক—শ্রীআদ্যনাথ কাব্যতীর্থ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

নানা মুনির নানা মত! মনুষ্য-জীবনের উদ্দেশ্য নানাজনে নানা ব্যাখ্যা করিবেন, মীমাংসা হইবে না। কিন্তু এমন একটী কথা আছে, যেখানে সমস্ত বিরোধ নিরস্ত হইবে। কথাটী এই যে, সুখই মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য, ইহা বলিলে আর আপত্তি নাই। তবে সুখ এই আছে, পরেই দুঃখ, এমত সুখ চাই না। বেশ কথা! তবে দুঃখ-শূন্য কেবল সুখ কোথায় পাওয়া যায় তাহা কি কখনও খুঁজিয়াছ? যদি বল তাহা অসম্ভব, তোমার জ্ঞানের সীমায় তাহা অসম্ভব বটে, কিন্তু, শাস্ত্র বলিতেছেন উহা অসম্ভব নহে। যেখানে সবই সীমাবদ্ধ, সেখানে সুখও সীমাবদ্ধ। অনন্তের সহিত মিশিতে চেষ্টা কর—সেখানে

সুখও অনন্ত, সেখানে আনন্দও অনন্ত, প্রেমও অনন্ত। আমরা একজনকে ভাল বাসিয়া যতটা সুখী হই, দুইজনকে ভাল বাসিতে পারিলে তদপেক্ষা কিছু বেশী সুখী হই না কি? এইরূপে ভালবাসা বিশ্বজনে বিস্তৃত হইলে বোধ হয় অপার আনন্দ প্রাপ্ত হই। সীমা ছাড়াইয়া অসীমের দিকে গেলেই সুখ চিরস্থায়ী হইবে। ক্ষুদ্র বস্তুর সুখ দুদিনেই ফুরাইয়া যায়, পুরাতন হইয়া যায়, পরে ভাল লাগে না। জীবনের উদ্দেশ্য সম্মুখে বিদ্যমান, আদর্শ দেখিয়া কার্য্য কর। আহার, বিহার, নিদ্রা, কলহ, মৃত্যু এই কি কেবল এই মনুষ্য-জীবনের পরিণাম? এতাদৃশ দুর্লভ জীবনের অবশ্যই মহান্ উদ্দেশ্য আছে।

উদ্দেশ্য সাধনের সামর্থ্য না থাকে, দীনবন্ধু বলে ডাক, ব্যাকুল হয়ে প্রাণ খুলে কাঁদ, দেখিবে, তিনি এসে তোমার হাত ধরে পথ দেখাইয়া লইয়া যাইবেন। তবে আর ভয় কি আছে? নিজেকে সর্ব্বদা পাপী মনে করিও না, ভাবিতে ভাবিতে পাপময় জীবন বোধ হইবে। সিংহ-শাবক হইয়া মূষিক-শাবকবৎ ব্যবহার কেন করিতেছ? তুমি অমৃতের সন্তান হইয়া মৃত্যু-ভয়ে কেন ভীতত্রস্ত হইতেছ? কিছুই অসম্ভব মনে করিও না, সমস্ত শক্তির আশ্রয় তোমার অন্তরে আত্মারূপে বিরাজমান আছেন। তাঁহাকে তুমি জানিতে পার নাই বলিয়া সর্ব্বদা নতকায় সংকুচিত হইতেছ। না, না ওসব ভাব ত্যাগ কর, অভিনেতার বেশ ত্যাগ কর, নিজরূপ প্রকাশ কর, দেখিবে এমন কোন বস্তু নাই, যাহা তোমায় বিনাশ করিতে পারে। সারাজীবন কি ঘুমাইয়া থাকা তোমার উচিত হইতেছে? এখন উঠ, জাগ, বুঝ তুমি কে? তুমি শৃগাল-শিশু নহ, তুমি গুহাশায়ী সিংহ। কোন রমণীর মায়ায় মুগ্ধ হয়ে তুমি সুরম্য নবদ্বার গৃহে প্রবিষ্ট হইয়া, তাহাকার একেশ্বর জ্ঞানে বিমোহিত হইয়া রহিলে। ছয় জন দুর্ম্মন্ত্রীর পরামর্শে বিবিধ যাতনা পাইলে, তবু তুমি সে গৃহ ত্যাগ করিতে চাহ না। মায়ায় তোমায় বিচেতন করিয়া নিত্য সংসার-প্রবাহে নিক্ষেপ করিতেছে। তুমি দারুণ যাতনায় আর্ত্তনাদ করিতেছ।

এখন তোমার এমত অবস্থা যে, নিজে মুক্ত হইবার আর শক্তি নাই। যে অসমর্থ, সে পরের সাহায্য গ্রহণ করে। তুমি এখন দীন, সুতরাং দীন-বন্ধুর নিকট সাহায্য প্রার্থনা কর। তাঁকে তুমি যদি ভক্তিসহকারে ডাক, তাহা হইলে নিশ্চিতই তোমায় উদ্ধার করিবেন। তিনি ভক্তপ্রিয়, ভক্ত তাঁহার প্রিয়। তিনি নিজ পত্নী শ্রীকে এমন কি নিজেকেও তত আদর করেন না, যতটা ভক্তকে আদর করেন। ভক্তে বিষ দিলেও তিনি খান, অভক্তে সুধা

দিলেও শুধান না। তিনি ভক্তের নিকট বাঞ্ছাকল্পতরু। তিনি ভক্ত-বাঞ্ছা পূরণার্থ নন্দের বাধা নিজ মস্তকে বহন করিয়াছিলেন। যে, যেভাবে তাঁকে ডাকে, তিনি সেইভাবে তাহাকে দেখা দেন। এমত সুযোগ থাকিতে তোমার শঙ্কা কি? তুমি নিজ কর্ম্মদোষেই কষ্ট পাইয়াছ ও পাইতেছ, তিনি কাহাকেও কষ্ট দেন না। তিনি জীবন-মরণের সঙ্গী, তিনি জীবন-সর্ব্বস্ব, তিনি অকারণ বন্ধু। তাঁকে ভুলিয়া যারা তুচ্ছ বিষয়-সুখে বারংবার কষ্ট পায় তাহাদের অপেক্ষা হতভাগ্য আর কেহই নাই। যিনি কার্য্যরূপে, কারণরূপে, ব্রহ্মাণ্ডরূপে বিরাজমান। যাঁহার বিভায় বিভাকর দীপ্তি পায়, যাঁর ইচ্ছায় জগৎ-জীবন সদা প্রবাহিত, যাঁর ইচ্ছায় জীবন তুল্য জীবন সর্ব্বত্র বিদ্যমান, যাঁর ইচ্ছায় শূন্যপথে নিজ নিজ কক্ষে সৌরজগৎ প্রত্যাবর্ত্তিত হইতেছে, কে তাঁহার মহিমা নির্ণয় করিতে পারে?

আবার তিনিই পতিতোদ্ধারের জন্য এবং প্রিয়া-ঋণ-পরিশোধের জন্য তপ্ত-কাঞ্চনবরণবপু শচীমাতার জঠর-আকাশে অকলঙ্ক নদিয়ার চাঁদ পূর্ণরূপে অবতীর্ণ হইলেন। মরি মরি! কি রূপ-মাধুরী! প্রেম বিগলিত সদা দুনয়ন, যেন শ্রাবণের বারিধর। তিনি দ্বারে দ্বারে যেচে যেচে হরিনামামৃত-মহৌষধ বিতরণ করিলেন। তখন সে ঔষধ সবাই পান করিল না। তবে ভগবানের আর করুণার অবধি কি? যে নাম ভব-বিরিঞ্চি-প্রভৃতি দেবগণ, নারদাদি ঋষিগণ সর্ব্বদা গান করেন, যাহা বৈকুণ্ঠে গোপনে ছিল, সেই হরিনাম-মহামন্ত্র, ভগবান্ পতিতোদ্ধারের জন্য স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়া জগতে প্রচার করিলেন। যে মন্ত্র-বীজ হৃদয়ক্ষেত্রে রোপণ করিয়া তাহাতে ভক্তিবারি সেচন করিলে, তাহা হইতে যে হরিভক্তি-কল্পলতিকা জন্মিবে, তাহাতে যে অমৃত-ফল ফলিবে, তাহা যে খাইবে, তাহার আর কখনও যম-যাতনা ভোগ করিতে হইবে না। পতিত-জনের উদ্ধারের কত সহজ উপায় ভগবান দেখাইয়া দিলেন। নাম জপিতে জপিতে গাহিতে গাহিতে যাবতীয় অনর্থ দূরীভূত হইবে, চিত্ত বিশুদ্ধ হইবে। চিত্ত মলশূন্য হইলে, তখন ভগবান্ হৃদয়-আকাশে উদিত হইবেন। ভগবদ্বাক্যে বিশ্বাস স্থাপন করা চাই। নতুবা বিষ্ঠার মাছির মত বিষয়-বিষ্ঠায় নিরন্তর রত থাকিলে, মন ফিরিবে কেন? মনুষ্যের মনই সর্ব্বাংশে দোষী। কোন স্থানে ভাগবত কথা হইতেছে, তাহার অপরাংশে নর্ত্তকীর নৃত্য হইতেছে, মন ভাগবত কথা ছাড়িয়া নৃত্য-দর্শনে চলিল। মনকে বাধ্য করা অতি দুঃসাধ্য কার্য্য। মন যদি স্বীয় বশে আসে, তবে আর ভাবনা কি?

আমরা নিজের ঘরে নিজে অপরাধী। নিজের মন বশীভূত নয়, ইন্দ্রিয়গণ বশীভূত নয়, তারপর ছয়টী কামাদি দস্যু সে ঘরে বাস করে। সসর্প গৃহবাস তুল্য প্রতিপদে মৃত্যু-ভয়। আমরা যদি কামাদি রিপুচয় জয় করিতে পারি তাহা হইলে আমাদের আর জগতে কোনও ভয় থাকে না। কিন্তু আমরা দুর্ব্বল, শত্রু-জয়ের ক্ষমতা নাই। যাহাদের কোন ক্ষমতা নাই তাহাদের ভগবানের প্রতি সমস্ত ভার অর্পণ করা উচিত। আমরা বাহ্য প্রকৃতির সৌন্দর্য্য-দর্শনে মুগ্ধ হই, যিনি সেই সৌন্দর্য্যের স্রস্টা, তিনি কত সুন্দর তাহা একবারও ভাবি না। বাহ্য প্রকৃতির বিষয় পর্য্যালোচনা করিলেও ভগবানের প্রতি স্বতঃই ভক্তির উদয় হয়। আমরা বিষয়-রস-মদিরা-পানে এতই বিচেতন হইয়াছি যে, অন্য কোন বিষয়ান্তর আর মনে স্থান পায় না। বিষয়ের প্রতি যে আসক্তি, যে মমতা, তাহার শতাংশের একাংশ আসক্তি ভগবানের প্রতি থাকিলে, জীবন জনম সফল হইয়া যায়। স্বপ্নেও আমরা সেই বিষয়েরই ধ্যান করি, প্রিয় পুত্রের বা ভার্য্যার শুভাশুভ অহরহঃ হৃদয়ে চিন্তার বিষয় হইয়া আছে। আজ ইহা করিতেছি, কল্য এমত করিব, আজ এত লভ্য হইল, কল্য এত লভ্য হইবে, নিরন্তর হৃদয়ে এই চিন্তা জাগরূক। সুতরাং সে হৃদয়ে ঈশ্বর-চিন্তা স্থান পাইবে কিরূপে? ভগবান্ অকিঞ্চনের ধন, সমস্ত ত্যাগ না করিলে তাঁহাকে পাওয়া যায় না। চতুর্ব্বর্গ-ফলপ্রাপ্তি ইচ্ছা করিলে ভগবান্‌কে পাওয়াই একান্ত আবশ্যক। একজনকে পাইলে সর্ব্ব প্রয়োজন সিদ্ধ হইয়া যায়। যেমন তরুর মূলে জল সেচন করিলে প্রত্যেক শাখায় বা পত্রে আর জল সেচন করিতে হয় না।

যাঁহা হইতে আমি উৎপন্ন, যাঁহা হইতে আমার যাবতীয় প্রয়োজনীয় সামগ্রী পাইয়াছি, এখন তিনি আমার আদৌ চিন্তার বিষয় নহেন। যখন সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া যায়, তখন রোগীর জন্য ঠাকুরের চরণামৃত ব্যবস্থা হয়। ভগবদ্বিমুখতাই জীবের সর্ব্বানর্থের মূল। হিন্দুশাস্ত্রের উপদেশ "ঔষধে চিন্তয়েৎ বিষ্ণুং" ঔষধ-পানকালে বিষ্ণুকে চিন্তা করিবে, "ভোজনে চ জনার্দ্দনং" আহার-কালে জনার্দ্দনকে চিন্তা করিবে, এইরূপ হিন্দুর প্রত্যেক কার্য্যে ভগবানের স্মৃতি জাগাইয়া রাখিয়াছে। আমরা এমনই হতভাগ্য যে, ভ্রমক্রমেও একবার তাঁহার নাম করি না। যাঁতা যন্ত্র ঘুরিতে থাকে, তাহার মাঝখানে একটা খোঁটা থাকে, মটর, ছোলা, গম যাহা কিছু ছিদ্রপথে দেওয়া যায় সবই নিষ্পেষিত চূর্ণীকৃত হইয়া যায়। কিন্তু দুই একটী ছোলা বা মটর যদি ঠিক্ খুঁটার নিকট

আশ্রয় লয়, তবে সে আর নিষ্পেষিত হয় না। এই জগৎ-যাঁতার মাঝখানের খুঁটা সেই ভগবান্। তাঁহাকে যে আশ্রয় করিতে পারে, সে আর কখনও নিষ্পেষিত হয় না। আমরা তাঁহাকে আশ্রয় করিতে পারি না বলিয়াই নিরন্তর দুঃখ-পারাবারের আবর্ত্তে পতিত হইয়া প্রচণ্ড তরঙ্গাঘাতে ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়িতেছি। যখন হাবুডুবু খাইয়া হাঁপাইয়া উঠি, তখন বলি আমার জ্ঞানের পরপারে কে আছ আমায় রক্ষা কর। না জানিয়াও তখন সেই ভগবানের প্রতিই লক্ষ্য করি।

যিনি প্রেমসিন্ধু, যিনি করুণাসিন্ধু, তাঁকে ভুলিয়া আমরা অসারে প্রেম করিতে যাই। আমরা তাঁকে ভুলিতে পারি, কিন্তু তিনি আমাদিগকে কখনও ভুলেন না। কারণ, তিনি সর্ব্বভূতের সুহৃদ্। আমরা এমনই হতভাগ্য, এমন সুহৃদ্‌কে একবারও মনে স্থান দান করি না। একান্তভাবে তাঁহারই শরণাগত হওয়া একান্ত মঙ্গলের কারণ। যিনি হৃদয়ের রাজা, যিনি জীবনের জীবন, যিনি একান্ত সুহৃদ্, যিনি অহেতুক দয়ানিধি, যিনি ইন্দ্রিয়ের অধিপতি, যিনি সর্ব্বান্তর্যামী, যিনি নিয়ন্তা, যাঁহা হইতে সৃষ্টি, যাঁহা হইতে লয়, যিনি রক্ষা-কর্ত্তা, যিনি সর্ব্বপাপ-বিনাশন, যিনি পুণ্যশ্লোক, সর্ব্ববন্ধন-বিমুক্ত ঋষিগণ যাঁহার গুণ-গান করেন, আমরা তাঁহাকে না ভজিয়া বিষয়ে মজিয়া ত্রিতাপ-অনলে দগ্ধ হইতেছি। এ জীবন, এ মন, এ প্রাণ যদি তাঁর রাতুল চরণে অভয়পদে বিলীন না হইল, তবে জীবন জনম সকলি বিফল হইল। হায়! আমরা এমন জনম পেয়ে যদি শ্রীকৃষ্ণ-চরণে প্রাণ সমর্পণ করিতে না পারিলাম, তাহা হইলে এ পশুতুল্য জীবনে ফল কি? যাঁর নাম করা মাত্রেই ভব-বন্ধন-মোচন হয়, সেরূপ করুণাসাগর আর কে আছে?

স এব পুরুষো ধন্যঃ, স এব পুরুষোত্তমঃ।
হরিরিত্যক্ষরযুগং জিহ্বাগ্রে যস্য বর্ত্ততে॥

ক্ষণকালও যদি হরিগুণ গানে অতীত হয়, তাহাতেও জীবন সফল হয়। ভগবানের গুণ-কীর্ত্তন ও শ্রবণ করিতে করিতে হৃদয়ের অন্তস্তলবর্ত্তী অমঙ্গলভূত রিপুচয় নষ্ট হইলে, তখন উত্তমশ্লোক শ্রীকৃষ্ণে নিশ্চলা ভক্তি জন্মে। পুনঃ পুনঃ আস্বাদে সকল বস্তুই দ্বেষের বিষয় হয়, কিন্তু ভগবন্নামের এমনই অনির্ব্বচনীয় মধুরতা আছে যে, অনন্ত যুগ ধরিয়া নাম গান করিলেও তাহাতে বিতৃষ্ণা জন্মিবে না, বরং প্রতিপদে মধুর আস্বাদ অনুভূত হইবে। যিনি ইন্দ্রিয়াধি-ষ্ঠাতা, ইন্দ্রিয়গণ তাঁহারই অনুগত হয়, ইহাই প্রার্থনীয়। যদি ভগবানের গুণগানে

রতি না জন্মে, তাহা হইলে আনুষ্ঠানিক ধর্ম্ম মাত্রেই বিফল শ্রমের কারণ। জগতে মত অসংখ্য থাকিতে পারে, থাকাও উচিত, কিন্তু গন্তব্য স্থান সকলেরই এক। সকল ধর্ম্মশাস্ত্রই একস্থানে উপস্থিত হইবার জন্য উপদেশ দিতেছেন। যিনি সকল শাস্ত্র আলোচনা করিয়া ভগবত্তত্ত্বে বিশ্বাসবান্ হন তিনি যেখানে পৌঁছিবেন, আর নিরক্ষর দৃঢ়নিশ্চয় ব্যক্তিও তথায় পৌঁছিবেন। সুতরাং কতকগুলি আচার ব্যবহার লইয়া পরস্পর বিরোধ করা উচিত নহে। বিচার অপেক্ষা দৃঢ়প্রত্যয়ের প্রয়োজনীয়তা সমধিক। বীর্য্যবান ঔষধ না জানিয়া খাইলেও তাহার গুণ প্রকাশ করে।

সুতরাং কুতর্কজালে বুদ্ধিকে জড়িত না করিয়া দৃঢ় ভক্তি হওয়াই ভাল। প্রেমময় ভগবানকে ভাল বাসিতে শিখিলে হৃদয়ে আর কোন কুৎসিত ভাব থাকে না। হৃদয় মার্জ্জিত দর্পণবৎ নির্ম্মল হইয়া যায়। নির্ম্মল হৃদয়ে ভগবান প্রতিবিম্বিত হন। এজন্য প্রেমমার্গ ও ভক্তিমার্গ সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এ পথে পতন-ভয়, বা প্রত্যবায়-শঙ্কা নাই। কেবল ভগবানে, মনঃ-প্রাণ-সমর্পণ করা আবশ্যক। প্রাণধনকে প্রাণ দিয়াই পাওয়া যায়। আমরা না জানিয়াও সেই প্রাণধনকেই ভালবাসি। তাঁহার অবিদ্যমানতা যখন কোথাও নাই, তখন যে যে বস্তুর প্রতি আমাদের ভালবাসা জন্মে, সে তাঁহারই প্রতি অর্পিত হয়। পুত্রাদির প্রতি যে ভালবাসা, সে তাহার দেহের প্রতি নহে, তাহার আত্মার প্রতি। আত্মা ভগবানের প্রতিবিম্ব। আমরা মৃত দেহকে কখনও ভালবাসি না। আত্মা অর্থে ব্যাপক বুঝায়, সুতরাং সেই ব্যাপক বস্তু কোথাও নাই, ইহা কল্পনা করা যায় না। তবে ভগবানের অংশ বলিয়া ভাবি না বলিয়া আমরা চরিতার্থ হইতে পারি না। ভগবান্ কোনস্থানে নির্দ্দিষ্ট নাই, কোন তীর্থ-বিশেষেও তিনি আবদ্ধ নহেন; তিনি হৃদয়েই বিরাজ করিতেছেন। তিনি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সম্রাট্। সকল সাধন ভজন মন লইয়া। মন যদি স্ববশে না আইসে, তবে কিছুই হইবে না। মনকে স্ববশে আনা অতি দুঃসাধ্য। কেহ কেহ বলেন, বিষয় হইতে মনকে প্রতিনিবৃত্ত করাই উহাকে স্ববশে আনিবার উপায়।

কেহ কেহ বলেন, বিষয়-ভোগব্যতীত বলপূর্ব্বক মনকে বশে আনিতে গেলে, অবিতৃপ্ত বাসনার শক্তিতে কোন সময় পতন অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং বিষয়-ভোগ দ্বারা মনকে ক্রমশঃ নিবৃত্তিপথে আনিতে হইবে। আমার মতে, সর্ব্বান্তঃকরণে ভগবানের শরণাগত হওয়াই শ্রেয়ঃ। তিনি অন্তর্য্যামী ও দয়াময়,

অন্তরের ভাব জানিয়া তিনি নিশ্চয়ই শরণাগতের প্রতি দয়া করিবেন। সর্ব্ব-বিষয়ে ভগবানের প্রতি নির্ভরতাই একান্ত মঙ্গলের কারণ। তিনি সকল আত্মার অন্তরাত্মাস্বরূপ, সকলের প্রভু। আমাদের কি অভাব তাহা তিনি সব চেয়ে ভালরূপই জানেন। তিনি শুভাশুভ-রূপী সংসার-প্রবাহের পরপারে,— বন্ধন-শূন্য। তিনি নিত্য দয়াময়, সর্ব্বদাই জগতের ত্রিতাপে অভিভূত নরনারীকে সংসার-সাগরের পরপারে লইয়া যাইবার জন্য বাহু প্রসারিত করিয়া রহিয়াছেন। তাঁহার দয়ার সীমা নাই, ভক্তই তাঁহার দয়ার প্রকাশ জানিতে পারে। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যেদিকে চাও সেই দিকেই তাঁহার দয়ার প্রকাশ বুঝিতে পারা যায়। তিনি ভক্তানুগ্রহার্থ শত শত বার জগতে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। অন্যান্য অবতারে তিনি অস্ত্রগ্রহণপূর্ব্বক পাষণ্ড দলন করিয়াছেন। গৌরাঙ্গ-অবতারে এবং বৌদ্ধাবতারে প্রেমাস্ত্র-বলে মিত্র-শত্রু বশীভূত করিয়াছেন। তাঁহার ইচ্ছাতেই জগৎ পরিচালিত হয়, তিনি ভক্তানুগ্রহার্থ ও লোক-শিক্ষার্থ এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। তিনি কখনও কর্ম্মশূন্য হইয়া থাকেন না। তাঁহার লীলা, বিভূতি, পামর লোকদিগের চিত্তে প্রতিভাত হয় না। তিনি যথার্থই পরমকারুণিক, ভাগ্যহীন মানবই তাঁহার প্রতি বিমুখ।

ইষ্টনিষ্ঠা থাকিলে অবতারগণের মধ্যে যাঁহাকে ইচ্ছা তাঁহাকেই আদর্শ ও উপাস্যরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে। বিশেষ লক্ষ্য করিলেই বুঝা যায় যে, যে অবতারই হউন না কেন, বৈদিক সনাতনতত্ত্ব-সমূহের জীবন্ত উদাহরণ-স্বরূপ বলিয়াই আমাদের নিকট তিনি মান্য! শ্রীকৃষ্ণের ইহাই মাহাত্ম্য যে, তিনি তত্ত্বাত্মক সনাতন ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ প্রচারক। ভারতবর্ষের ইহা মহা সৌভাগ্য যে, যিনি বেদস্বরূপ, আবার তিনিই শ্রীকৃষ্ণরূপে বেদ-ব্যাখ্যাতা। তিনি সখা অর্জ্জুনের প্রশ্নোত্তরচ্ছলে মনুষ্যের সকল সন্দেহই গীতাশাস্ত্রে নিরাস করিয়া দিয়াছেন। ইহা ভারতবর্ষের পক্ষে কম সৌভাগ্য নহে। অদ্ভুত-চরিত্র শ্রীকৃষ্ণের বিষয় বুঝা সাধারণের পক্ষে দুঃসাধ্য। কৃষ্ণপ্রেমের সেই অদ্ভুত বিকাশ— যাহা বৃন্দাবন-লীলায় রূপকচ্ছলে বর্ণিত হইয়াছে। প্রেম-মদিরা-পানে যে একবারে উন্মত্ত হইয়াছে, সে ব্যতীত কেহ তাহা বুঝিতে অক্ষম। কে সেই গোপীদের প্রেমজনিত বিরহ-যন্ত্রণার ভাব বুঝিতে সমর্থ? যে প্রেম প্রেমের আদর্শ-স্বরূপ, যে প্রেম আর কিছু চাহে না, যে প্রেম স্বর্গ পর্য্যন্ত আকাঙ্ক্ষা করে না, যে প্রেম ইহলোক পরলোকের কোন বস্তু কামনা করে না, এই গোপী-প্রেম দ্বারাই সগুণ নির্গুণ ঈশ্বরবাদের একমাত্র সামঞ্জস্য-সাধন হইয়াছে।

মানব, সগুণ ঈশ্বর হইতে উচ্চতর ধারণা করিতে অক্ষম। আমাদের প্রাণ একটি সাকার বস্তু চায়, এমন বস্তু চায় যাহা আমরা ধরিতে পারি; যাঁহার পাদপদ্মে প্রাণ ঢালিয়া দিতে পারি। এই জন্যই গোপীরা কৃষ্ণের প্রতি অন্য বিশেষণ দিতে চাহিত না। কেবল বুঝিত তিনি প্রেমময়, এই তাহাদের পক্ষে যথেষ্ট। তাহারা কৃষ্ণকে বৃন্দাবনের কৃষ্ণ বলিয়াই জানিত।

ধর্ম্মের ইতিহাসে ইহা এক নূতন অধ্যায়, ভগবানে অহেতুকী ভক্তি। ইহা গোপীদিগেরই হইয়াছিল, কারণ, তাহারা তাহাদের এমন কিছু ছিল না যাহা শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির জন্য ত্যাগ করিতে পারিত না। কৃষ্ণ-বিরহে কাহারও কাহারও জীবনও বহির্গত হইয়াছিল। এতাদৃশ প্রেমই ইন্দ্রিয়তৃপ্তিবাসনা জন্য হইতে পারে না। সুতরাং জিতেন্দ্রিয় ব্রহ্মচারী ব্যতীত শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা শ্রবণ করা সাধারণের কর্ত্তব্য নহে। অহেতুক গোপীপ্রেম অতি দুর্ব্বোধ্য, আমাদের ন্যায় কাম-কিঙ্করেরা তাহা ধারণা করিতেও অক্ষম। যে গোপীদের পদরজ ভব, বিরিঞ্চি, উপেন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ, সনকাদি ঋষিগণও কামনা করেন। তাহারা সামান্যা নহেন, সাক্ষাৎ ভগবচ্ছক্তিস্বরূপ। আমাদের মধ্যে এমন অনেকে আছেন, যাঁহারা গোপীপ্রেমের কথা শুনিলে অপবিত্র ব্যাপার ভাবিয়া ভয়ে দশ হাত পিছাইয়া যান্। তাঁহারা প্রথমে নিজের মন শুদ্ধ করুন, পরে যেন গোপীপ্রেমের বিষয় শ্রবণ করেন। আর রাসলীলার বক্তা অদ্বিতীয় জিতেন্দ্রিয় পরমহংসরাজ ব্যাসনন্দন শুকদেব। শ্রোতা মুমুক্ষু রাজা পরীক্ষিৎ। যেখানে বক্তা ও শ্রোতা মুক্ত ও মুমুক্ষু; সেখানে কামবিলাস বর্ণিত হইয়াছে, ইহা কি সম্ভবপর হয়? শ্রীকৃষ্ণকে যাঁহারা সাধারণ মানব মনে করেন, তাঁহাদের ধারণা পৃথগ্‌রূপ হওয়াই সম্ভব। আর যাঁহারা কৃষ্ণ সাক্ষাৎ ভগবান বলিয়া জানেন, তাঁহারা জানেন, তাঁহার নিকট নরনারীতে কোনই প্রভেদ নাই। সর্ব্বভূতই যখন তিনি, তখন তাঁহার নিকট স্ত্রী-পুরুষ ভেদ হইতে পারে না। সেই সর্ব্বজীবের জীবন, নন্দনন্দন, যদি কাহারও অধর-চুম্বন করেন, তাহা হইলে তাহার জীবন জনম সার্থক, তাহা মহা সৌভাগ্য মনে না করিয়া দুষ্য জ্ঞান করা অপবিত্র অন্তঃকরণের পরিচয় মাত্র।

যদি নদী সাগরে মিশে, তবে সেটা গুণ হইবে কি দোষ হইবে? যদি গুণ হয়, তবে জীবের যাহা হইতে উৎপত্তি, লয়ও তাহাতেই হইবে। সুতরাং ভগবানে মিলিত হওয়াই জীবের স্বাভাবিক নিয়ম, তদ্বৈপরীত্যই ব্যভিচার। যে ভাবেই হউক ভগবানে মিলিত হওয়াই জীবের বাঞ্ছিত গতি। তবে সখ্য,

দাস্য, শান্ত প্রভৃতি ভাবে কিছু ভয়, সঙ্কোচ, মহত্ত্ববোধ থাকে। তাহাতে সম্পূর্ণ মিশামিশি ভাব জন্মে। প্রেমে সেটুকু আদৌ নাই। এইজন্য ভাবের মধ্যে মধুর ভাবই শ্রেষ্ঠতম বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছে, গোপীগণ মধুর ভাবে ভগবানকে ভজনা করিয়াছেন। তাঁহারা প্রেমিকা, কৃষ্ণ প্রেমসিন্ধু, সুতরাং সরিৎ সাগরে মিশিয়াছে. তাহাতে যদি আত্মার বা ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি কামনা থাকিত, তবে তাহা দোষের কারণ হইত। কিন্তু, গোপীদের প্রেম কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছা-বিষয়ক। সুতরাং তাহা দেবদুর্লভ, অতি বিশুদ্ধ! নরনারীর পরস্পর যে ভালবাসা, তাহা আসঙ্গলিপ্সামূলক, অথবা রূপ, অথবা ইন্দ্রিয়তৃপ্তিবাসনা-জনিত। যদি কোন ভাগ্যবান প্রকৃত প্রেমের অধিকারী হন, তবে তিনি সার্থকজন্মা। এখন ভাবুন, শ্রীকৃষ্ণ যদি স্বয়ং পূর্ণব্রহ্ম হন, আর তিনি সর্ব্ব-ত্যাগের পরীক্ষার্থ যদি গোপীদের বস্ত্র হরণ করিয়া থাকেন, তবে তাহাতে দোষ কি? লজ্জা, ঘৃণা, ভয়, তিন থাকিতে নয়। অর্থাৎ এই তিনটি ত্যাগ না করিলে ভগবানকে পাওয়া যায় না। ঐ গুলি মনের ময়লা বা আবরক। সুতরাং ঐ গুলি বিসর্জ্জন না দিলে ভগবানকে পাওয়া কঠিন।

(ক্রমশঃ)

পুরুষে প্রকৃতি নীরব সাধন।

লেখক—শ্রীকেদারনাথ মুখোপাধ্যায়।

(১)

কে বলে গৃহেতে হয় না সাধন,
সংসার-আশ্রমে কভু সুখ নাই।
নারী হয় সদা পতন-কারণ,
যতনে এ সব তাই ত্যাগ চাই॥

(২)

কেবলি রমণী অহিতের খনি,
তার সহবাস সততই নাশ
ঘটায় জীবনে, আনে কত হানি,
তারে বুকে নিয়ে করিলে গো বাস॥

(৩)

বলুক্ বলুক্ তারা গো বলুক্,
যাদের হৃদয় বলিবারে চায়।
করুক্ করুক্ তারা গো করুক্
রমণীরে ত্যাগ যদি ইচ্ছা যায় ॥

(৪)

কেন এত কেন, কিসেরি গো ক্রোধ
রমণীর প্রতি কেন অবিশ্বাস ?
ভাব কি বারেক তুমিই অবোধ
তাই তব এত নারীতে সে ত্রাস ॥

(৫)

আছে প্রলোভন নারীতে অশেষ,
প্রভূত বিপদ নারী লয়ে বুকে।
তা বলে ভাবা ত উচিত বিশেষ,—
কোন্ পথে চলা যায় গো সে সুখে ?

(৬)

হৃদয়ে তোমার নিবিড় বিপিন,
কত শত জন্তু আছে তার মাঝ।
স্ব-বলে তাদের করিয়া গো ক্ষীণ
পার না চলিতে, নাহি তাহে লাজ !!

(৭)

তা যদি না পার, না নিন্দ রমণী,
রমণীকে কর জীবনের সাথী।
করিয়ে তাহারে অকূলে তরণী,
ভব-পারাবার আনন্দেতেমথি ॥

(৮)

নারীতে মগন হয় না ত মন,
উপরে উপরে ভাসিয়া যে মরি।
তাই তাতে ভয়, তাতেই পতন,
তাই ত নারীকে বাখানি গো অরি ॥

(৯)

নারী যে আসন প্রেমের পূজায়,
রমণী আবার প্রতিমা সেথায়।
কামিনী, কুসুম, পূজার থালায়,
সতী সেথা বসি আরতি সাজায়॥

(১০)

তার স্নেহ যে গো ঘটভরা বারি,
তার লজ্জা ওগো ভবপারে তরি,
তারি সুধাপ্রেম অকূলে কাণ্ডারী,—
রমণী, কামিনী, সতী, সাধ্বী সারি।

(১১)

রমণী-হৃদয়ে সুখ-স্নান তরে,
ত্রিবলী-সোপান সাজানো গো তায়।
স্নানান্তে দেখিবে দেবতা-ভাস্করে,
সাজানো যতনে নয়ন-তারায়।

(১২)

প্রাণে প্রাণ ঢেলে যত প্রাণ চায়,
মিটাও আবেশে মন-অভিলাষ।
তখন দেখিবে নারী কোথা হায়,
কোথা ভেসে গেছে নারী হ'তে ত্রাস॥

(১৩)

নারী লয়ে নয় বিলাসের খেলা,
কামিনী কভু না কর অবহেলা;
এ যে গো কেবলি ধরমের মেলা,—
হল তাই লয়ে রাম-কৃষ্ণ-লীলা।

(১৪)

সৃজন প্রথাটী গভীর রহস্য;
নারী কিন্তু তার উজ্জল আধার।
পুরুষ দেখিছে খালি তুলি আস্য,
নারী গো সৃজন করিছে প্রচার॥

(১৫)

নাম তাই তার মাতা আদ্যাশক্তি,
তাই গো প্রকৃতি, স্ব-ভাব-নিলয় ;
পুরুষে পৌরুষ তারি অভিব্যক্তি,
সে পৌরুষ বিনা কোথা সব রয় ?

(১৬)

রমণী প্রসূতি জানে তা ত সবে,
সেই মনে ভাবা ইহাও ত চাই,—
লভে গো সন্তান জন্ম তার যবে,
মাতৃ-অঙ্গ ছেদি হয় ভুই ঠাঁই !

(১৭)

পুরুষে প্রকৃতি নীরব সাধন,
নর নারী মেলা তাহারি ছবি।
আদি রিপু করি যতনে দমন
কি রতন মিলে, দেখ কহে কবি॥

পুরী-দর্শনে।

লেখক—শ্রীবিধুভূষণ শাস্ত্রী, বেদান্তভূষণ ভক্তিরঞ্জন।

এবার পুস্তক ও ঔষধ ক্রয় করিয়া লইয়া আসিব মনে করিয়া কলিকাতায় রওনা হইয়াছিলাম। গৌড়ীয় মঠে গিয়া দেখিলাম যে কতিপয় ব্রহ্মচারী পুরী গমন করিবেন। এতদিন অন্যান্য তীর্থ দর্শন করিয়া পুরী হইতে প্রত্যাগমন করিয়া জাতি-বিচার মানিব না মনে করিয়া পুরী গমন করি নাই ; যখন কেহ কেহ পুরী গমন করিতেছেন দেখিলাম তখন আমিও ডাক্তার শ্রীযুক্ত শ্যামসেবক ব্রহ্মচারী মহাশয়ের সহিত গমন করিতে ইচ্ছা করিলাম। পুরী গমন করিবার পূর্ব্ব হইতেই জাতি-বিচার-গ্রন্থি অনেক শিথিল হইয়াছিল, তখন মনে করিলাম জাতি-বিচার না করিবার ইহাই পূর্ব্ব লক্ষণ, কারণ শ্রীশ্রীজগন্নাথ প্রভু নিজ স্থানে লইবার জন্যই পূর্ব্ব হইতে জাতি-বিচার শিথিল করিয়াছিলেন।

কারণ ইতর বাগ্দীর স্ত্রীলোককে "হরি" বলিয়া পাত্রে জল ঢালিতে বলিয়া দিয়াছিলাম—তাহাতেই পানীয় ও পাকের কার্য্য সম্পন্ন হইত; যখন জগন্নাথজী ভঙ্গী করিয়া জাতি-বিচার দূর করিবার জন্যই এখানে আনিয়াছেন, তখন সে সুযোগ ত্যাগ করা কর্ত্তব্য নহে মনে করিলাম। রাত্রে আহারান্তে উভয়ে মঠের খরচে অশ্বযানে হাওড়া ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম। রাত্রি প্রায় ১০টায় রেলে উঠিয়া বসিয়া আছি, এমন সময়ে দেখি শ্রীযুক্ত রাসবিহারী মহাশয় অন্য একটি ব্রহ্মচারী মহাশয়ের সহিত আমাদের নিকট উপস্থিত হইলেন। তিনি কহিলেন যে "প্রভুপাদ, পুরী-যাত্রীর জনতা অতিক্রম করিয়া আমরা রেলে উঠিতে পারিয়াছি কিনা দেখিবার জন্য তাহাদিগকে পাঠাইয়াছেন! ডাক্তার বাবু যুবক ছিলেন কিন্তু আমি বৃদ্ধ ছিলাম বলিয়া দেখিতে পাঠাইয়াছেন। মনে ভাবিলাম ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস গোস্বামী মহারাজের কি দয়া! কারণ আমি তাঁহাদের কেহই নহি—দয়া করিয়া মঠে স্থান দেন মাত্র সম্বন্ধ! এরূপ দয়া না হইলে তাঁহার এত ব্রাহ্মণ এম্-এ-বি-এল্ শিষ্যই বা কেন হইবেন? ইহাকেই বলে গুরু! এখনকার সাধারণ গুরুর কেবল বাৎসরিক প্রণামী লইবার জন্যই শিষ্যের সহিত সম্বন্ধ! এমন গুরুও দেখা যায় যিনি উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিৎ এই তিন স্বরযুক্ত প্রণব উচ্চারণ করিতে জানেন না; কেহবা গায়ত্রীর অর্থও জানে না। এরূপ ব্যক্তি কি প্রকারে শিষ্যের সন্দেহ দূর করিবেন? অন্ধ, কখনও অন্ধকে পথ দেখাইয়া লইয়া যাইতে পারে না; সুতরাং শিষ্য যে গুরুকে প্রণাম করেন—

"অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥"

এখানে "দর্শিতং" শব্দের প্রয়োগ আছে—অর্থাৎ অখণ্ডমণ্ডলাকারকে যিনি ব্যাপিয়া থাকেন সেই স্থান যিনি প্রদর্শন করান—বাস্তবিক এ প্রকার গুরুর কি সে শক্তি আছে? তাহা হইলে প্রণাম-মন্ত্রে শিষ্য মিথ্যা কথা বলিতেছেন! তবে এখনকার সাধারণ গুরুব্রুবগণ "অখণ্ড মণ্ডলাকার" শব্দে শিষ্য-বাটীর লুচির পথ দেখাইতে পারেন। কিন্তু এ প্রভুপাদের পাণ্ডিত্যও অসাধারণ। "গৌড়ীয়" সাপ্তাহিক পত্রিকা, বিশুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করিয়া লোকের কত হিত-সাধন করিতেছেন। মহারাজের ক্ষমতাও অসাধারণ। গত বৎসর নবদ্বীপ পরিক্রমায় ইহাঁদের সহিত গমন করিয়াছিলাম। প্রতি বেলায় আমার মত ৩০০। ৩৫০ জন যাত্রীকে প্রচুর পরিমাণে আহার্য্য দান করিয়াছেন; কিন্তু এত

দ্রব্য কে যোগাইতেছেন, তাহা বুঝিতে পারিতাম না। তাঁহার এত দয়া যে হস্তী প্রভৃতি যান থাকিতেও তিনি প্রতিদিন অত কোমল পদদ্বারা সঙ্কীর্ত্তন-কারিগণের সহিত গমন করেন; নিজের সঙ্গী মাত্র একটি দণ্ড! কিন্তু অত দ্রব্য কে যোগাইত তাহা লীলাময়ই জানেন! মহারাজের সমুদয় গুণ বর্ণন করিতে আমি অক্ষম—

মহিমানং যদুৎকীর্ত্ত্য তব সংহ্রিয়তে বচঃ।
শ্রমেণ তদশক্ত্যা বা ন গুণানামিয়ত্তয়া॥

রঘুবংশে ১০।৩২

এ কথা অতিরঞ্জিত নহে! মহারাজের সহিত আলাপ করিতে যাঁহার ভাগ্যের উদয় হইয়াছে, তিনিই জানেন।"

ডাক্তার ব্রহ্মচারী মহাশয়ের সহিত পুরী গিয়া পঁহুছিয়া ছিলাম। সেখানে "পাথর কুটী" নামে প্রকাণ্ড দ্বিতল গৃহ—সমুদ্রের সন্নিকট - মঠের খরচে ভাড়া লওয়া হইয়াছিল। তাঁহাদের ঠাকুর বাটী একটু দূরে। কুটীতে প্রতিদিন দুইবেলা শ্রীচরিতামৃত, শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও সঙ্কীর্ত্তন হইত। উপরে ভদ্রমহিলাগণ থাকিতেন। প্রতিদিন দুইবেলা অনেক লোক অপর্য্যাপ্ত প্রসাদ পাইতেন। কাঙ্গালী ভোজনও হইয়াছিল।

আমি মধ্যে মধ্যে শ্রীধাম নবদ্বীপে প্রসিদ্ধ সঙ্কীর্ত্তনকারী পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত রামদাস বাবাজী মহাশয়ের আশ্রমে যাইতাম। তাঁহার প্রাণ-মাতানো সঙ্কীর্ত্তন—পূর্ণামৃতাস্বাদনং সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং কৃতিং—সর্ব্বাত্মস্নপন-সঙ্কীর্ত্তন যিনি না শ্রবণ করিয়াছেন, তিনি "সঙ্কীর্ত্তন" কাহাকে বলে তাহা জানিবেন না। সঙ্কীর্ত্তন-কালে তাঁহার শরীর অনেক বৃদ্ধি হইয়া থাকে—শরীরে নানা সাত্ত্বিকভাবেরও উদয় হইয়া থাকে। সঙ্কীর্ত্তনের পদ তাঁহার রচিত। "আঁখরে"ই তিনি সঙ্কীর্ত্তনে শ্রীভাগবত পর্য্যবসিত করিয়া থাকেন। যেদিন প্রথমে তাঁহাদের আশ্রম হইতে গুণ্ডিচা গমনের জন্য প্রস্তুত হইলেন, তখন "ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম। জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম" তাঁহার গুরুদেব-রচিত এই কথা বলিতে বলিতে সঙ্কীর্ত্তন-আরম্ভকালে দণ্ডায়মান হইয়া, করতাল লইয় তাঁহার গুরুদেবকে স্মরণ করিয়া, তাঁহার বিরহে অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন—সে দৃশ্য এ জীবনে বিস্মৃত হইতে পারিব না! পুনরায় যেদিন গুণ্ডিচার বাহিরে বসিয়া কীর্ত্তন করিতেছিলেন, এবং আঁখরে "সব আছে, গোরা নাই" বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া-ছিলেন, তখন এ অভাজনও অশ্রু বিসর্জ্জন না করিতে অসমর্থ হইয়াছিল! মনে

করিল, "প্রভু! যদি চলিয়াই যাইবে, তাহা হইলে লোক-চক্ষুর মধ্যে আসিলে কেন?"

জগন্নাথদেব ত বৃন্দাবনের সেই শ্রীকৃষ্ণ; এখনও তিনি ছেলেমানুষী ত্যাগ করিতে পারেন নাই। তিনি বৃন্দাবনে কখনও অসময়ে বৎসগণকে ছাড়িয়া দিতেন, কখনও কোন শয্যাশায়িত বালককে প্রহার করিয়া কাঁদাইতেন, কখনও শিকায় যে নবনী থাকিত সেই পাত্র ভাঙ্গিয়া দিয়া নিজেও ভক্ষণ করিতেন, কখনও বানরগণকেও দিতেন, কখনও বা সেইস্থানে মলমূত্র ত্যাগ করিতেন—

বৎসান্ মুঞ্চন্ ক্বচিদসময়ে ক্রোশ-সঞ্জাত-হাসঃ
স্তেয়ং স্বাদ্বত্ত্যথ দধিপয়ঃ কল্পিতৈস্তেয়-যোগৈঃ।
মর্কান্ ভোক্ষ্যং বিভজতি স চেন্নাত্তি ভাণ্ডং ভিনত্তি
দ্রব্যালাভে সগৃহ কুপিতো যাত্যুপক্রোশ্য তোকান্॥ ২৯
হস্তাগ্রাহ্যে রচয়তি বিধিং পীঠকোলূখলাদ্যৈ—
শ্ছিদ্রং হ্যন্তর্নিহিত বয়ুনঃ শিক্যভাণ্ডেষু তদ্বিৎ।
ধ্বান্তাগারে ধৃতমনিগণং স্বাঙ্গ মর্থ প্রদীপং
কালে গোপ্যো যো হি গৃহ-কৃত্যেষু সুব্যগ্রচিত্তাঃ॥ ৩০
এবং ধার্ষ্ট্যান্যুশতি কুরুতে মেহনাদীনি বাস্তৌ
স্তেয়োপায়ৈর্বিরচিত কৃতিঃ সুপ্রতীকো যথাস্তে। ৩৩

শ্রীভাগবতে ১০। ৮ অধ্যায়ে

এখনও সেই ছেলেমানুষী দেখাইতে কুণ্ঠিত হন না! স্বভাব ত্যাগ করা কঠিন—

সতীব যোষিৎ প্রকৃতিঃ সুনিশ্চলা
পুমাংসমভ্যেতি ভবান্তরেষপি॥

মাঘঃ ১। ৭২

রথে যাইতে যাইতে যখন যাইতে ইচ্ছা করিবেন না, তখন কাহার সাধ্য যে রথ টানে। হস্তীরও ক্ষমতা নাই।

এবারে রথ দুইস্থানে থামিয়াছিল। অনেক আশা করিয়া মূর্ত্তি-দর্শন জন্য গিয়াছিলাম। রথ চলিবার সময় দর্শন জন্য এক ঠাকুর বাড়ীর উচ্চ সিড়িতে বসিয়াছিলাম; ভাগ্যদোষে মূর্ত্তি দর্শনই হইল না—চক্ষু এত অশ্রুপূর্ণ হইল যে তিনবার চশমা খুলিয়া চক্ষু মুছিলাম, তথাপি দর্শন হইল না। মনে করিলাম,

পাপী লোকের দর্শনকালে বিঘ্ন ঘটাইয়া দিয়া থাকেন। অশ্রুর কারণ আর কিছুই ছিল না, কেবল শ্রীজগন্নাথদেবের মূর্ত্তির এক মত যে শ্রীকৃষ্ণের দেহ-শ্মশানে দগ্ধাবস্থার নাভি যখন দগ্ধ হইল না তখন তাহা সমুদ্রে ভাসিয়া যাইতেছিল। ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজা স্বপ্নাদেশে তাহাকে আনাইয়া বৃদ্ধ-ব্রাহ্মণ-বেশী বিশ্বকর্ম্মা দ্বারা শ্রীজগন্নাথদেবের মূর্ত্তি গঠন করাইয়াছিলেন। তজ্জন্য মনে হইল, তোমার এ দশাও দেখিতে হইল! লিখিতেও কষ্ট হইতেছে—চিন্তা করিতেও কষ্ট যে, যদি আসিলে তবে গেলে কেন? যদি গেলে তবে এমন করিয়া পাঞ্চভৌতিক দেহের ন্যায় আমাদের ন্যায় গেলে কেন? তোমার দেহ যে চিন্ময়—

ভগবানপি বিশ্বাত্মা ভক্তানামভয়ঙ্করঃ।
আবিবেশাংশ ভাগেন মন আনকদুন্দুভেঃ॥

শ্রীভাগবতে ১০।২।১১

ইহাতে স্বামিপাদ "মন" শব্দের অর্থ করিয়াছেন "মন আবিবেশ মনস্যাবির্বভূব জীবানামিব ন ধাতু সম্বন্ধ ইত্যর্থঃ।

পুনরায় যখন মাতা দেবকী গর্ভে ধারণ করিয়াছিলেন, তখনও তাহা লোক-প্রতীতিবৎ, কারণ চন্দ্রদেব যখন পূর্ব্বদিকে উদিত হন তখন আমরা মনে করি যে পূর্ব্বদিকে চন্দ্র উদিত হইতেছেন কিন্তু পূর্ব্বদিকের সহিত চন্দ্রের কোন সম্বন্ধ নাই—

দধার সর্ব্বাত্মকমাত্মভূতং
কাষ্ঠা যথানন্দকরং মনস্তঃ॥

শ্রীভাগবতে। ১০।২।১৭

তিনি দেহীর ন্যায় দেহ ধারণ করিয়া কার্য্য করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি দেহী এরূপ বলা যাইতেছে না কারণ—

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাব মজানন্তো মমভূত মহেশ্বরম॥

শ্রীভগবদ্‌গীতায়াং ৯।১১

তিনি চিন্ময় দেহধারীই বটেন, তবে শ্রীভাগবতে ও শ্রীহরিবংশে তাঁহার শেষ অবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন তাহা পাঠ করিতেও হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়; একবার পাঠ করিয়া চক্ষু এত অশ্রুপূর্ণ হইয়াছিল যে তাহা আর পাঠ করিতে পারি নাই (যদিও শ্রীভাগবত আমার নিত্য পাঠ্য কিন্তু ঐ স্থান পরিত্যাগ করিয়া পাঠ করিয়া থাকি।) ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে শ্রীকৃষ্ণ-জন্ম-খণ্ডে শ্রীভাগবতাদির

স্থার শেষ বর্ণনা করা হয় নাই—তাহাই উত্তম বলিয়া মনে হয়। যাহা হউক পরদিন গুণ্ডিচার বাহিরে রথে তিন মূর্ত্তি উত্তমরূপে দর্শন ও স্পর্শন হইয়াছিল। পূর্ব্বদিন দেখা না দিয়া পরদিন উত্তমরূপে দর্শন দিলেন, ইহাও তাঁহার লীলা-ভঙ্গী।

আর একটি দৃশ্য, রথের সম্মুখে একটি হস্তী শ্রীজগন্নাথদেবকে চামর ব্যজন করিতেছিলেন। হস্তীর ভাগ্য দেখিয়া তাঁহাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়াছিলাম, কারণ শ্রীজগন্নাথদেবের সেবা করা আমার ভাগ্যে নাই; তাঁহার করে একটি পয়সা দিলাম, তিনি তাহা উঠাইয়া নিজ প্রভু মাহুতকে দিলেন। তিনি প্রভুভক্ত; কিন্তু আমি ত প্রভুভক্ত নহি—আমার সে গুণও নাই, যদি প্রভুভক্ত হইব তাহা হইলে প্রভুর সেবা করিতে পারিলাম না কেন? তিনি আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, আমা অপেক্ষা তাঁহার ভাগ্য অধিক, তজ্জন্য তাঁহাকে প্রণাম করিয়াছিলাম। ডাক্তার ব্রহ্মচারী মহাশয়ের কৃপায় এ দৃশ্যও দর্শন করিলাম, শ্রীজগন্নাথদেবের দর্শন ও স্পর্শন হইল (যদিও চিত্রপটে দর্শনমাত্র করিয়াছিলাম।) এ জীবনে সমুদ্র কখনও দর্শন করি নাই। লীলাময়ের লীলার কি অনন্ত শক্তি! সর্ব্বদা সান্দ্র মেঘগর্জ্জনধ্বনি শ্রুতিগোচর হইতেছিল, তাহার উপর উত্তাল তরঙ্গ, ঘাত-প্রতিঘাতে সফেন হইয়া তীরে আঘাত করিতেছিল! সে তরঙ্গে ধীবরগণের ক্ষুদ্র নৌকা একবার উঠিতেছিল কিন্তু পরক্ষণেই তরঙ্গে অদৃশ্য। সূর্য্যদেব যখন সমুদ্র হইতে তাঁহার সহস্র কর বিস্তার করিয়া উত্থিত হইতেন ও যখন সায়ংকালে তাঁহার কর সকল সংহার করিয়া অস্ত যাইতেন, সে দৃশ্যই যে কি মনোমোহকর! লীলাময়ের লীলা কি অদ্ভুত ব্যাপার তাহা স্মরণ করিলে আত্মহারা হইতে হয়।

শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত পাঠ করিয়া কল্পনার চক্ষে গম্ভীরা, সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের গৃহ, নরেন্দ্র সরোবর, ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর, গুণ্ডিচা প্রভৃতি দর্শন করিতাম; কিন্তু এবারে সেই সমুদায় স্থান, সরোবর, স্তম্ভে মহাপ্রভুর হস্তচিহ্ন; মহাপ্রভুর কমণ্ডলু, কন্থা ও খড়ম দর্শন ও স্পর্শন; হরিদাসের সিদ্ধ বকুল প্রভৃতি দর্শন করিয়া জীবনকে ধন্য মানিলাম। ইহা সমুদায় ডাক্তার শ্রীযুক্ত শ্যামসেবক ব্রহ্মচারী মহাশয়ের কৃপা।

এতদিন যে নবদ্বীপ দর্শন করিয়াছি তাহা প্রতিবিম্ব মাত্র। সমাজগৃহ ব্যতীত সমুদায় ঠাকুর বাটী দর্শনে গমন করিলে কেবল "ভেট" "ভেট" শব্দ, না দিলে দর্শন করিতে দেন না, তাহা দর্শন করিলে হৃদয় শুষ্ক হইয়া যায়।

কারণ কোন দেবালয়ে ভেট না দিলে অর্দ্ধচন্দ্রও লাভ হইয়া থাকে। হায়! যে গৌর-নিতাই অযাচিতভাবে মনুষ্য সকলকে জাতিনির্ব্বিশেষে প্রেম দান করিয়াছিলেন, তাঁহাদের দর্শনে আজ পয়সা! তাঁহারা কি ব্রাহ্মণ! মৃত্তিকা-বিকার অর্থে যে তাঁহারা দেহ-বিক্রয় করিয়াছেন। অর্থের জন্য ত তিন শ্রেণীর লোক জীবন দিতে পারেন—

তস্করঃ সেবকো বণিক্।

শ্রীভাগবতে ৭।৬।১০

ইহাঁরা তাহা হইলে বণিক বেশে ব্রাহ্মণ বা গোস্বামী। যে ব্রাহ্মণের শরীর অর্থে বিক্রীত হইল তিনি কি ব্রাহ্মণ? ব্রাহ্মণের লক্ষণ এই—

ধর্ম্মশ্চ সত্যঞ্চ তপোদমশ্চ
অমাৎসর্য্য হ্রীস্তিতিক্ষানসূয়া
দানং শ্রুতঞ্চৈব ধৃতিঃ ক্ষমা চ
মহাব্রত দ্বাদশ ব্রাহ্মণস্য ॥

ভারতে—উদ্যোগ পর্ব্বণি ৪৫ অধ্যায়ে (বোম্বাই মুদ্রিত)

অন্যত্র—

ক্রোধঃ শত্রুঃ শরীরস্থো মনুষ্যাণাং দ্বিজোত্তম।
যঃ ক্রোধ-মোহৌ ত্যজতি তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ ॥
যো বদেদিহ সত্যানি গুরুং সন্তোষয়েত চ।
হিংসিতশ্চ ন হিংসেত তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ ॥
জিতেন্দ্রিয়ো ধর্ম্মপরঃ স্বাধ্যায়-নিরতঃ শুচিঃ।
কামক্রোধৌ বশে যস্য তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ ॥
যস্য চাত্মসমো লোকো ধর্ম্মজ্ঞস্য মনস্বিনঃ।
সর্ব্বধর্ম্মেষু চ রতস্তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ ॥
ব্রহ্মচারী বদান্যো যোঽপ্যধীয়াদ্দ্বিজ-পুঙ্গবঃ।
স্বাধ্যায়বানমত্তো বৈ তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ ॥

ঐ বনপর্ব্বণি ২০৫ অধ্যায়ে ঐ

অন্যত্র—

ব্রাহ্মণস্য দেহোঽয়ং ক্ষুদ্রকামায় নেষ্যতে।
কৃচ্ছ্রায় তপসে চেহ প্রেত্যানন্ত সুখায় চ ॥

শ্রীভাগবতে ১১।১৭।৪২

অন্যত্র—

জাত-কর্ম্মাদিভির্যস্তু সংস্কারৈঃ সংস্কৃতঃ শুচিঃ।
বেদাধ্যয়ন-সম্পন্নঃ ষট্সু কর্ম্মাস্ববস্থিতঃ॥
শৌচাচারঃ স্থিতঃ সম্যগ্ বিঘসাশী গুরুপ্রিয়ঃ।
নিত্যব্রতী সত্যপরঃ স বৈ ব্রাহ্মণ উচ্যতে॥
সত্য দানমথাদ্রোহ আনৃসংস্যং ত্রপাঘৃণা।
তপস্যশ্চ দৃশ্যন্তে যত্র স ব্রাহ্মণ ইতি স্মৃতঃ॥

ভারতে শান্তিপর্ব্বণি ১৮৯ অধ্যায়ে

এখানে ব্রাহ্মণের তপস্যা যাত্রী বা দর্শকগণের ভেট আদায়, তদভাবে অর্দ্ধচন্দ্র-দান।

ভগবান্ কহিয়াছেন যে যজ্ঞে চরু পুরোডাশাদির ভক্ষণে সেরূপ আনন্দ লাভ করি না, যেরূপ ব্রাহ্মণের মুখ দিয়া খাইয়া আনন্দ লাভ করি—

নাহং তথাদ্মি যজমান-হবির্বিতানে—
শ্চোতদ্ ঘৃত-প্লুতমদন্ হুতভুঙ্মুখেন।
যদ্ ব্রাহ্মণস্য মুখতশ্চরতোঽনুঘাসং
তুষ্টস্য ময্যবহিতৈর্নিজ কর্ম্মপাকৈঃ॥



শ্রীভাগবতে ৩।১৬।৮।
স্কন্দপুরাণে কুমারিকা-খণ্ডে ৪।৯০

তদ্ভিন্ন বেদে যাঁহাকে উচ্চস্থান দান করিয়াছেন—

ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্ বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ।
ঊরূ তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত॥

ঋগ্বেদ-সংহিতায়াং ৪।৮।১৯
শুক্ল-যজুর্ব্বেদ-সংহিতায়াং ৩১।১১
অথর্ব্ববেদ-সংহিতায়াং ১৯।৬।৬

শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠির মহারাজের রাজসূয় যজ্ঞে ব্রাহ্মণগণের পদ-ধৌতির ভার লইয়াছিলেন "——কৃষ্ণঃ পাদাবনেজনে।

শ্রীভাগবতে ১০।৭৫।৫

সে ব্রাহ্মণগণ কি অধুনাতন সময়ের অংশ্চাসী ব্রাহ্মণ?

(ক্রমশঃ)

প্রাচীন ভারতের জ্ঞান-পিপাসা।

লেখক সম্পাদক।

জ্ঞানের জন্য একদিন ক্রান্তদর্শী মন্ত্রদ্রষ্টা মনীষি-মহর্ষিগণের যে আবেগময়ী প্রার্থনা-গীতি, ভারতের আকাশ বাতাস পূর্ণ করিয়া প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহার পরিচয় বৈদিকসাহিত্যের গীতিরত্নভাণ্ডারে পাওয়া যায়। মহর্ষিগণের হৃদয়ের সেই প্রাণময়ী গীতি এই "অসতো মা সদ্ গময়—তমসো মা জ্যোতির্গময়—মৃত্যোর্মামৃতং গময়।"—অর্থাৎ অসৎ হইতে আমাকে সত্যে লইয়া যাও,—তমঃ হইতে আমাকে জ্যোতিতে লইয়া যাও—মৃত্যু হইতে আমাকে অমৃতে লইয়া যাও।

অসৎ বা অসত্যের অধিকার হইতে সৎ বা সত্যের অধিকারে প্রবেশ করিবার জন্য, অন্ধকারের বা অজ্ঞানের অধিকার হইতে আলোকের—জ্ঞানের পুলকময় প্রদেশে উপস্থিত হইবার জন্য, আর মৃত্যুর আয়তন হইতে অমৃত বা অমরণের রাজ্যে যাইবার জন্য, প্রাণের একটা তীব্র আবেগ—অদম্য উচ্ছ্বাস এই গীতিতে প্রকাশমান।

আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে, মনীষীরা বলিতেছেন,—সত্যের রাজ্য, আলোকের দেশ অমৃতের অধিকার তাঁহাদের অভীপ্সিত। তাঁহাদের হৃদয় উহাদিগকে লাভ করিবার জন্য সতত লালায়িত, কিন্তু ঐ সকল সামগ্রী সুলভ নহে, স্বল্পায়াসলভ্য নহে! তাঁহাদের হস্ত উহাদিগকে আয়ত্ত করিতে পারিতেছে না। তাই বিশ্বকারণের নিকট তাঁহারা প্রার্থনা জানাইতেছেন—'প্রভো, আমাকে অসত্য হইতে সত্যে, অন্ধকার হইতে আলোকে এবং মৃত্যু হইতে অমৃতের রাজ্যে লইয়া যাও।

এখানে যেমন একটা পিপাসার পরিচয় প্রকট হইতেছে, তেমনি পিপাসা-পূরণে স্বীয় অক্ষমতাও প্রকাশ পাইতেছে। জীবের স্বভাবই এই, যখন সে স্বীয় অভাব বা অসম্পূর্ণতার প্রতীকার করিতে নিজেকে অসমর্থ বা অশক্ত মনে করে, তখনই সে আত্মবিশ্বাসে যাহাকে সমর্থ বা শক্তিমান্ বলিয়া মনে করে, তাহারই নিকট উহার প্রতীকারার্থ প্রার্থনা জানায়—আবেদন নিবেদন করে। জগতের সকলদেশের সকলশ্রেণীর ঈশ্বরবিশ্বাসী মানুষই ঈশ্বরকে জগতের নিয়ন্তা, সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান্ ইত্যাদিরূপে বিশ্বাস করে; ভারতীয় মনীষিগণও ঐরূপ ধারণাই পোষণ করিতেন। কাজেই তাঁহারা অভীষ্টলাভের জন্য সর্ব্বশক্তি জগৎকারণের উদ্দেশে প্রাণের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

যে পিপাসার আলোচনা করিতেছি, তাহার সংক্ষিপ্ত মৌলিক পরিচয় একশ্রেণীর অভাববোধ। প্রার্থনার উদয় হয় কোথায়? যেখানে অভাববোধ আছে, অধিকন্তু প্রয়োজনজ্ঞানও বিদ্যমান, সেখানেই প্রার্থনা প্রকাশ পায়। সহজ কথায় "আমার যাহা নাই—অথচ আমার যাহাতে প্রয়োজন আছে, তাহাই আমি চাই।" যাহা নাই, তাহার যদি প্রয়োজনও না থাকে, তবে তাহা চাই না। যত নাই, ততই কি চাই? মোটের উপর 'নাই' বুদ্ধির সঙ্গে 'চাই' বুদ্ধির একটা সম্বন্ধ বুঝা যায়।

এ প্রসঙ্গে আমরা বুঝিতেছি যে, যাঁহারা এই প্রার্থনাগীতি গাহিয়াছিলেন, সেই বৈদিক মনষিগণ নিজেদের জ্ঞানপিপাসাকে তখনও সংযত করিতে পারিয়াছিলেন না। আমরা তাঁহাদিগকে যতই 'আপ্ত'—'ক্রান্তদর্শী' পূর্ণজ্ঞানী' বলিয়া মনে করি না কেন, তাঁহারা কিন্তু নিজেরা জ্ঞানরাজ্যে উপনীত হইবার জন্য কাতরপ্রাণে আকুলপ্রার্থনা জানাইয়া বুঝাইয়া গিয়াছেন যে, তাঁহারা জ্ঞানের আয়তন সম্পূর্ণ অধিকার করিতে পারেন নাই।

প্রকৃতপ্রস্তাবে মানুষ যতই জ্ঞানী বলিয়া বিবেচিত হউক না কেন, জ্ঞানের বিশালবারিধি চিরদিনই তাহার পুরোভাগে থাকিবে। মানুষের জ্ঞান চিরকালই সসীম সান্ত। যদিও সীমারেখা ক্রমে দূর সরিয়া যাইবে, তথাপি এমন দিন মানুষ কল্পনায়ও আনিতে পারে না, যেদিন তাহার জ্ঞাতব্য পরিসমাপ্ত হইবে—জানিবার আর কিছুই থাকিবে না। মানুষের জ্ঞানের ক্রমোন্নতি হয়, পরিসমাপ্তি হয় না। মনুষ্যজ্ঞানের সীমাচক্র পরিবর্তিত ও স্থানান্তরিত হয়, তথাপি মনুষ্যজ্ঞান সসীম। পশুজ্ঞানও সীমাবদ্ধ, তবে তাহার সীমারেখা পরিবর্তন বড় হয় না। আবহমানকাল হইতেই গোজাতি ঘাস খায়, ব্যাঘ্র মাংস খায়—এই রীতি চলিতেছে। মনুষ্যের কিন্তু পরিবর্তন যথেষ্ট দ্রুতবেগে হইয়া থাকে। জ্ঞানসীমাপরিবর্তনের কথা লইয়াই মনুষ্য ও পশুতে প্রভেদ। জ্ঞানের ক্রমোন্নতি হয় দেশান্তরে অবস্থান্তরে-ভাবান্তরে। জ্ঞানের পরিসমাপ্তি দেখি না—পরিণতি পরিবৃদ্ধি দেখি। জ্ঞানের স্রোত চলে, নিবৃত্ত হয় না। জিজ্ঞাসার বা পিপাসার সুতরাংই নিবৃত্তি নাই। উহা অনন্তের অভিমুখে অবিরাম ছুটিতেছে, কবে কোথায় নিবৃত্ত হইবে বা না হইবে, কে বলিতে পারে? তবে অনন্তের দিকে ইহার গতি—একথায় সন্দেহ নাই।

প্রকৃতপক্ষে আমরা অপূর্ণ; পূর্ণতা চাই। আমরা অনেক সময় এই কথাই ভুলিয়া যাই তাই আমরা পূর্ণতাকে পশ্চাতে রাখিয়া অপূর্ণতাকে

পুরোভাগে স্থাপন করি। শুধু আমরা নয়, জগতের অনেকজাতিই এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী। আমরা যতদূর পশ্চাতে কল্পনানেত্রে দৃষ্টিপাত করিতে পারি, তাহাতে আমাদের আদিমযুগ "সত্যযুগ।" তখন পূর্ণ পুণ্য, পূর্ণ ধর্ম্ম, পূর্ণ জ্ঞান। তৎপরে ত্রেতাযুগে ধর্ম্মজ্ঞান প্রভৃতির পাদহ্রাস, তৎপরে দ্বাপরে ধর্ম্ম ও জ্ঞানাদির অর্দ্ধলোপ, তাহার পরে কলিযুগে ধর্ম্ম ও জ্ঞানাদির পাদস্থিতি ত্রিপাদনাশ। এ ধারণায় বুঝা যায়, উন্নতির স্রোত অতীতের দিকে আর অধঃপতনের প্রবাহ ভবিষ্যতের দিকে। যুক্তিতর্কে—বিচারে এ ধারণার ভিত্তিভূমি দৃঢ় মনে হয় না, কারণ বৈদিক মনীষিগণ পূর্ণজ্ঞানের অধিকারী ছিলেন না, পরন্তু তাঁহারা জ্ঞানপিপাসু ছিলেন—একথা তাঁহারা নিজেরাই পূর্ব্বোক্ত প্রার্থনামন্ত্রে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের যে অপূর্ণতাবোধ ছিল, উহার আর অন্য প্রমাণের প্রয়োজন কি? আমরা অপূর্ণ, পূর্ণ হইতে চাই—এই আকাঙ্ক্ষা না থাকিলে উন্নতি হইতে পারে না। বৈদিক মনীষিগণের ঐরূপ বোধ ছিল বলিয়াই তাঁহারা জগতে বরেণ্য হইয়াছিলেন। প্রাচীন-ভারতে অভাববোধ ছিল। শিল্পকলায়, ভৈষজ্যবিদ্যায়, জ্যোতির্বিজ্ঞানে, ভাষাতত্ত্বানুশীলনে প্রাচীন ভারতীয়গণ নিজেদের জ্ঞান অসম্পূর্ণ মনে করিতেন, এমন কি, অপর জাতির নিকট হইতে জ্ঞানরত্ন আহরণ করিয়া নিজেদের জ্ঞানভাণ্ডার পূর্ণ করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না—ইহারও প্রমাণ পাওয়া যায়। "জ্ঞানের ভাণ্ডার আমাদের গৃহেই পূর্ণতালাভ করিয়াছে, আমাদের কোনও কিছুর অভাব নাই"—এরূপ ধারণা আত্মোন্নতির অন্তরায়।

এখন তর্ক হইতে পারে, বেদের নিত্যতা ও সর্ব্বজ্ঞানময়ত্ব বিশ্বাস করিলে, জ্ঞানের অপূর্ণতা স্বীকার করা যায় না। প্রত্যুত্তরে বলা যায়, বেদ অর্থ অসীমজ্ঞানরাশি। উপলব্ধ 'বেদ'-নামক গ্রন্থরাজীতে অসীমজ্ঞানের যতটুকু সম্ভব স্থান পাইয়াছে, আরও বহুজ্ঞান উহার বাহিরে বিদ্যমান—ইহা যেমন সত্য, তেমনি বেদেরও বহুশাখা—বহুভাগ অনাবিষ্কৃত বলিয়া, বেদগ্রন্থের প্রতিপাদ্য জ্ঞানেরও সীমানির্ণয় করা অসম্ভব—ইহাও সত্য। শাস্ত্রকর্ত্তারা সবই বেদে ছিল—এ বিশ্বাস পোষণ করেন, তাই তাঁহারা উপলব্ধ বেদে নাই—এমন কিছু জ্ঞানের সংবাদ পাইলেই বলেন—"উহাও বেদে ছিল, সে বেদাংশ এখন লুপ্তগুপ্ত। শুধু বেদে ছিল—এমন নয়, বেদেই উহার মূল।" পুরাণ ইতিহাস স্মৃতি তন্ত্র প্রভৃতিতে এমন কথা পাই, যাহা বেদে পাই না। সে স্থলেও শাস্ত্রকর্ত্তারা বলেন,—"ঐ সকল পুরাণ স্মৃতি প্রভৃতির মূল যে বেদভাগ, তাহা

এখন লোকচক্ষুর অগোচরে।" পুরাণ স্মৃতি তন্ত্র কিছুতেই নাই, অথচ জ্ঞানিগণের আচরণ দেখা যায়—এরূপস্থলে শাস্ত্র বলেন—"সময়শ্চাপি সাধূনাং প্রমাণং বেদবদ্ ভবেৎ; সাধুগণের আচরণ বেদবৎ প্রমাণ।" বেদ অসীমজ্ঞান, বেদগ্রন্থ অনন্তশাখ, একভাবে অসীম। সুতরাং জ্ঞানের ক্রমোন্নতিপথে এমতে দোষ-শঙ্কা নাই। জ্ঞানের ক্রমোন্নতিপথে ঋষিগণ অর্গল প্রদান করেন নাই। তাঁহারা নিজেদের জ্ঞানপিপাসা জানাইয়া জ্ঞানের স্রোত চিরদিনই উন্মুক্ত—ইহা বুঝাইয়া গিয়াছেন। এই ভারতেই জ্যোতিঃশাস্ত্রে সূর্য্যকে সৌরজগতের কেন্দ্রস্থানীয় এবং মতান্তরে পৃথিবীকে উহার কেন্দ্রস্থানীয় বলা হইত। কেহ ভাবিতেন, সূর্য্য পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করেন, কেহ ভাবিতেন—পৃথিবী সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করেন। আর্য্যভট্ট, ভাস্করাচার্য্য ও বরাহমিহির এই একই দেশের পণ্ডিত, একই জ্যোতির্ব্বিজ্ঞানের বিভিন্ন মতবাদের আবিষ্কর্ত্তা। জ্ঞানের রাজ্যে 'ইদমেব তত্ত্বম্'—এ ধারণা লইয়া তাঁহারা পরিতৃপ্ত হইতে পারেন নাই বলিয়াই নানামত ও নানাপথের মধ্য দিয়া সত্যের অনুসন্ধান চলিয়াছিল। যদি পৃথিবীকে অচলা মনে করিয়া ভারতবাসীর পরিতৃপ্তি হইত, তাহা হইলে পৃথিবীর গতি আবিষ্কৃত হইত না। আমরা সকল ক্ষেত্রেই দেখিতে পাই, প্রাচীন ভারত কোনও সিদ্ধান্তের পক্ষপাতী হইয়া নবাবিষ্কারের পথ কণ্টকিত করিতে চাহে নাই।

বর্ত্তমানে যদি কাহারও ঐরূপ ধারণা থাকে, যে, "আমরা জ্ঞানসৌধের শীর্ষদেশে আরোহণ করিয়াছি—আমরা জগতের সকল জাতি অপেক্ষা বরিষ্ঠ ও গরিষ্ঠ,"—তাহা হইলে তাঁহার এই ধারণার মূল্য পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য। জগতের মধ্যে যাঁহারা জ্ঞানের সাধক উপাসক, তাঁহারা আমাদিগের এই সর্ব্বজ্ঞতাভিমান কতদূর সমর্থন করেন, তাহা একবার পরীক্ষা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। গৃহে বসিয়া "আমি সবই জানি"—এরূপ বিশ্বাস পোষণ করা সম্ভব, কিন্তু জগতের সমক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া, নিজের জ্ঞানগৌরবের মূল্য পরীক্ষা করিলে, আর ঐরূপ ধারণা স্থির রাখা সম্ভব হয় না। আমরা অনেক সময় কূপমণ্ডূকবৎ নিজের মধ্যেই নিজে পরিতৃপ্ত থাকি, বাহিরের আলোকে যাইতে চাহি না,—এজন্যই ঐরূপ ধারণার দৃঢ়তা ঘটে। যখন জগতের দিকে চাহিয়া পরীক্ষাসমীক্ষার পথ দিয়া নিজের স্থান বা মান নির্ণয় করিতে যাই, তখনই দেখি, আমরা দীনাতিদীন হীনাতিহীন। মানুষের জ্ঞানগৌরব ও শক্তিসামর্থ্যে বিচারক্ষেত্রে আমাদের স্থান অতি নিম্নে। প্রাচীন কাহিনীর প্রসঙ্গে, জ্ঞানের

বিভিন্নশাখার অতীত ইতিহাসের আলোচনা আরব্ধ হইলে, মধ্যে মধ্যে আমাদের পূর্ব্বপিতৃগণের নাম সসম্মানে উচ্চারিত হইয়া থাকে বটে, কিন্তু জগতের বর্ত্তমান জ্ঞানসম্পদের বিবরণীতে আমাদের স্বতন্ত্র স্থান নাই বলিলেও চলে।

সর্ব্বক্ষেত্রেই বিচারশক্তির ব্যবহার করা উচিত। এই বিচারশক্তি না থাকিলে, মানুষ শুধু অন্ধকারের রাজ্যে ঘুরিয়া বেড়ায়। চাই বিচারশীলতা, চাই চিন্তাশীলতা, চাই সত্যানুসন্ধানের প্রবল পিপাসা, নচেৎ সমস্তই ব্যর্থ। যাহার নিজের জ্ঞানপিপাসা থাকে, সহজেই তাহার নিজের অজ্ঞতাবোধও থাকে। অজ্ঞতাজ্ঞানই মুখ্য জ্ঞানার্জ্জনের সোপান। জগদ্বিখ্যাত জ্ঞানী সক্রেটিশ নিজেকে 'মূর্খ' মনে করিতেন এবং জনগণের কাছে প্রকাশ করিতেন "আমি মূর্খ।" একদা সক্রেটিশের কথায় লোকে সন্দিহান হইয়া প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হইবার জন্য দৈববলের শরণাপন্ন হইল। দৈববাণী হইল—"সক্রেটিশ মহাজ্ঞানী।" জনগণ সক্রেটিশকে জিজ্ঞাসা করিল—"দৈববাণী কি মিথ্যা? দৈববাণী হইয়াছে সক্রেটিশ মহাজ্ঞানী।" সক্রেটিশ বলিলেন "আমি জানি যে আমি কিছুই জানি না; আর আমি নিজের অজ্ঞতা জানি বলিয়াই ঐরূপ দৈববাণী হইয়াছে।" জগদ্বরেণ্য মহামতি নিউটন বলিতেন "আমি জ্ঞানসমুদ্রের তীরদেশে দাঁড়াইয়া উপলখণ্ড সংগ্রহ করিতেছি মাত্র; জ্ঞানার্ণব আমার পুরোভাগে অবস্থিত।" এখানেও তাঁহার অজ্ঞতাবোধ বেশ পরিপুষ্টভাবে পরিদৃষ্ট। যতই জ্ঞানীর জীবন আলোচনা করিব, ততই দেখিব, জ্ঞানপিপাসা-মূলে অজ্ঞতাবোধ ভারতীয় মহর্ষিদেরও তাহাই ছিল, তাঁহারাও জ্ঞানপিপাসু ছিলেন, জ্ঞানাভিমানী ছিলেন না।

যদি আবার দেশে অজ্ঞতাবোধ ও জ্ঞানপিপাসা জাগে, যদি বিচারশীলতা ও চিন্তাশীলতার বিকাশ হয়, তবেই জ্ঞানোন্নতি হইবে—স্বাধীনতা আসিবে মনে জ্ঞানে স্বাধীনতা না আসিলে, দৈহিক বা দৈশিক স্বাধীনতা আসে না—মহর্ষির আবেগময়ী প্রার্থনায় আমরা ইহাও বুঝিতে চাই।

অসহায়।

লেখক—শ্রীনগেন্দ্রচন্দ্র দেওয়ান।

আমার আমারে নিয়ে আমি বড় হয়েছি বিভোর
একি নেশা ঘোর!
আপনার সুখ দুখে জড়াইয়া চিত্ত আপনার
থাকি অনিবার;
মনে করি, বারম্বার ছুটে গিয়ে ধরিব চরণ
ছিঁড়িয়া বন্ধন—
একি মায়া! কি কুহক! কি নেশায় ফিরি আসি হায়
আমার সীমায়!
লাজে মরি, লাজে মরি; লীলাময় রাখ বৃথা খেলা
ফিরাও এ বেলা—
খেলার পুতুল করে নাশিতেছ মোর অভিমান
চির দিনমান।
আমারে আমার মাঝে করিয়াছ বড় অসহায়
সৃজিয়া ধাঁধায়
বড় লজ্জা বড় ব্যথা বাজে প্রাণে, মানিয়াছি হার,
ক্ষম কৃপাধার।

"চণ্ডী ও গীতোক্ত নিষ্কামবাদ।"

লেখক—শ্রীসুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

কিন্তু আত্ম-চৈতন্য লাভ করিয়া উদ্বুদ্ধ হইলে জীব স্ব-শক্তিতে তাহার বাসনা প্রপূরণ করিবার শক্তি অনায়াসে লাভ করে।

চণ্ডীতে সেইজন্যই আমার ধারণা হয় প্রবুদ্ধ জীবচৈতন্য "দেহি দেহি" বলিয়া ভগবতী মহাশক্তি প্রকৃতির নিকট শুদ্ধভোগ প্রার্থনা করিতেছে।

জীব আপনাকে শুদ্ধ করিয়া বাসনাহীনতা-পাশমুক্ত করিয়া শুদ্ধ ও মুক্ত হইয়া শুদ্ধসত্তায় যাহা প্রাপ্ত হয়, উহার ভোগে জীব ভোগাধীন হইয়া ভোগ-পাশে আবদ্ধ হয় না। ভোগমুক্ত হইয়া ভোগ করে, অনাসক্ত হইয়া কর্ম্ম করে। অনাসক্ত ভোগ কর্ম্মফল মুক্তির উপায়।

কর্ম্ম করিলেও কর্ম্ম-বন্ধনে পড়িতে হয় না। কর্ম্মকে অনুসরণ করিতে হয় না, ভোগকে অনুসরণ করিতে হয় না; যেহেতু জীব তখন ভোগাধীন নয়, কর্ম্মানুবন্ধ নয়, ভোগ তাঁকে অনুসরণ করিতেছে; কর্ম্ম তাঁকে অনুসরণ করিতেছে। জীব তখন প্রকৃতির বশীভূত নহে, প্রকৃতি জীবের অধীন, জীবের বশীভূতা। এইরূপে শুদ্ধ মুক্ত স্বভাববান্ জীব, শুদ্ধ মুক্ত হইয়া অনুগামিনী প্রকৃতিযোগে শ্রী-মান "শ্রীমন্ত" ঐশ্বর্য্য-মর্য্যাদা-সম্পন্ন হয়।

ভগবদীয় ঐশ্বর্য্য ও জ্ঞান সদ্‌গুণ লাভ করিলে জীব স্ব-ঐশ্বর্য্যে স্ব অর্থাৎ আত্মার মর্য্যাদায় মহিমান্বিত মহামহিমাযুক্ত হইয়া "ঈশ্বরত্ব" প্রাপ্ত হন। রূপ গুণ শোভা সম্পদে শৌর্য্য বীর্য্য অপূর্ব্বভাবে জীবরূপী মানব মণ্ডিত হন।

জীবের—সাধারণতঃ মনুষ্যের মধ্যে দেখা যায় ভগবদীয় ঐশ্বর্য্যে আত্মা ঐশ্বর্য্যান্বিত করিতে হইলে স্বীয় পুরুষকারবলে দৈব আয়ত্ত করিয়া থাকেন। "প্রকৃতি" বশীভূতা না হইলে "স্ব" পুরুষকারসম্পন্ন হয় না। "স্ব-পৌরুষে" "পুরুষকার আয়ত্ত" করিতে না পারিলে "দৈব আয়ত্ত" হয় না। "দৈব" প্রবল, কিন্তু পুরুষকারও দৈববল। পুরুষকার-বলেই "দৈব' অনায়াস-আয়ত্ত হয়। এইজন্যই উপনিষদে বলিয়াছেন—"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"। দেহ প্রাণ মন বিজ্ঞান এবং আনন্দ এই পঞ্চ কোষাশ্রিত "জীবাত্মা" দেহ প্রাণ মন আদির অধীন হইলে জীবের অবস্থা পরিণামে কিরূপ দাঁড়ায়? যেমন ঘোড়া গাড়ীর অগ্রভাগে যুড়িয়া গাড়ী না টানাইয়া গাড়ীর পেছনে ঘোড়া যুড়িলে যাহা হয় সেইরূপ বিড়ম্বনাময় অবস্থা "জীব" প্রাপ্ত হয়। দেহ প্রাণ মন আদি জীবের প্রকৃতি। "জীব" দেহ প্রাণ মন আদির অধীন হওয়া স্বাভাবিকরূপে ভগবদীয় বিধান নহে। দেহ প্রাণ মন আদি জীবের অধীন।

রিপু-বশবর্ত্তী ইন্দ্রিয়াদি ও মনের প্রবৃত্তিও প্রকৃতির অধীন হইয়া জীব কাম্যফলাভিসন্ধিৎসু হইলে অবিদ্যাচ্ছন্নবশতঃ সংসারাবর্ত্তে পড়িয়া বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হয়। স্বাধীনভাবে জীব রিপু ও রিপু-প্রবৃত্তির উপর আধিপত্য করিয়া ইন্দ্রিয়াদিযুক্ত মন বশীভূত করিয়া ইন্দ্রিয়বৃত্তির সংযম করিলে জীব সংসারাবর্ত্তে ঘুরিয়া 'জন্ম' বিড়ম্বনা লাভ করে না।

এইজন্য 'চণ্ডীতে' অর্গলাস্তবে মহাশক্তি ভগবতীর নিকট ভগবদীয় প্রসাদ-রূপে ভোগ প্রার্থনা করা হইয়াছে।

অর্গলাস্তবের অন্তর্গত একটা শ্লোক দ্বারা উপমা দিতেছি। অর্গলাস্তবে আছে "ভার্য্যাং মনোরমাং দেহি মনোবৃত্তানুসারিণীম্" এই শ্লোকটী আমার অন্যান্য প্রবন্ধেও প্রসঙ্গান্তরে উল্লেখ করিয়াছি।

যাহা হউক, পুনরায় এই প্রসঙ্গেও উহার উল্লেখ করিলাম, যেহেতু আমরা যোনি-পাশবদ্ধ সংসার-প্রবৃত্ত রিপু-প্রবৃত্তি-পরায়ণ মানব। আমাদের "আত্মার" উন্নতিকল্পে প্রকৃত কিরূপভাবে রিপু-সেবিত হওয়া বাঞ্ছনীয় তাহাও লক্ষ্য করিয়া বিচার করা উচিত।

যাউক, এখন দেখা যাক; সংসার-প্রবৃত্ত হইয়া সংসারী হইতে হইলে 'ভার্য্যা' ত চাই? সুতরাং 'ভার্য্যা' যখন চাই, তখন রূপবতী সুন্দরী ভার্য্যা কে না ইচ্ছা করে? দেখা যাউক 'মনোরমা' ভার্য্যা কেমন করিয়া পাওয়া যায়। মাগো ভগবতী! আমায় একটি মনোরমা ভার্য্যা দেও, যে ভার্য্যা আমার মনোবৃত্তি অনুসরণ করিয়া চলিবে। আমায় রূপ, জয়, যশ ইত্যাদিও দিও। অর্থাৎ মোট কথা আমায় "শ্রী-শক্তি" ও ঐশ্বর্য্যান্বিত করিয়া জগতে জয়-যুক্ত করিয়া ভাগ্য ও ভোগ প্রদান কর।

ইহা চাহিতে হইলে আমার আত্মমর্য্যাদায় আমার আত্মাকে (স্ব) "শ্রী-শক্তি ঐশ্বর্য্যান্বিত" করিতে হইবে ত?

ভার্য্যা মনোরমা চাহি, যে ভার্য্যা আমার মনোবৃত্তি অনুসরণ করিয়া চলিবে। সুতরাং আমার মনোবৃত্তিগুলিকে 'মনোরম' না করিতে পারিলে, মনোরমা ভার্য্যা আমার মনোবৃত্তি অনুসরণ করিবার জন্য আসিবে কেন? সুতরাং "আত্মা" আত্মার মর্য্যাদায় মনোরম হইলেই তবে না প্রকৃতিগতভাবে মনোরমা ভার্য্যা আত্মায়ত্তশক্তিতে লাভ করিবে?

ইংরাজীতে বলে Lower 'I,' Higher 'I' অথবা Lower 'Self,' Higher 'Self' অর্থাৎ "স্ব"র উত্তম ব অধম অবস্থা, ইহা হয় কেন? প্রকৃতি এবং প্রবৃত্তির অনুগত হইয়া হয় ত? উচ্চ এবং অধম প্রবৃত্তিজনিত প্রকৃতি গঠিত হয়। প্রকৃতি হইতে "স্ব-ভাব" সঞ্জাত হয়; অর্থাৎ "স্ব" এর 'ভাব' অনুসারে স্ব-ভাব প্রকৃতি গঠিত হয়।

গীতায়ও উল্লেখ আছে "দৈবী" "আসুরী" ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকৃতি "জীবের" হয়। এই দৈবী প্রকৃতিই Higher "I" or 'Self', আসুরী প্রকৃতি Lower 'Self' or 'I', প্রেত-পিশাচ ইত্যাদি প্রকৃতি আরও নিম্ন প্রকৃতি।

রিপু-প্রকৃতি যত প্রবল হইবে, মানুষ যত 'রিপুর' অনুগত হইয়া "রিপুর" অধীন হইবে, ততই নিম্নগামী হইয়া পড়িবে, তখন "জীবের" পরিণতি অধম হইতে অধমতর অবস্থায় উপনীত হইবে। রিপুর প্রাবল্যে পাশবিকতার বৃদ্ধি হইবে। মানবাত্মা পশুভাবে পরিচালিত হইলে পশু-প্রকৃতি পশু স্ব-ভাবে পরিণত হইয়া পশ্বাদি প্রাণিজগতে জীবের অধোগতি হওয়া আশ্চর্য্য বা অসম্ভব নহে।

মনুষ্য-প্রকৃতিতে মানুষ আজকাল পশুরও অধম দেখা যায়। এরূপ দুরাচার পশু-প্রকৃতি মানবকে সাধারণতঃ লোকে "পশ্বধম" বলে। উহা গালি নয় "আত্মার" অভিসম্পাৎ। এরূপভাবে আত্মাবনতি-প্রাপ্ত মানব আত্মার অবমাননায় অভিশপ্ত হইয়া আপনার জন্মান্তর-পরিণতিতে পশু-জন্মও লাভ করে। অভিশপ্ত হইয়া মানবাদি শ্রেষ্ঠ জীবকেও নিকৃষ্ট যোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে হইয়াছে। রিপুর অধীন হইয়া পশুভাবান্বিত হইলে ত কথাই নাই।

'ভরত' রাজা, বাণপ্রস্থধর্ম্মী হইয়া দয়াবশতঃ হরিণশিশুকে পালন করিয়া শেষে অত্যন্ত স্নেহানুরক্তিবশতঃ হরিণ-শিশুর মায়ায় আবদ্ধ হইয়া জন্মান্তরে ভ্রষ্ট হইয়াছিলেন। দয়া-স্নেহাদি পশুভাব নহে, তথাপি উচ্চভাবাধীনেও মায়া সঞ্জাত হওয়ায় তাঁহাকে অধম গতি লাভ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু উচ্চভাব-জনিত সংস্কার ও সাধনা ছিল বলিয়াই জন্মান্তর-বিড়ম্বনা লাভ করিয়াও ভ্রষ্ট হন নাই। সেই সেই তনু আশ্রয় করিয়া সেই সেই তনুর "আসনে" থাকিয়াও তাঁর জীবাত্মা সাধনশক্তিতে শ্রেষ্ঠ হইয়া উদ্ধার পাইয়াছিলেন।

গবাদি প্রাণীরাও শান্ত ও উপকারী জীব। বিশেষতঃ গো-জাতি স্বভাব-শান্ত উপকারী, সত্ত্বগুণ প্রধান জীব। প্রাণি-জগতে "গো-জাতির" তুল্য শান্ত সত্ত্বগুণ-প্রধান উপকারী জীব আর ত দেখা যায় না। গো-জাতির বিষ্ঠা মূত্র পর্য্যন্ত উপকারী ও সত্ত্বগুণান্বিত। অপর জীবের বিষ্ঠার দৌর্গন্ধ্য গো-বিষ্ঠাচ্ছাদিত করিলে নিবারিত হয়। গোময়াদির লেপনে গৃহাদি এবং অপবিত্র ভূমি 'শুদ্ধ' হয় ত? তথাপি ত গো-জাতি ইতর জীব। গো-জাতি হিংসিত হইলেও হিংসা করে না, এইজন্য গবাদি প্রাণী—গো' মেষ গর্দ্দভ অশ্ব ইত্যাদি নিরীহ প্রাণীগুলি সর্ব্বজীবের ভক্ষ্য হইয়া হিংসিত হইবার জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে কেন?

ব্যাঘ্রাদি ভীষণ হিংস্রক দুর্দ্ধর্ষ স্বভাবান্বিত প্রাণী স্বীয় ওজোবীর্য্যে হুঙ্কার-দাপটে বিভীষিকা উৎপাদন করে, অথচ উহারা আত্মরক্ষা এবং পর-হিংসা

করিবার জন্য দংষ্ট্রা-নখরাদি ভীষণ শক্তি-আয়ুধসম্পন্ন হইয়া নিরীহ জীব-ভক্ষক হইয়া হিংসা-ভোজনে জীবন ধারণ করে। আর গবাদি শান্ত নিরীহ উপকারী প্রাণীগুলি হিংসিত হইবার জন্যই যেন জন্মিয়াছে, অথচ আত্মরক্ষার জন্যও— পরহিংসা দুর্ব্বৃত্ততা ত দূরের কথা—আত্মরক্ষার জন্যও নখর-দংষ্ট্রাদি আয়ুধ ত পায়ই নাই, একটু বিরক্তি, অনিচ্ছা প্রকাশের জন্যও মাথা নাড়িবার, তীব্রভাবে মনের অনিচ্ছা, বিরক্তি প্রকাশ করিবারও শক্তি নাই।

মাথা নাড়িবার জন্য "শৃঙ্গ" (শিঙ) পাইয়াছে, তাও অনেকের ভাগ্যে ভালরূপ "শিঙ" গজায়ও না। আর তাও একটু জোরে "শিঙ" নাড়িলে, "শিঙ" ঠুকিলে, ঘষিলে "শিঙ" ভাঙ্গিয়া যায় কেন? সর্ব্বগুণান্বিত হইয়াও "ভীরু কাপুরুষত্ব" আছে বলিয়া প্রকৃতির অভিসম্পাতে এ দুর্দ্দশা হয় নাই কি?

হস্তী ঐরাবত অতিকায় প্রাণী, বলবান হইলেও "বিক্রম" নাই। বুদ্ধি আছে, বল আছে, দেহটাও হাড়-মাংসের একটা বিকৃত বোঝাও সত্য, দলিত মথিত করিতে পারে। কিন্তু, বোঝা বহিতে ব্যবহৃত হয়। দন্ত আছে, মদ-স্রাবী দন্তান্বিত জীব। "মদ" স্বভাবে প্রমত্তও হয়, অনিষ্ট বিভীষিকা উৎপাদন করে, বৃংহিত ধ্বনি করে, কিন্তু বিক্রমোদ্ধত "হুঙ্কার—ত্রাস-উৎপাদিনী শক্তি তাহাতে নাই। সিংহ ব্যাঘ্রের নিকট পরাভূত পর্য্যুদস্ত হয়।

সুতরাং 'রিপু'ও তুচ্ছ নয়। রিপুরও উত্তম অধম অবস্থা এবং পর্য্যায়-ভেদ আছে। ক্রোধ, রোষ, দ্বেষ, হিংসা, খলতা, নিন্দা ইর্ষ্যা রিপু পর্য্যায়ে ষড়্‌রিপুর অন্তর্গত "ক্রোধেরই" বিভিন্ন পর্য্যায়। 'রোষ' এবং 'রেশ' একই পর্য্যায় অন্তর্গত। 'রেশ' বীর্য্য পৌরুষত্বের পরিচায়ক, 'রোষ' রিপু। পরশ্রী-কাতরতা হিংসাদি পর্য্যায়ে ক্রোধ রিপুরই একটা অবস্থা।

কাজেই দেখা যায় "রিপু" গুলিরও 'সৎ-ভাব' 'অসৎ-ভাব' আছে। ব্যবহার এবং প্রয়োগ অনুসারে পার্থক্য হয়। রিপু' গুলিরও প্রয়োজন আছে। রিপু দমিত বা রিপু বিজিত হইলে পুরুষার্থ সম্পাদিত হয়। "রেশ" তেজ প্রদান করে।

ইন্দ্রিয় দ্বারা 'রিপু' উপভুক্ত হয়। অত্যধিকভাবে অর্থাৎ অতিপ্রয়োগে এবং অহিত-ব্যবহারে কখনও ইন্দ্রিয়গুলি রিপু অনুগত বা অপগত হয়। ইন্দ্রিয় রিপুর অধীন হওয়া এবং রিপু ইন্দ্রিয়ের অধীন হওয়ার পার্থক্য আছে। রিপুর অধীন হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে। উহার ফলে দৌর্ব্বল্য, বিকৃতি বৈকল্য উৎপন্ন হয়, এমন কি জীব ইহজন্মে জন্মান্তর-জাতলব্ধ দেহে দৌর্ব্বল্য বিকৃতি বৈকল্য প্রাপ্ত হয়।

(ক্রমশঃ)

আত্ম-কথা।

গীত।

লেখক—শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ বসু।

বল্‌ব কি মা দুঃখের কথা।
আমার মনে প্রাণে পাই যে ব্যথা।
অসুরে রেখেছ পায়, হায় কতই তোমার মমতা—
ভবে সাধকে কেন ফাঁকি দেও মা, স্বজ কেন এ শত্রুতা?
সুফলের আশা করি সদাই যার একাগ্রতা—
ওমা কভু কাছে, কভু দূরে কখন মা তিরোহিতা।
ওমা অসুরের ত পাঁচ বাসনা তারি কাছে উপনীতা—
এই সংসারে মা সং সাজায়ে দুঃখ দেও মা গুণাতীতা।
কত শক্তি ধর মাগো মানবে কর উন্মাদ—
তোমার পথে যেতে তোমায় পেতে, ঘটে যে কত প্রমাদ।
দেখ্‌ব আমি কতদিনে, করুণা মা হয় আমারে—
দেখ্‌ব কি সাধনে রাঙ্গাপায়ে রেখেছ মা ঐ অসুরে!
দেখ্‌ব মাগো পারি কিনা তোমারে জাগাইতে—
দেখ্‌ব পারি কিনা আমি মর্ম্মব্যথা ঘুচাইতে।
মায়ের মতন মাটী হ'য়ে ভুলে সব যন্ত্রণা ব্যথা—
লব মোক্ষপদ শিবের ভাণ্ডার যা ক'রবার ক'রো মা তা।
সাধে সাধ বেড়ে গেছে মা, ঘুচিল না মনের ব্যথা—
জীবন ত ফুরায়ে এল, বুঝিলাম না তোর বারতা।
গেল দিন অকারণ তাই ভাবি মা জগন্মাতা—
তুমি কেন হাসাও কেন কান্দাও, বুঝিনা তোর ক্ষমতা।
অতি দীন হীন আমি, নাহিক কোন যোগ্যতা
আর কিছু নাই শ্রীকৃষ্ণের শুদ্ধ এই ক্ষুদ্র কবিতা।
আমার এখন এই নিবেদন; ঈশ্বরী পরমা মাতা
যেন তোমার নামে তোমার প্রেমে থাকে প্রাণে একাগ্রতা॥

গীতা-নাটক।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

অষ্টম দৃশ্য।

রণক্ষেত্র—পাণ্ডবব্যূহ।

শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুন।

অর্জ্জুন। কৃষ্ণ হে! পুনঃ পুনঃ তুমি আমাকে যুদ্ধ ক'রবার জন্যে অনুরোধ ক'রে উপদেশ প্রদান কর্চ্ছো। আত্মার অমরত্ব বুঝলাম। কিন্তু এখনও আমার যুদ্ধ করা কর্ত্তব্যজ্ঞান হ'চ্ছে না। হে নায়ক! তোমার ন্যায় সর্ব্বরক্ষকের সঙ্গে থেকে আমি কি সর্ব্বসংহারক হব? ভগবন্! এই কি তোমার সুবাসনা? আমি সামান্য নরলোক। তোমার মহিমায় মহিমান্বিত। আমায় কুলাল-চক্রের ন্যায় ঘুরাইও না। দয়া কর।

শ্রীকৃষ্ণ। (স্বগত) সম্পূর্ণ আত্মধর্ম্মে অর্জ্জুনের ন্যায় ভক্তের জ্ঞানোদয় হচ্ছে না। (প্রকাশ্যে) হে পার্থ! আপাততঃ আমি সাংখ্যযোগ নামক আত্মতত্ত্ব-জ্ঞানযোগ তোমাকে উপদেশ করেছি! এক্ষণে প্রকৃত কর্ম্মযোগ বিষয়িণী বুদ্ধি কি তাহা শ্রবণ কর। তা হ'লে তুমি কর্ম্মবন্ধ হতে মুক্তি পাবে। নিষ্কাম কর্ম্ম-যোগের অনুষ্ঠান কদাচ বিফল হয় না। ইহা সম্পূর্ণ বিশুদ্ধভাবে অনুষ্ঠান না কর্ল্লেও কোন দোষ আসে না। ধর্ম্মের কথঞ্চিৎ অনুষ্ঠানও সংসারীকে ভীষণ বিপদ হ'তে পরিত্রাণ করে। ধর্ম্মনিষ্ঠ সংশয়-রহিত বুদ্ধিই একাগ্র হয়ে থাকে; আর প্রমাদ-জনিত বিবেকরহিত ব্যক্তির বুদ্ধি চাঞ্চল্যপ্রযুক্ত অনন্ত ও বহুশাখা-বিশিষ্ট হয়। বেদ সকল সকাম ব্যক্তিদিগের কর্ম্মফল প্রতিপাদক।

অর্জ্জুন। কৃষ্ণ! কি ধর্ম্ম অর্জ্জন কর্ল্লে আমি এ ভীষণ বিপদ হতে উদ্ধার পেতে পারি? আমার পক্ষে এ যুদ্ধ ত বিষম বিপদ ব'লে মনে হচ্ছে; এবং কিছুতেই আমি স্বীয় কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ কর্ত্তে পাচ্ছি না। মধুসূদন! আমি ত তোমার দাস, আমি কেন—জগৎ শুদ্ধ সবাইত তোমার দাস। দাসের প্রতি প্রভুর যে কর্ত্তব্য তাই অবধারণ কোরে আমার প্রতি যথাকর্ত্তব্য অনুজ্ঞা কর।

অর্জ্জুনের গীত।

দাসেরে করুণা কর হে প্রভু,
আমি তব দাস, তুমি মহাপ্রভু।
আমায় চরণ ছাড়া ক'রো না,
আমি তোমা বিনা আর জানি না।

যুদ্ধস্থলে আমার উপনীত মায়া,
মায়াময় তুমি সম্বর এ মায়া,
ঘোর সঙ্কটে প্রাণ যায় আমার,
রক্ষ রক্ষ মধুসূদন বিভু।
এ দুঃখ কহিব আর কাহায় ?
তুমি বিনা আর কে বুঝে তায় ?
শান্তিময় তব শ্রীচরণের ছায়া—
অধীনে বঞ্চনা ক'রো না তা কভু।
সাধন আরাধন কিছু নাহি শ্রীহরি
নিজগুণে নির্গুণে করুণা বিতরি
হ'য়ো না কাতর শ্রীরাস-বিহারি,
আমার তুমি বিনা কেউ নাই বিভু।

শ্রীকৃষ্ণ। পার্থ। তোমার ধর্ম্মই যে যুদ্ধ করা। বেদোক্ত কর্ম্মকাণ্ড ত্রিগুণাত্মকহেতু, সে কর্ম্মে সকাম ধর্ম্ম, কিন্তু তুমি নিষ্কাম হও। ঐ নিষ্কাম ধর্ম্ম লাভ কর্ত্তে হ'লে তুমি সত্বগুণ আশ্রয় কর। অলব্ধ বস্তুর লাভ, লব্ধ বস্তুর রক্ষায় নিশ্চেষ্ট এবং অনাসক্ত হও। কূপোদক যেমন সমগ্র সমুদ্র জলের কাজ দেয়, তেমন সমগ্র বেদজ্ঞান হতে বেদোক্ত আত্মজ্ঞান শ্রেষ্ঠ, মনে তাই আলোচনা করা কর্ত্তব্য। কর্ম্মেই অর্থাৎ নিষ্কাম কর্ম্মেই তোমার অধিকার সমাগত হোক; কর্ম্মফলে কখন তোমার অধিকার নাই জানবে। কর্ম্মের ফলাকাঙ্ক্ষী হ'য়ে যেন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হ'য়ো না এবং কর্ম্মত্যাগ-প্রবৃত্তি যেন তোমার মনে কখনও উদিত না হয়। ফল-কামনাযুক্ত সকাম ব্যক্তিগণ অতি দীন—কৃপার পাত্র। কর্ম্মগুলির মধ্যে সুকৌশল বুদ্ধিযুক্ত কর্ম্মই কর্ম্ম-যোগ এবং কর্ম্মবন্ধন হইতে বিমুক্ত হবার একমাত্র উপায়। এখন তোমার বুদ্ধি নানাবিধ লৌকিক ও বৈদিক বিষয় ব্যাপারে নিতান্ত উদ্‌ভ্রান্ত রয়েছে; যখন বিবিধ শাস্ত্রালোচনায় তোমার বুদ্ধিগত সন্দেহ দুরীভূত হোয়ে অর্থাৎ বিষয়ান্তরে আকৃষ্ট না হোয়ে নিশ্চল ও অচলভাবে পরমাত্মায় অবস্থান কোরবে, তখনই তুমি তত্বজ্ঞান ও যোগফল লাভ কোরবে। সমুদয় বেদে যে সকল কর্ম্মফল বর্ণিত আছে, সংশয়রহিত বুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তি একমাত্র ব্রহ্মে তৎসমুদায়ই প্রাপ্ত হ'য়ে থাকেন। মোক্ষ-সাধন-সম্পাদক কর্ম্মকৌশলের নামই যোগ। সংশয়-রহিত বুদ্ধি দ্বারা অনুষ্ঠিত কর্ম্মযোগই শ্রেষ্ঠ; কাম্য কর্ম্ম সমুদায় অপকৃষ্ট।

ন। কেশব! সমাধিস্থ স্থিতপ্রাজ্ঞ নিশ্চল বুদ্ধিযুক্ত ব্যক্তির লক্ষণ কি? স্থিতধীর কিরূপ বাক্য বা অবস্থান এবং তিনি কিরূপ কর্ম্ম করেন?

শ্রীকৃষ্ণ। পার্থ! যখন যোগী সর্ব্বপ্রকার মনোগত কামনা পরিত্যাগ করেন, এবং যাহার আত্মা আত্মাতেই সন্তুষ্ট থাকে, তখনি তিনি স্থিতপ্রাজ্ঞ ব'লে বিদিত হন। যিনি জাগতিক পদার্থে স্নেহ-শূন্য, যিনি প্রিয় বা অপ্রিয় বস্তুতে আনন্দিত বা বিষণ্ণ হন না, তাঁরই প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কচ্ছপ যেমন নিজ অঙ্গ সকল সঙ্কুচিত করে, তদ্রূপ তিনি উপভোগ্য বিষয় সকল হ'তে স্বীয় ইন্দ্রিয়গণকে বুদ্ধিবলে প্রতিনিবৃত্ত কর্ত্তে পারেন, তৎকালে তাঁর প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হয়। যাঁহার ইন্দ্রিয়গণ বশীভূত তাঁহার প্রজ্ঞা অচলা এবং তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ। ইন্দ্রিয়-উপভোগ্য বিষয়-চিন্তায় মানবের আসক্তি জন্মে। আসক্তি হ'তে ভোগাভিলাষ—কামনা জন্মে; কামনা-সিদ্ধির ব্যাঘাতে দ্বিগুণ কামনায় ক্রোধ জন্মে। ক্রোধ হ'তে সম্মোহ অর্থাৎ হিতাহিত-জ্ঞান শূন্যতা হয়; সম্মোহ হ'তে স্মৃতি-ভ্রম অর্থাৎ আত্মভ্রম; স্মৃতি-ভ্রম হ'তে সুবুদ্ধি-নাশ জন্মে এবং সুবুদ্ধি বিনাশ পেলে মানব অধঃপতিত বা মৃতবৎ হয়। যিনি সর্ব্বকামনা ত্যাগ ক'রে নিরহঙ্কার, নিস্পৃহ ও মমতাশূন্য হোয়ে, ভোগ্যবস্তু উপভোগ কোরে সংসারে বিচরণ করেন—তিনিই শান্তি-সুখানুভব করেন। ক্ষোভজনক ইন্দ্রিয়গণ যত্নশীল বিবেকী পুরুষের চিত্তকেও বলপূর্ব্বক হরণ করে; এই নিমিত্ত যোগশীল ব্যক্তিরা তাহাদিগকে সংযমনপূর্ব্বক মৎপরায়ণ হোয়ে থাকবেন।

সঙ্গীত।

ভবে সেই ত জীবন্-মুক্ত জন, জন্ম মৃত্যু যেই করে না কামনা
আত্মানন্দ হোয়ে বুদ্ধিযুক্ত র'য়ে, জলাঞ্জলি দেয় মনের সব বাসনা।
দুঃখে নাই রাগ, সুখেতে বিরাগ, ভয় ক্রোধে সদা বীতরাগ,
অস্নেহ স্ত্রী-পুত্র-মিত্রে, শুভাশুভ সর্ব্বত্রে, আত্মরমণ বই জানে না।
সেইত স্থিতধী কূর্ম্ম, কূর্ম্মাঙ্গবতীন্দ্রিয়-ভোগ্য বিষয়ে নিঃসঙ্গ,
জ্ঞান-বিজ্ঞানে সদা তৃপ্তাঙ্গ আত্মজ্ঞান-সুবর্ম্ম বই রয় না।
হেন ব্রহ্মপদ, অতুল আস্পদ, নিস্পৃহে নির্ম্মমে নিখিল সম্পদ,
অন্তঃকালে সেই জ্যোতির্ম্ময়পদ, হেরিলে নির্ব্বাণ বই পায় না।

অর্জ্জুন। হে ভগবন্! পরমার্থ-তত্ত্বজ্ঞান যদি কর্ম্মাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বল্লেন তবে আমাকে এই যুদ্ধরূপ হিংসাবৃত্তি কর্ত্তে কেন আদেশ কর্চ্ছেন? প্রথমে

কর্ম্মের প্রশংসা, ক্ষণকাল পরে জ্ঞানের প্রশংসায় আমি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হ'য়ে পড়েছি; যুগপৎ উভয়ের উপার্জ্জন সম্ভব কি? এতাদৃশ প্রাণিহিংসা-কর্ম্মে স্বয়ং আমাকে কেন নিয়োজিত কর্চ্চেন? বিরুদ্ধ উপদেশে আমার মন বিচলিত হচ্ছে। অতএব যাহা দ্বারা আমি শ্রেয়ঃ-প্রাপ্ত হব, আমাকে সেই উপদেশ দিন। কর্ম্ম ত্যাগ করা, কি কর্ম্ম করা, কোন্‌টী কর্ত্তব্য?

শ্রীকৃষ্ণ। হে অর্জ্জুন! আমি পূর্ব্বেই ব'লেছি জগতে মোক্ষদায়ক জ্ঞান-যোগ ও কর্ম্মযোগ নামে দ্বিবিধা নিষ্ঠা আছে, তন্মধ্যে শুদ্ধচেতা আত্মজ্ঞানীর জ্ঞানযোগ প্রথম, এবং কর্ম্মীদের কর্ম্মযোগ দ্বিতীয়; পুরুষ বিনা কর্ম্মানুষ্ঠানে কখন জ্ঞান প্রাপ্ত হয় না। এবং কর্ম্ম-সন্ন্যাসজ্ঞান, জ্ঞানে উপার্জ্জন ব্যতীত সমস্ত কর্ম্ম বৃথা। অজ্ঞানে ত্যাগ কর্লে কখনই সিদ্ধিলাভ হয় না কখন কোন অজিতচিত্ত কর্ম্ম ত্যাগ কোরে ক্ষণকাল মাত্রও অবস্থান কর্ত্তে সমর্থ নহে। পুরুষ ইচ্ছা না কর্লেও স্বীয় প্রাকৃতিক গুণ সকলে তাহাকে বাহ্য বা মানসিক কোন না কোন কর্ম্ম কর্ত্তে সদা বাধ্য করে। অতএব তুমি নিয়ত কর্ম্ম কর, কারণ কর্ম্ম-ত্যাগ অপেক্ষা কর্ম্ম-অনুষ্ঠানই শ্রেষ্ঠ। বিশেষতঃ সর্ব্বকর্ম্ম ত্যাগ হ'লে শরীর রক্ষা-কর্ম্ম নির্ব্বাহ হবে না। হে কৌন্তেয়! ভগবৎ উদ্দেশে কর্ম্ম ব্যতীত অন্য কোন কর্ম্ম কর্লে কর্ম্ম বন্ধনের কারণ হয়। অতএব ভগবৎ প্রীত্যর্থে নিষ্কামভাবে কর্ম্ম কর। কর্ম্মফলের আশা না কোরে সর্ব্বদা ভগবৎ উদ্দেশে কর্ম্ম কর্লে ভগবৎকৃপায় আপনা হতেই অভিলষিত বিষয় প্রাপ্ত হবে। । শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী যাহা আচরণ করেন ইতরব্যক্তিরা তাহারই অনুসরণ এবং অনুষ্ঠান করেন এবং তিনি যাহা শ্রেষ্ঠ বলে সপ্রমাণ করেন সাধারণে তাঁহারই অনুবর্ত্তী হয়। হে পার্থ! দেখ ত্রিভুবনের মধ্যে আমার প্রাপ্যাপ্রাপ্য কিছুই নাই; সুতরাং আমার করণীয়ও কিছুই নাই; তথাচ আমি সর্ব্বদা কর্ম্মানুষ্ঠান কর্চ্ছি; এমন কি তোমার সারথি পর্য্যন্ত হয়েছি। পার্থ! যদি আমি আলস্যহীন হয়ে কর্ম্ম না করি, তা হলে সকল প্রকারেই মনুষ্যগণ আমার অনুবর্ত্তী হবে। যদি আমি কর্ম্ম না করি, তা হলে যাবদীয় লোক উৎসন্ন হ'য়ে যাবে এবং আমিই বর্ণসঙ্করের কর্ত্তা হ'য়ে প্রজাপুঞ্জকে মলিন ক'র্‌ব। হে ভারত! অজ্ঞান মনুষ্যগণ কর্ম্মাসক্ত থেকে যেরূপ কর্ম্মানুষ্ঠান করে তদ্রূপ বিদ্বানেরা আসক্তি পরিত্যাগ ক'রে লোকদের ধর্ম্ম-রক্ষার জন্য কর্ম্ম করেন। অতএব তুমি আমাতে সমস্ত কর্ম্মফল সমর্পণ কোরে অন্তর্যামী পুরুষের অধীন হোয়ে কর্ম্ম কর; এইরূপ জ্ঞানে কামনা মমতা

ও শোক ত্যাগ কোরে যুদ্ধে রত হও। যাহারা ভক্তিপূর্ণ অন্তঃকরণে নিয়ত আমার মতের অনুসরণ করে তারা কর্ম্মপাশ হ'তে মুক্ত হয়। প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের স্ব স্ব অনুকূলে ও প্রতিকূলে রাগ ও দ্বেষ আছে, মুমুক্ষুর ঐ উভয়ই মুক্তি-প্রবন্ধক, অতএব তাদের অনুসরণ ক'রবে না। সুন্দররূপে অনুষ্ঠিত পরধর্ম্ম হ'তে নিজধর্ম্ম অঙ্গহীন হ'লেও শ্রেষ্ঠ; স্বধর্ম্মে নিধনও শুভ কিন্তু পরধর্ম্ম ভয়সংযুক্ত। ভারত! কর্ম্মসন্ন্যাস অপেক্ষা কর্ম্মযোগই শ্রেষ্ঠ। কারণ প্রকৃতিগত গতি অনিবার্য্য। উহা ত্যাগ করে কার সাধ্য? অতএব শাস্ত্রানুসারে কর্ম্ম কর্ল্লে কর্ম্মবন্ধন নাই। নিজ শরীর রক্ষার্থ সকলেই বাধ্য। তবে শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে কর্ম্ম কর, ও শাস্ত্র-নিষিদ্ধ বিষয় বর্জ্জন কর। হে ভারত! প্রাণিগণ অন্ন হ'তে, অন্ন পর্জ্জন্য হ'তে, পর্জ্জন্য যজ্ঞ হ'তে, যজ্ঞ কর্ম্ম হ'তে, কর্ম্ম বেদ হ'তে এবং বেদ ব্রহ্ম হ'তে সমুদ্ভূত হয়েছে। অতএব সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্ম নিয়তই যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত। পক্ষান্তরে আত্মাতে যাঁর প্রীতি, আত্মাতেই যাঁর আনন্দ এবং আত্মাতেই যাঁর সন্তোষ, তাঁকে কোন কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর্ত্তে হয় না।

সঙ্গীত।

কর্ম্ম জ্ঞানযোগ উভয় মোক্ষদ, প্রবৃত্তি নিবৃত্তিমার্গ মাত্র ভেদ,
জ্ঞানেন্দ্রিয় মনে বুদ্ধি সংযত, সাধ কর্ম্ম সব সঙ্গ করি ভেদ।
কর্ম্মফল ত্যজি কর্ম্ম অনুষ্ঠান, নিরাশী নির্ম্মমে করিয়ে সাধন,
কর্ম্ম-সন্ন্যাস তবে হবে বিজ্ঞান, কর্ম্ম-সন্ন্যাসী পর গলগ্রহ ভেদ।
অন্তর্যামী কৃষ্ণে কর্ম্মফলার্পণ, নিরাশী নির্ম্মমে করিয়ে সাধন,
বিবেক বুদ্ধি পর করি তাঁয় নির্ভর, কর্ম্ম কর রহি সন্তাপ বিচ্ছেদ॥

অর্জ্জুন। কৃষ্ণ! তাত বুঝলেম। তবে কোন্ রিপু কর্ত্তৃক মানব অনিচ্ছাসত্বেও যেন অবশ ও বাধ্য হ'য়ে পাপাচরণে নিয়োজিত হয়?

শ্রীকৃষ্ণ। অর্জ্জুন! ইহাই কাম ও ক্রোধ। রজোগুণ সমুৎপন্ন দুষ্পূরণীয় এবং অতিশয় উগ্র ও মুক্তিপথ-বৈরী জান্বে। যেমন ধূম দ্বারা অগ্নি, মল দ্বারা দর্পণ, জরায়ু হ'তে উৎপন্ন উল্ব চর্ম্ম দ্বারা গর্ভ আবৃত থাকে, তদ্রূপ কামনা দ্বারা জীবের জ্ঞান আচ্ছন্ন থাকে। ভরতর্ষভ! সর্ব্বাগ্রে ইন্দ্রিয়গণে জয় কোরে জ্ঞান-ও-বিজ্ঞান-নাশকারী পাপরূপ কামনা ত্যাগ কর। দেহাদি বিষয় হতে ইন্দ্রিয়গণ, ইন্দ্রিয়াপেক্ষা মন এবং মন অপেক্ষা নিঃসংশয়ে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, আত্মা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। আত্মা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভূমি জ্ঞাত হোয়ে নিশ্চল বুদ্ধি দ্বারা মনকে একাগ্র কোরে দুর্জ্জেয় কামরূপ শত্রু বিনাশ কর।

অর্জ্জুন। ভগবন্! আমি এতক্ষণ পর্য্যন্ত আপনার নিকট যে সমস্ত কর্ম্ম-যোগ ব্যাপার শ্রবণ ক'র্ল্লাম তাতেও আমার চিত্তের বিকার কিছুমাত্র পরিবর্ত্তিত হয় নাই। আমি কি উপায়ে চিত্তের বিকার অপনোদন করি তা ত বুঝ্তে পার্চ্ছিনে। ঘোর সঙ্কট সমুপস্থিত। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ও ভীমসেন না জানি কি ভাবে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হর্চ্ছেন। আমার ন্যায় তাঁদের কি এ যুদ্ধে অনিচ্ছা জন্মেছে? কৈ আমাদের মধ্যে পরস্পর সাক্ষাৎ সম্ভাষণ ত হচ্ছে না!

শ্রীকৃষ্ণ। পার্থ! পূর্ব্বে আমি আদিত্যকে এই অব্যয় যোগ ব'লে ছিলাম, পরে আদিত্য মনুকে ও মনু নিজ পুত্র ইক্ষ্বাকুকে বলেছিলেন। কালক্রমে উহা বিনষ্ট হ'য়ে ছিল। আজ আমি তোমার নিকট সেই অনাদি সিদ্ধ জ্ঞানযোগ কীর্ত্তন করেছি, কারণ তুমি আমার ভক্ত ও সখা। তজ্জন্যই এই গূঢ় রহস্য কীর্ত্তন করলাম। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির প্রভৃতি অন্যান্য বীরগণ কেবল তোমারই জন্যে অপেক্ষা কর্চ্ছেন।

অর্জ্জুন ভগবন্! আদিত্য জন্মগ্রহণ কর্ল্লে পর আপনার জন্ম হয়। অতএব আমি কি প্রকারে অবগত হব যে আপনি সৃষ্টির অগ্রে তাঁহাকে এই যোগ বৃত্তান্ত বলেছিলেন?

শ্রীকৃষ্ণ। পরন্তপ অর্জ্জুন! তোমার ও আমার বহু জন্ম অতীত হ'য়েছে। আমি সেই সমুদয় বিদিত আছি, কিন্তু তুমি মায়াচ্ছন্ন বিধায় সে সমস্ত জান না। হে ভারত! যে যে সময়ে ধর্ম্মের বিপ্লব ও অধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হয়, সেই সেই সময়ে আমি দেহ পরিগ্রহ করি। সাধুদিগের রক্ষা, দুষ্টগণের নিপাত এবং ধর্ম্ম-সংস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে জন্মগ্রহণ করি। অর্জ্জুন! যে যে ভাবে আমাকে ভজনা করে আমি তাকে সেই ভাবে অনুগ্রহ কোরে থাকি। কর্ম্ম আমাকে স্পর্শ কর্ত্তে পারে না। কর্ম্মফলে বাসনা আমার নাই। যে ব্যক্তি আমাকে এইরূপ অবগত আছেন তাঁহার কর্ম্মসূত্রে বন্ধন নাই। কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্য কি তা স্থির কর্ত্তে গিয়ে বুদ্ধিমান অনেকেই মোহ-প্রাপ্ত হয়েছেন, এজন্য নিষিদ্ধ কর্ম্ম, অকর্ম্ম ও বিহিত কর্ম্ম এই ত্রিবিধ কর্ম্মতত্ত্ব জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক। যিনি যদৃচ্ছা লাভে সন্তুষ্ট, দ্বন্দ্ব-সহিষ্ণু ও যিনি সিদ্ধি অসিদ্ধি সমজ্ঞান করেন তিনি কর্ম্ম ক'রেও কর্ম্মবন্ধনে বদ্ধ হন না। বেদে নানাপ্রকার যজ্ঞের বিবৃতি আছে, তাহা সবই কর্ম্ম হ'তে উৎপন্ন। হে পরন্তপ। দ্রব্যযজ্ঞ অপেক্ষা জ্ঞান-যজ্ঞই শ্রেষ্ঠ, কেননা ফলের সঙ্গে সমস্ত কর্ম্ম জ্ঞানের অন্তর্ভূত আছে। প্রণিপাত, সেবা ও প্রশ্ন দ্বারা জ্ঞান শিক্ষা

কর, তত্ত্বদর্শী জ্ঞানিগণ তোমাকে তার উপদেশ প্রদান করবেন। একবার জ্ঞান লাভ কর্লে তুমি এরূপ বন্ধুবধাদি-জনিত মোহে আক্রান্ত হবে না। ইহলোকে জ্ঞান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ শুদ্ধিকর আর কিছুই নাই। যে ব্যক্তি গুরূপদেশে শ্রদ্ধাবান হোয়ে গুরু-শুশ্রূষা-পরায়ণ ও জিতেন্দ্রিয়, তিনিই জ্ঞান-লাভ করিয়া ত্বরায় মোক্ষপদ প্রাপ্ত হয়েন; কিন্তু অজ্ঞান, শ্রদ্ধাবিহীন, সংশয়াত্মা ব্যক্তি বিনষ্ট হয়। সংশয়াত্মার ইহলোকে ও পরলোকে কোথাও সুখ নাই। অতএব হে ভারত! আত্মজ্ঞানরূপ অসি দ্বারা হৃদয়স্থিত অজ্ঞানসম্ভূত সংশয়-রাশি ছিন্ন কোরে তুমি যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হও। আর বিলম্ব ক'র না। শাস্ত্রে বিধি আছে বিলম্বে কার্য্য-হানি। বিশেষতঃ যুদ্ধ-কার্য্যে বিলম্ব হ'লে উৎসাহ-ভঙ্গ হয়। সম্পূর্ণরূপ উৎসাহ না থাকলে যুদ্ধের শেষ ফল অশুভ।

নবম দৃশ্য।

যুধিষ্ঠির, ভীম, নকুল, সহদেব প্রভৃতি বীরগণ।

যুধিষ্ঠির। ভীমসেন! তুমি কি শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের সংবাদ রাখ? তাঁহারা যুদ্ধার্থে কিরূপে অগ্রসর হচ্ছেন তা কি কিছু জান? কয়েকদিন কেবলমাত্র অনর্থক কাটিল।

ভীমসেন। ধর্ম্মরাজ! অবগত হলেম যে তৃতীয় পাণ্ডব যুদ্ধে অনিচ্ছা প্রকাশ কোরেছেন এবং শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে নানারূপ উপদেশ বাক্যে উৎসাহিত করবার চেষ্টা পাচ্ছেন।

নকুল। হাঁ, তাই বটে! কুরুকুলচূড়ামণিদের দর্শন কোরে তিনি আর সংগ্রামের প্রয়াসী নহেন। এখন শাস্ত্রালোচনা কচ্ছেন।

সহদেব। হাঁ, তাঁর ইচ্ছা যে যুদ্ধ ত্যাগ ক'রে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করাই শ্রেয়ঃ। যুদ্ধ কর্ত্তে তিনি নারাজ। যুদ্ধটাকে হিংসাবৃত্তি বলেই তাঁর ধারণা।

অন্যান্য বীরগণ। মহারাজ! তা হ'লে কি আমরা স্ব স্ব রাজ্যে প্রতিগমন করব? তাই বা হবে কেমন ক'রে? কুরুসেনাগণ কি আমাদের ছেড়ে দিয়ে ঘরে চলে যাবে? বিষম সমস্যা দেখ্‌ছি।

যুধিষ্ঠির। বীরগণ! তোমরা কি মনে কর শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুন কুরুসৈন্য দেখে ভয় পেয়ে যুদ্ধ কর্ত্তে অনিচ্ছুক? তাঁরা কি এতই হীনবীর্য্য যে শত্রুসৈন্য-দর্শনে ভীত ও কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য-বিমূঢ়? এ সবই জানিও লীলাময়ের লীলা-খেলা। তিনি যে কি ভাবে কাকে নাচাচ্ছেন, তা কি আমাদের বুঝবার ক্ষমতা আছে? তো যা করান তাই করি এইমাত্র জানি। যা হোক্ তৃতীয় পাণ্ডব যুদ্ধ না কল্লে কি কুরুসেনার সঙ্গে যুদ্ধ করবার আর কেহই নাই?

ভীমসেন প্রভৃতি অন্যান্য বীরগণ। মহারাজ! আমরা ভীত হ'য়ে কোন কথা বল্‌ছি না; যুদ্ধ কর্ত্তে এসেছি, যুদ্ধই করব। বাঁচা মরা চিন্তা কর্চ্ছি না। জয়-পরাজয়ের জন্য ব্যস্ত হচ্ছি না।

সঙ্গীত।

এস হরি হে! ভক্ত-রণে হও শীঘ্র অগ্রসর।
দেখিব কার জয়, পরাজয় বা হয় হে কার!
জ্ঞানরূপ শরাসনে, ভক্তিরূপ মহাবাণে,
দিব ব্যথা তব প্রাণে, না পাবে কভু নিস্তার।
কঠিন প্রেম-শিকলে বাঁধি রাঙ্গা চরণ-কমলে,
রাখিব হে বন্দী ছলে, শূন্য আছে হৃদি-কারাগার!!

যুধিষ্ঠির। বীরগণ! এই ভীষণ রণস্থলেও আজ তোমাদের সংগীতে আপ্যায়িত হলেম। সর্ব্বপ্রকার উচ্চাঙ্গের ও দুষ্কর তপস্যাদি দ্বারা যে ভগবানের দেখা পাওয়া অসম্ভব, সেই ভগবান্ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অর্জ্জুনের নিকট, তথাচ তাহার মায়াপাশ কাটে নাই। এ সমস্তই লীলাময়ের লীলা ভিন্ন আর কি হ'তে পারে? মানবের সাধ্য কি যে তাঁর সেই অলৌকিক ব্যাপার সহজে হৃদয়ঙ্গম কর্ত্তে পারে। অর্জ্জুনের নির্ম্মল বুদ্ধির উদয় না হওয়া পর্য্যন্ত অবশ্যই আমাদের অপেক্ষা কর্ত্তে হবে। তার জন্যে তোমরা নিরুৎসাহ হ'য়ো না। আমি সর্ব্বান্তঃকরণে সকলকেই ধন্যবাদ দিচ্ছি। যদি কাহারও কোন অভাব অভিযোগ থাকে তা দয়া কোরে আমাকে জ্ঞাপন কর্লে আমি তদ্দণ্ডেই তার সুব্যবস্থা ক'রব।

(ক্রমশঃ)